Shamsul Arefin

Shakti - Note

একটি পরীক্ষাঃ উপেক্ষার উপাখ্যান
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·TUESDAY, AUGUST 1, 2017

ছেলের এসএসসি পরীক্ষা। পড়েনা। সারাদিন মোবাইল গেমস-ফেসবুক-বন্ধু-ঘোরাফেরা, গার্লফ্রেন্ডও থাকতে পারে। বাবা-মা নিশ্চিত জানেন ছেলের ভবিষ্যত অন্ধকার। কি করবে এই প্যারেন্টস? ছেলেকে ঠিকপথে আনার চেষ্টা করবে? নাকি ছেলের মতামতকে রেসপেক্ট করে তাকে সেভাবেই চলতে দেবে?

এই বিশ্বচরাচরের একজন অভিভাবক আছেন। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সত্ত্বাধিকারী, আমরা তার সম্পত্তি, বানানো জিনিস। তিনি মৃত, অজীব পুতুল নন। তিনি জীবিত,চিরঞ্জীব, সব দেখেন-শোনেন-খবর রাখেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। জবাব দেন, সাহায্য করেন। বাবামায়ের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। বেশি কনসার্নড।

তিনি যে কারণেই হোক আমাদের একটা পরীক্ষা নিচ্ছেন। কী কারণ, তা তিনিই জানেন। বাপের সব সিদ্ধান্ত যেমন সন্তান বুঝেনা, তাঁর চিন্তাধারাও মানবজাতির বুঝার ক্ষমতা থাকবেনা স্বাভাবিকভাবেই। পরীক্ষাটা হল, কার কাজটা সবচেয়ে সুন্দর হয়। আহসানু আমালা। কে বাবামায়ের সাথে, স্ত্রীর সাথে, প্রতিবেশীর সাথে, গরীবের সাথে, পিচ্চি ওয়েটারের সাথে, কাজের মেয়ের সাথে, নিজ ওয়াদা-আমানত, মানে নিজের সাথে এবং নিজ মালিক স্রষ্টার সাথে সবচেয়ে সুন্দর আচরণ করে। পরীক্ষার সময়ঃ লাইফটাইম। আর টার্গেট দিয়ে দেয়া। এই সুন্দর ব্যবহারের আচরণের পরীক্ষায় হাইয়েস্ট মার্ক মুহাম্মদ নামক মানুষটার আচরণ। তাঁর আচরণের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা কর সবাই। যত

কাছে পৌঁছবে তত মার্কস উঠবে।

তবে শর্ত হল, ১ নং প্রশ্ন সবাইকে উত্তর দিতে হবে পাশ করতে হলে। সেটা হল স্রষ্টার সাথে আচরণ ঠিক রেখে। উনি আমাদের সব দিয়েছেন জীবন-সুস্থতা-বাবামার আদর-এত হাসি আনন্দ। উনার এটা প্রাপ্য যে আমরা তাঁর হক আদায় করি। আর তাঁর প্রথম প্রাপ্য হল তাকে সঠিকভাবে ঠিকরূপে চেনা। তিনি যেমন সেভাবেই তাঁকে চেনা। তাঁর ক্রেডিট অ্ন্য কাউকে, কোন মানুষকে দেয়া এটা তিনি ক্ষমা করেন না। তাঁর দয়া যেমন সবচেয়ে বেশি, অহংকারের একমাত্র যোগ্যও তিনিই। সব আচরণ ভাল হলেও তাঁকে না চিনে অন্যকে উপাসনা করা, মাথা নত করা এই ১ নং প্রশ্নের উত্তর না পেলে পরীক্ষা ফেল। আর ফেল করলে কঠিন তিরস্কার, অসহ্য, নির্মম।
পরীক্ষার হলে যারা উদাসীন, ১ নং উত্তর ভুল লিখছে তাদেরকেও তিনি ছেড়ে দেননা। তাদের কাছেও নিজ লোককে পাঠান ফিরিয়ে আনার জন্য।বড় ভালোবাসেন বলেই। দুনিয়াতে তাঁর নাম রহমান। এমন দয়াময়, যে তাঁকে গোনেনা চেনেনা তাঁকেও দয়া করেন, খাতা কাড়েন না। মৃত্যুর পর তখন মার্কিং হবে নির্মম।

এখানে পরীক্ষক আর পরীক্ষার্থীর মাঝে তৃতীয় এক পক্ষ উপস্থিত। সে অবাধ্য-অভিশপ্ত- দয়াময়ের দয়া অস্বীকারকারী। সে দয়াময়কে চ্যালেঞ্জ করেছে, মানবসন্তানকে আমি পরীক্ষায় পাশ করতে দোব না। আমিও ফেল করেছি, ওদেরও ফেল করাবো। মালিক তাকে অনুমতি দিলেন আমাদের পরীক্ষার জন্যই। সে পরীক্ষার হলে আমাদের ডিস্টার্ব করে। কাউকে ১ নং লিখতে দেবেনা। যারা ১ নং লিখেই ফেলবে, ভুল করিয়ে দেবে। আর যারা ঠিক লিখেছে তারা যেন বাকি প্রশ্নগুলোতে ফেল করে। এই তার মিশন। প্রত্যেক জাতির জন্য একজন মানুষ এসেছে স্রষ্টার পক্ষ থেকে যিনি পরীক্ষা, প্রশ্নের উত্তর দেখিয়ে দিয়েছেন। বার বার এসেছেন তাঁরা। ঐ অভিশপ্ত বারবার ১ নং এর উত্তর ভুলিয়ে দিয়েছে। এজন্যই ভুল উত্তর হিসেবে বিভিন্ন ধর্ম আমরা পাই। এখানে অন্য ধর্মকে সম্মান-অপমানের

কিছু নেই। পরীক্ষার্থীকে তার ভুল উত্তর চিনিয়ে দেয়া হচ্ছে। শেষবার চিনিয়ে দেবার জন্য একজন এসেছিলেন, বড় দরদী, বড় প্রিয়। আর কেউ আসবেন না। উনার অনুসারীরা যাবে। মানুষের দরজায় যেয়ে বলবে, বন্ধু সময় বেশি নেই। কেটে ঠিক করে লেখ। নাহলে বড় বিপদ। সময় শেষে শুরু হবে অনন্ত আগুন। চলো সবাই বাঁচি। ঠিক বাপমায়ের মত, ভালোবেসে, সন্তানের ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠা নিয়ে।
আমরা মুসলিমরা অন্য ধর্মকে সম্মান করিনা। অন্য ধর্ম ভুল উত্তর। শয়তানের দেখানো ভুল পথ। স্রষ্টার বিকৃত পরিচয়। আমরা সম্মান করি জাস্ট অন্য ধর্মের অনুসারীদের আবেগটুকুকে। কিন্তু না ফেরালে তো মহাক্ষতি। আহারে আমার ভাই। আগুন-পুঁজ- সর্প-বিছা- উত্তপ্ত পানি। অনন্তকাল।

সব ধর্ম গবেষণা করে সিদ্ধান্ত দেবার প্রয়োজন নেই। অন্য ধর্মগুলো স্রষ্টার সরল পথ, প্রকৃত রূপ থেকে বিচ্যুতি-- এ সিদ্ধান্ত স্রষ্টার নিজের। দয়াময় যেহেতু দয়াময়, তাই তিনি একটা স্বরচিত গাইডলাইন পাঠিয়েছেন। শব্দচয়ন, বিষয় নির্বাচন এ পৃথিবীর নয়। ঐশী অনুপ্রেরণায়ও লেখা নয়। সরাসরি ঐশী প্রত্যাদেশ, বিধান। সেখানে উনি নিজের আসল পরিচয় তুলে ধরেছেন। মানুষ ইহকাল ও পরকালে যেভাবে লাইফ লিড করলে সেকুলারলি ও স্পিরিচুয়ালি সবচেয়ে ভালো থাকবে সেই ম্যানুয়াল পাঠিয়েছেন। কারণ তিনি অসাড়, উদাসীন নন। তিনি জীবিত, আমাদের ব্যাপারে কনসার্নড।
সেখানে তিনি বলেছেন--এই ইসলাম আমার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য। অন্যকোন কিছু আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। পাশ করতে চাইলে এভাবে চলো। আরও বলেছেন এই বই আমার পক্ষ থেকে, এতে কোন সন্দেহ নাই, এটা পথ দেখাবে যারা পাশ করতে চায় তাদের।
এই বই তাঁর রচনা যিনি দৃশ্য-অদৃশ্যের স্রষ্টা, স্থান-কালের স্রষ্টা। তিনি সব জানেন। তিনি বলেছেন কিভাবে তাঁর পাঠানো নির্দেশ, তাঁর পাঠানো পরিচয় বিকৃত হয়েছেঃ হে নবী, আপনি তখন ছিলেননা যখন বনী ইসরাইল আমার গ্রন্থকে বিকৃত করছিল...কতবড় কথা

তারা বানিয়েছে যে স্রষ্টা পুত্র জন্ম দিয়েছেন, যে সম্পর্কে তাদের জ্ঞানই নেই...পৌত্তলিকদের কাছে জিজ্ঞেস করুন এই আকাশ-পৃথিবী কে বানিয়েছে?তারা বলবেঃআল্লাহ। তারা তো শুধু বাপদাদারা যে ভুলের উপর ছিল তারই অনুসরণ করে। এরকম আরো বহু কথায় তিনি তুলে ধরেছেন এই বিকৃতির ইতিহাস।
আসলে মুহাম্মদ সাঃ ইসলামের একমাত্র নবী নন, তিনি হলেন ইসলামের শেষ নবী। তাঁর আগে অগণিত পুরুষ পাঠিয়ে প্রত্যেক জাতি-উপজাতিকে সতর্ক করা হয়েছে। তাঁরা সবাই ইসলামের নবী। মোটকথা ইসলাম হচ্ছে " স্রষ্টার সঠিক পরিচয় ও ঐ জাতির নবীর জীবনাচার"। তাই প্রত্যেক জাতির নবী শুরুতে যখন এসেছেন তখন সেই ধর্মটা ইসলামই ছিলো। পরে শয়তানের প্ররোচনায় নবীর শিক্ষা ভুলে সেই ইসলামে বিকৃতি প্রবেশ করেছে।

চিল্লার সফরে টাঙ্গাইলের এক রেজিস্ট্রি অফিসে গাশত করছিলাম। একজন হিন্দু সাব-রেজিস্টারকে পেলাম। নরমালি তবলীগের জামাতগুলো অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়না। এজন্য বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত জামাত থাকে। তো আমি দেখলাম কিছু কথা যদি না বলি তো পরকালে যদি মামলা করে দেয়। অল্প কিছু কথা বলার পর উনি আমাদেরকে বললেনঃ দেখেন ভাই, আপনি যা বললেন এগুলো আমি জানি। আসলে আপনারা মুসলিমরা যদি মুসলিমের মত চলতেন তাহলে আমাদেরকে দাওয়াত দেয়া লাগতো না। এই উপমহাদেশে হিন্দু বলে কিছু থাকত না। কিন্তু আপনারাই তো ঠিক নেই। আপনাদের দেখলে মনে হয়, হিন্দু আছি ভাল আছি। আমার এক মুসলিম রুমমেট আছে। আমি পূজা করি ওকে বলি নামাযে যেতে, ও যায়না। ঐদিন আমি বুঝে গেলাম তাবলীগের লোকেরা কেন মুসলিমদের দাওয়াত দেয়াকে অগ্রাধিকার দেয়।
সাহাবীদের দাওয়াত কেমন ছিল অমুসলিমদের প্রতি। "আসলিমু তাসলামু"- ইসলাম গ্রহণ করে ফেলো, ইহকাল-পরকালে নিরাপদ হয়ে যাবে। কিংবা "কুনু মিছলানা"-- আমাদের মত হয়ে যাও। এক লাইনে দাওয়াত। কেন তাঁরা ইসলামের পরিচয় দিতে লম্বা বয়ান, বিতর্ক করতেন না? কারণ এই দাওয়াতের আগেই অমুসলিম ইসলাম দেখে ফেলেছে, জেনে গেছে ইসলাম কি

জিনিস। তাই বয়ান দিয়ে বুঝানোর দরকার ছিলনা। বিতর্ক করে পরাজিত করার দরকার ছিলনা। তাদের ব্যবহার, লেনদেন, হাসি, অভিবাদন, সামাজিকতা, মেহমানদারি সব কিছুতে বিধর্মীরা ইসলাম চিনে নিত। তাদের দিন দেখে চিনে নিত ইসলামের সূর্য়, রাত দেখলে চিনে নিত ইসলামের চাঁদ। আর ভাবত এরা কেমন মানুষ-- এত মায়া, এত আদব, এত প্রেম, এত পবিত্রতা। এরপর সাহাবীরা সংক্ষেপে আহ্বান করতেন-- এটা ইসলাম, তোমরাও আসো এর মধ্যে। ব্যস।
আজ আমরা ইসলাম মনে করি শুধু ৫ খুটি-- আমার বুকের মাঝে ঈমান, ওরা দেখেনা। মসজিদের ভিতর নামায, ওরা দেখেনা। পেটের ভিতর রোযা, কেউ দেখেনা।মক্কায় হজ, ওরা ঢুকতে পারেনা। যেটা ওরা দেখতো-- ব্যবহার, লেনদেন আর সামাজিক ইসলামী রীতি-- এগুলো তো ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছি আমরা কবেই। শুধু ঈমানে আর ইবাদতে ইসলামে। আর লেনদেন,সামাজিকতায় ইহুদী-খ্রিস্টানের স্টাইল। এ এক অদৃশ্য ইসলাম আমরা পালন করি। অথচ ইসলাম দেখে নেয়ার জিনিস, লাইফস্টাইল। দেখানোর জিনিস। কি জবাব দিবেন আপনি আমি আল্লাহর কাছে। ভয় করি সেই দিনকে যেদিন কেউ সাহায্য করতে পারবেনা। এই অদৃশ্য ইসলাম কি যথেষ্ট আমাদের জন্য?
অমুসলিম ভাইদের কাছে সমস্ত অদৃশ্য ইসলামধারীদের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাই। আপনারা মাপ করবেন আমাদের। আমরা আপনাদের ইসলাম দেখাতে পারিনি। আমাদের দায়িত্ব পুরা করতে পারিনি।
সবাইকে অনুরোধ করছি অধমের প্রকাশিতব্য "ডাবল স্ট্যান্ডার্ড" বইটা পড়ার জন্য। ওখানে অনেক কিছুরই জবাব পাবেন ইনশাআল্লাহ। আর "ভারতীয় নওমুসলিমদের ঈমানজাগানিয়া সাক্ষাৎকার" বইটাও মুসলিম-অমুসলিম সবারই পড়া দরকার।
আমরা কোন ধর্মের অবমাননা করিনা। কুরআনে নিষেধ।আমার কথাটা লক্ষ্য করুন। "আমরা অন্য ধর্মকে সম্মানও করিনা, অন্য ধর্মকে অবমাননাও করিনা, শুধু আপনাদের আবেগটুকুকে সম্মান করি।"
এখানে কোন কন্ট্রাডিকশন নেই। যেহেতু আপনাদের ধর্মমতের সাথে আমি একমত না, আমি মূর্তিপূজা, যীশুর খোদাত্ব এগুলোকে ঘৃণা করি। কেউ যদি এগুলোকে ঘৃণা না করে সম্মানের চোখে দেখে, সে মুসলিম থাকতে

পারবেনা। কিন্তু আমি আপনাদের ধর্মের কোন টিটকারি, ধর্মীয় পুরুষদের চরিত্রহনন, গালি এগুলো দিবোনা। আপনার ধর্মমত আমি সম্মান করিনা কিন্তু আপনার ধর্মকে আমি অবমাননা করিনা, কারণ আপনি কষ্ট পাবেন।

কিন্তু একটা কুকুর-বিড়ালও আগুনে পুড়তে থাকলে তাকে বাঁচানো মানবতার দাবি। সেখানে মানুষ, আমারই অমুসলিম ভাই ১ নং প্রশ্নের ভুল উত্তরের কারণে অনন্তকাল নরকের ৭০ গুণ তেজের আগুনে পুড়বে, এটা আমরা কিভাবে সহ্য করি। অমুসলিম তো আমাদেরই রক্তের ভাই।এক আদমের সন্তান।
এখন বলেন, দাওয়াত কি অপমান, নাকি আকুতি-সম্পর্কের দাবি-শেষ চেষ্টার আবেগ? আমার জবাব শেষ। এটাই সংক্ষিপ্ত। নইলে বুকের যে কষ্টটা, আকুতিটা, ব্যথাটা সেটা লিখতে গেলে ফেবু সইতে পারতোনা, পারবেওনা।

"দ্য মেকিং অব ডাবল্ স্ট্যান্ডার্ড": প্রিকুয়্যাল
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·TUESDAY, AUGUST 1, 2017

হায়াতে থাকলে প্রকাশের পর একটা লেখা লিখব--
"দ্য মেকিং অব ডাবল স্ট্যান্ডার্ড"

ভাবতে ভাবতে কীভাবে ছুটে গেল প্যাঁচগুলো। হ্ঠাৎ; যখন ভাবছি তখন ছুটছে না,উত্তর আসছেনা। যখন ভাবছিনা, অন্যকিছু করছি বা অন্যকিছু ভাবছি তখন দুম করে ভাবনার প্যাঁচ খুলে যায়। প্রতিবার অবাক করে দিয়ে কে যেন জোর করে চিন্তার জট ছাড়িয়ে দেয়। চোখ ফেটে এসে পড়ে পানি। ওহ হো, এই বিধানটা তাহলে এজন্যই ছিল। এত পারফেক্ট, এত

সুন্দর।

বইটা কমপ্লিট করতে ৩ মাস মাত্র সময় নিয়েছি। একটা গল্প শেষ কোনমতে করেই ফেবুতে দিয়ে দিয়েছি। খুব দ্রুত। মনের ভিতর 'ছাড়ানো প্যাঁচ' ছোটভাইটাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। কোন ডায়েরিতে সেগুলো লিখেছি ওকে দেখিয়ে দিয়েছি। এতো তাড়াহুড়ো করার একটাই কারণ ছিল।

এই হঠাৎ পাওয়া জবাবগুলো আমার মনে হয়েছে কেউ আমানত হিসেবে দিচ্ছে। আমার কোন কৃতিত্ব নেই। এই 'খুলে যাওয়া প্যাঁচ' কারো আমানত। যদি এর মাঝে আমার ডাক চলে আসে, এই ভয়ে ছোটভাইকে বুঝিয়ে রেখেছিলাম যাতে আমি না থাকলেও আমানত আপনাদের কাছে পৌঁছে। এজন্যই এত তাড়াতাড়ি।

এখন আমার দায়িত্ব শেষ। আলহামদুলিল্লাহ। এই 'খোলা প্যাঁচ' এখন আপনাদের কাছে আমানত। কে জানে কোথায় কে প্যাঁচ থেকে বের হতে পারছেনা। হয়ত আপনার খুঁজে দেয়া এই চাবিতেই ওর মুক্তি।

এই 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' বইটা শামসুল আরেফীনের না। এটা আমাদের, আপনাদের। এটা আপনাদের বই, আপনাদের আমানত। পৃথিবীর কোন প্রান্তে কেউ হয়ত সেই আমানতের অপেক্ষায়।

বিঃদ্রঃ সন্তানবাৎসল্য থেকেই কি না জানিনা, আমার বাবা বলছিলেন এই বইটা অন্যভাষায় অনুবাদ হওয়া দরকার। আপনারা পড়ার পর যে মতামত দেবেন তার উপর ভিত্তি করে পরের সিদ্ধান্ত নেব। মুসলিম দেশের মধ্যে সিরিয়া আর মিশরে নাস্তিকতার হার খুব বেশি। আর পশ্চিমা দেশের মুসলিমদের না জানি কি হাল। ইংরেজি ও আরবি কল্পনায় আছে। যাঁরা আপনারা পড়বেন সবাই একটু কষ্ট করে ওয়ালে ছোট্ট করে একটা রিভিউ লিখে দিয়েন। আল্লাহ আপনাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন।

কেঁদোনা আকসা, আমরা আসছি।

আসলে বইটা আস্তিক-নাস্তিক-অমুসলিম-প্র্যাক্টিসিং- ননপ্র্যাক্টিসিং-আলিম-জেনারেল শিক্ষিত সবার জন্যই। সবার আলাদা খোরাক দিতে চেয়েছি। ভাবাতে চেয়েছি সবাইকে। সবাই ভাবুন, ভাবান। বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন গড়ে উঠুক আবার, সেই মধ্যযুগের সোনালী ইসলামী সভ্যতার মত।
তাই নিজে পড়ুন, অন্যকেও পড়ান। আপনার বুকশেলফ, ব্যাগ,অফিসের ডেস্ক, শিয়রে রাখার মত হবে আশা করি। মনে গেঁথে নিলে আরো ভালো। ৳ ৮৬/- জলে যাবেনা ইনশাআল্লাহ।
কন্টেন্ট আবার মেনশন করছিঃ-

বইয়ের নামঃ ডাবল্ স্ট্যান্ডার্ড ১
লেখকঃ ডাঃ শামসুল আরেফীন
শরঈ সম্পাদনাঃ মুফতি আবু সালেহ মোহাম্মদউল্লাহ প্রকাশনাঃ মাকতাবাতুল আযহার

যা থাকছেঃ
১. না দেখে বিশ্বাসঃমানবজন্মের সার্থকতা
২. দাসপ্রথাঃ ঐশী বিধানের সৌন্দর্য
৩. দক্ষিণ হস্ত মালিকানাঃ একটি নারীবাদী বিধান
৪. আরব সংস্কৃতি মানবো কেন?
৫. সমাধান কি মানবধর্মেই?
৬. বনু কুরাইজা ও বাংলাদেশ দণ্ডবিধি
৭. শ্রেণীবৈষম্যহীন সমাজঃ ওদের স্বপ্ন, আমাদের অর্জন
৮. শস্যক্ষেত্র ও নারীঃ সম্পত্তি, না সম্পদ?
৯. পরিপূর্ণ দাড়িঃ জঙ্গল, নাকি ছায়াবীথি?
১০. জিযিয়াঃ অমুসলিম নাগরিকের দায়মুক্তি
১১. বিজ্ঞান কল্পকাহিনীঃ শাশ্বত একত্ব (Eternal Oneness)

১১ টি ছোটগল্প।চিত্রকল্পে এগিয়ে যাবে কাহিনী।প্রতি বাক্যে থাকছে রেফারেন্স।

বইয়ের নাম থেকে বা সূচিপত্র থেকে অলরেডি একটা ধারণা করা গেছে যে কেমন হবে আপনাদের "ডাবল স্ট্যান্ডার্ড"।
প্রবন্ধের মূল সমস্যা হল বিষয়বস্তুর বাইরে যাবার সুযোগ কম। আর গল্পের সুবিধা হল, আড্ডার ছলে পানি বিভিন্ন দিকে গড়ায়। আল্লাহ জাযায়ে খায়ের দিন আরিফ আজাদ ভাইকে।

যারা ফেবুতে "তুমিও ভাবো" পড়েননি, তারা তো পড়েননি। যারা পড়েছেন তারা ৬০ ভাগ পড়েছেন। পরে আরও যোগ- বিয়োগ-গুণ-ভাগ তো হয়েছেই। সাথে যোগ হয়েছে রেফারেন্স আর রেফারেন্স। কোন কোন গল্পে তো ভাতের চেয়ে বেগুন ভর্তাই বেশি হয়ে গেছে।
গল্পের টপিক ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ই এসেছে গল্পের ভিতর। বললাম না, সবাই নিজ নিজ খোরাক পাবে এটায়।

প্র্যাক্টিসিং পাবে ইসলামের রূপামৃত পানের তৃপ্তি, এর অলৌকিকতায় হবে বিহ্বল।
নন-প্র্যাক্টিসিং জানবে, ইসলাম জেনেটিক নয়। এটা অনুশীলনের বিষয়, ফর্ম ফিলআপের নয়। জন্ম মুসলিম পরিবারে হতে পারে এটা বড় বিষয় না। দেখার বিষয় কে মুসলিম হিসেবে মরছে। ইসলাম প্র্যাক্টিস না করে এর উপর মরার সম্ভাবনা কমে যায়।
অমুসলিমদের জানার বিষয় হল, ইসলাম ওনাদের ধর্মের মত 'ধর্ম' নয়। এটা লাইফস্টাইল। চুল কাটাও ইসলামের বাইরে না, দেশ পরিচালনাও ইসলামেরই অংশ।
হিন্দু থেকে নাস্তিকরা জানবে, তারা যা খুঁজে যা বুঝে ধর্মকে ছেড়েছে, সে মুক্তা লুকোনো এই লাইফস্টাইলে।
ইসলামত্যাগী নাস্তিকরা জানবে, ওরা কতটা দ্বিমুখী, সামান্য প্রবৃত্তির জন্য।

আর উলামায়ে কেরাম জানবে ৯৫% জেনারেল শিক্ষিত মুসলিমসন্তানের মনমগজ অমুসলিমরা ইজারা নিয়েছে। উদ্ধারকর্তা হিসেবে তাঁদের দিকেই চেয়ে আছে এরা। এরা উলামাদের কাছে আর আসবেনা। নবীর ওয়ারিশগণকেই গিয়ে ফেরাতে হবে, ঠিক নবীজীর মত করেই।

আরও অনেক কিছু এসেছে। জানেনই তো আড্ডা কেমন হয়। কে কাকে নিয়ে ভেগেছে থেকে শুরু করে রাশিয়া- আমেরিকার সম্পর্কে গিয়ে থামে। এতেও তাই হয়েছে।

নিজে পড়ে শেষ করলেই হবেনা। আরেকজনকে পড়াতে হবে, তাকে আবার বলতে হবে আরেকজনকে পড়ানোর জন্য।জাগাতে হবে না সবাইকে?

জাগো বাহে। কোনঠে সবাই।
আকসা, তুমি জোরে কাঁদো। এত জোরে যেন আমরা সবাই উঠে যাই।

ডাবল_স্ট্যান্ডার্ড
প্রি-অর্ডারের লিংক

ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদঃ প্রস্তাবিত কর্মপদ্ধতি
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·TUESDAY, DECEMBER 19, 2017

একটা ছোট্ট ঘটনা দিয়ে শুরু করি। প্রথম রাবী আমার মুহতারাম আব্বাজান, দ্বিতীয় রাবী আমি। আব্বু তখন ৩ চিল্লার সফরে, প্রফেসর এস আর খান স্যারের জামাতে, বারিধারার কোন এক মসজিদে। ওনাদের দায়িত্ব ঢাকার অভিজাত এলাকাগুলোতে, সচিবালয়ে, ঢাকা ভার্সিটির স্যারদের উপর দাওয়াতের কাজ করা। মহল্লার এক যুবক আব্বুসহ আরেক অফিসারকে নিয়ে যাচ্ছেন বুয়েটের এক রিটায়ার্ড প্রফেসরের কাছে। সুরম্য ইমারত, নাম ‘মিথুনভিলা’। তো ঐ যুবক আব্বুকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন রাস্তায় যেতে যেতে, এই মিথুন ঐ যুবকের বন্ধু, আর ওনারা দাওয়াতে যাচ্ছেন মিথুনের বাবার কাছে, রিটায়ার্ড প্রফেসর, নাস্তিক। বেশ ক’বছর আগে উনি কথায় কথায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন, আল্লাহ বলে যদি কেউ থাকেন তবে ৭ দিন সময় দিলাম, পারলে আমার কোন ক্ষতি করে দেখাক। ৫ দিনের দিন সুইমিংপুলে ডাইভ দিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে মারা যায় তাঁর একমাত্র ছেলে মিথুন। ছেলে হারানোর অনুভূতি হিসেবে উনি জাস্ট এতটুকুই বলেছিলেন, এত তাড়াতাড়ি হবে ভাবিনি। ভদ্রলোক এখনো নাস্তিক। তো আমার আব্বু হযরত ভদ্রলোককে কিছু কথা বলে চলে এলেন।

ঘটনাটা বলার উদ্দেশ্য হল, নাস্তিককে আপনি যত যুক্তিই দেখান না কেন, সে কোনভাবেই মানবে না। আল্লাহ নিজে ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিলেন যে আমি আছি। এর চেয়ে বড় আর কোন যুক্তি হতে পারে? আর কী প্রমাণ হতে পারে? কোন প্রমাণ কোন দলিল কোন যুক্তি কারো হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট নয়। হিদায়াত একমাত্র একমাত্র আল্লাহর হাতে। ফেসবুকে অনেক ভাই আলহামদুলিল্লাহ বেশ দরদী। আল্লাহ এই দরদকে উম্মতের ফায়দায় ব্যবহার করুন। তারা নাস্তিকদের পোস্টে কমেন্টের পর কমেন্ট করতে থাকেন, তার চেয়েও বেশি ব্রেনওয়ার্ক করতে থাকেন, বিতর্ক করতে থাকেন। আল্টিমেট রেজাল্ট কি?

● নাস্তিকটা যে প্রশ্নটা তুলেছে সেটা তো সে জানার জন্য তোলে নি। জানতেই যদি চাইত তবে ফেসবুকে পোস্ট দিত না। উপযুক্ত
লোকের কাছেই প্রশ্নটা করতো। সে প্রশ্নটা পোস্ট করেছে ট্রল

করার জন্য, টিটকারি দিয়ে সমমনাদের সাপোর্ট আর মুমিনদেরকে কষ্ট দেবার জন্য। আপনি কমেন্টে সময় ব্যয় করছেন মানেই সে সফল, সে আপনাকে কষ্ট দিতে পেরেছে। আপনি Angry রিঅ্যাক্ট দিচ্ছেন। সে খুশি, এটাই তো সে চেয়েছিল।
● আর ব্যাপারটা কি এমন যে এই একটা প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেই সে আস্তিক হয়ে যাবে, তার সব সংশয় দূর হয়ে সে ৫ ওয়াক্ত নামায পরা শুরু করে দেবে? কখনোই না। এক তো, সে জবাব পাবার জন্য পোস্ট করেনি যে সে আপনার জবাব নিবে। আর দুই, এই জবাব দলিলসহ আপনি দিলেন, লিংক দিচ্ছেন। এগুলো সে দেখবেও না। তাকালেও তার
হঠকারিতা তার পরিবেশ তাকে জবাব অনুধাবন করতে দেবেনা। কারণ
সে তো বুঝতেই চায়না।
● আপনার দেয়া জবাব-লিংক সে বুঝার জন্যও পড়ছে না, সে পড়ছে কাউন্টার দেবার জন্য। সে বুঝে পড়ার অবস্থায় তো নেই। ফলে
আপনি যে উদ্দেশ্যে দিচ্ছেন তা কোন কাজেই আসছে না।

মাঝখান থেকে আপনার ২/৩ ঘণ্টা আনপ্রোডাক্টিভ লস। এই দুই ঘণ্টা

আপনি পড়াশুনা করতে পারতেন, দ্বীনী কোন ইলম হাসিল করতে পারতেন, আমল

করতে পারতেন, পরিবারকে সময় দিতে পারতেন, বন্ধুদের সাথে কোথাও

বেড়াতে যেতে পারতেন। ফলে নীট রেজাল্ট শূন্য। না না, শূন্য না। নীট

রেজাল্ট নেগেটিভ। কীভাবে?

● তাকে বুঝাতে না পারায় আপনার মন খারাপ হবে, সারাটা দিন মন খারাপ থাকবে। আরো সময় নষ্ট হবে। তাকে আরো কি প্রমাণ দেয়া যায়
বা যেত সেগুলো মাথায় ঘুরপাক খাবে। আপনি কোন কাজে মন বসাতে পারবেন না।
● নামাযে-যিকিরে ধ্যান নষ্ট হবে। নামাযের মধ্যেও ওগুলো মনে আসবে। স্বাদ পাবেন না।
● কাউন্টারের সময় সে তীর্যক, চূড়ান্ত অশ্লীল কিছু কথা বলবে। সেগুলো আপনি পড়েছেন। আপনার মন তেতো হয়ে থাকবে,গা গুলাবে,
বমিও হতে পারে। আসিফ, থাবাবাবার লেখা পড়ে আমি বমিই
করেছিলাম।
● কাফিরকে গালি দিলে যে সোয়াব হবে এমন কোন কথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি। গালি সর্বাবস্থায় জবানের গুনাহ, সে আপনি যাকেই দেন। আপনি তার গালির জবাবে কিছু গালি দিবেন, তার মুমিন বাপ-মাকেও দিবেন। গালি-উত্তেজনার শারীরিক মানসিক সব ক্ষতি তো হলোই, ওর তো গুনাহ হিসেব হবেনা, বিনা হিসেবে দোযখ। মাঝখান থেকে আপনি কিছু কবিরা গুনাহ কামালেন।

- খুব লাভ হল। আপনারও, ওরও।

- কী বলেন ভাই, আপনারা যদি এই কথা বলেন? ওদের হেদায়েতের জন্য চেষ্টা করতে হবে না?

ওদের হেদায়েতের চেষ্টা করার চেয়ে নিজের পৈতৃক ঈমান বাঁচানোর চেষ্টা আরো জরুরি। নিজে ফজরের নামায শীতে মসজিদে পড়তে যাবার মত ঈমানের তাকত নেই, আমি বাঁচাচ্ছি নাস্তিকের ঈমান। এটা শয়তানের নেক সুরতের ধোঁকা যে, ঐ নাস্তিকের হেদায়েত আমার হাতে। আমি জবাব দিলেই ও লাইনে এসে যাবে, আরে আমার জবাব আর অন্যদের জবাব এক হল? এমন যুক্তি দিয়ে জবাব দেব না, জাকির নায়েক ফেল। নাস্তিক/ নাস্তিকদের পেজের একটা’দুটো পোস্ট পড়ে আপনার হাসি পাবে— ধুর, কী সব লেখে, বদ্ধ ছাগল সব। হাসছেন-হাসছেন-আপনি হেসেই যাচ্ছেন, মাঝে মাঝে দু’একটা কমেন্ট, লিংক দিচ্ছেন। আরো পোস্ট পড়ছেন হা হা হা হা, কীসব গাধা গরু হা হা হা। হঠাৎ একটা পোস্ট আপনার বোধ-ইন্টেলেক্ট-জ্ঞানকে ছাড়িয়ে যাবে। যে বিষয়ের ব্যাখ্যা আপনি জানেন না, যেটা আপনার চিন্তায়ও ধরে না। এমন একটা গর্ত যেখান থেকে উঠার ক্ষমতা আপনার নেই। স্টেপ বাই স্টেপ আপনাকে সেই গর্তে নিয়ে যাবে। শয়তান তো এজন্যই আছে। আল্লাহ নিষেধ করেছেন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে। যে গর্তটা চেনে সে হয়তো এটা দেখেও হেসেছে, তার গর্তটা সামনে। আর আপনি এখানেই পড়ে গেছেন। কারণ নাস্তিকদের সব প্রশ্নের জবাবই সরল নয়, এমন অনেক ইন্টেলেকচুয়াল তত্ত্বমূলক, গভীর প্রশ্ন ওদের আছে যেগুলোর জবাব আমরা আম পাবলিকদের মগজে সহসা আসে না, কেউ বুঝিয়ে দিলে তখন আসে। এমন একটা আয়াত তুলে দিল মাঝখান থেকে যার শানে নুযুলও আপনি জানেন না, পরের আয়াতেই উত্তর আছে তাও আপনি জানেন না, নবীজী হাদিসে ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন তাও জানেন না। এজন্য ওদের প্রোফাইলে-পেজে আনাগোনা, আপনার ঈমান হরণের কারণও হতে পারে। কওমীর এক ছাত্র হাফেজ আমি পেয়েছি, তার এই অবস্থা। সে এখন তার উত্তর পাওয়ার জন্য সায়েন্স নিয়ে পড়ছে। আল্লাহ তাকে হিদায়াতে ফিরিয়ে আনুন।

আরে ভাই, আমার ঈমান এত ‘কচুপাতার পানি’ না। আরেক তালেবে এলেম আমাকে এই জবাব দিয়েছেন। আরিফ আজাদ যখন ছিল না তখন তিনি ব্লগে নাস্তিকদের সাথে ডিবেট করতেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি তাকে বলেছিলাম, এখন না, আপনি পড়াশুনা শেষ করেন, এরপর ওসব হবে। জবাবে উনি আমাকে এটা শোনালেন। কাঁচা বয়স, কাঁচা এলেমে নাস্তিক দর্শনের সংস্পর্শ কি ফলাফল দেয় তা আমরা ক’দিন আগেই দেখেছি। ইফতা পাশ (মুফতি না)মাসুদ ডিবেট করতো শুনেছি, মুফাসসিলও নাস্তিকদের সাথে ডিবেট করতো। তারাও ধারণা করতো তাদের ঈমান অনেক পাক্কা। এতোই পাকা যে শেষমেশ পচেই গেল। মিনার ভাইয়ের কাছে শুনেছি আমেরিকান এক ভদ্রলোক ১৫ বছর নিজ ওয়েবসাইট থেকে নাস্তিক-মিশনারীদের খণ্ডন করতেন, এখন নাস্তিক। তাই নিজের ঈমান নিয়ে এতো কনফিডেন্সও কাম্য না। তাহলে আল্লাহ কুরআনে এই দুয়া শিখাতেন না— “রব্বানা লা- তুঝিগ ক্বুলুবানা বা’দা ইয হাদাইতানা ওয়া মিল্লাদুনকা রহমাহ, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব” হে আল্লাহ, হিদায়াতের পরে আমার অন্তরকে গোমরাহীর দিকে ঘুরিয়ে দিয়েন না। আমরা কি উমার বিন খাত্তাবের (রাঃ) চেয়ে বেশি ঈমানদার? আকুল হয়ে ‘নবীজীর রহস্যবিদ’কে প্রশ্ন করছেন, ও হুযাইফা, সব মুনাফিকের নাম না বল বলো না, কমসে কম এতটুকু বল যে, ঐ লিস্টে আমি আছি কিনা। কে বলছেন? উমার বিন খাত্তাব। যার ব্যাপারে নবীজী সাঃ বলেছেন, আমার পর কেউ নবী হলে সে হত উমার। রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। আর আমরা আজ নিজেদের ঈমানের ব্যাপারে কনফিডেন্ট। ভাই, নিজ ঈমানের ব্যাপারে ভয়ে ভয়ে থাকাটাই ঈমানের আলামত। ফকিরের কোন টেনশন নেই, যার পকেটে বাণ্ডিল, তার টেনশন। আশা ও ভয়ের মাঝে ঈমান। নিজ ঈমান নিয়ে ভয়ে থাকা, সব সময় ঈমান বাঁচানোর চেষ্টা করা এটাই ঈমানদারের লক্ষণ, আর ঈমানের ব্যাপারে বীরত্ব ফলানো শয়তানের ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন করি—

- ওদের প্রোফাইল আমরা কেন ফলো করি? ওদের পেজ আমরা কেন লাইক করি?

- ওরা কি লেখে, কি বলে তা জানার জন্য।

- ওরা কি বলে তা জানা ‘আপনার’ কি দরকার? আপনি কি ওদের খণ্ডন করে বই লিখছেন? বা কিছু করতে চান সামনে, কোন মুভি বা ডকুমেন্টারি? বা জানলে কোন সওয়াব, বা কোন উপকার?

- না, তা না। এমনিই।

- তাহলে জেনে নিন, যে কাজে দুনিয়া বা আখিরাতের কোন লাভ হয় না তাকে বলা হয় লাইয়ানি কাজ, অহেতুক কাজ। আর আমাদের নবীজী বলেছেন, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হল অহেতুক কাজ ও কথা থেকে বেঁচে থাকা। তার মানে আপনার ইসলাম সুন্দর না, আপনি ভাল মুসলিম না, তাই কি?

- না, মানে। ওরা যা বলে যা করে তা থেকে আমি দূরে থাকব। এটা তো জানা দরকার, তাই না?

- কোন কোন জিনিস থেকে দূরে থাকবেন তা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আপনাকে বলেননি? নাকি কুরআন-হাদিসে যা নিষেধ করা আছে সেগুলো সব আপনি মেনে ফেলেছেন। এখন আরো নতুন নির্দেশনা দরকার? আচ্ছা, ওরা কি বলে, কি বলবে, কি বলতে চায়— তা কি আপনি জানেন না?

আসলে খেয়াল করে দেখেন, নাস্তিকরা কী বলে, কী বলতে চায় এটা আমরা কিন্তু জানি। ওরা কী বিষয়ে প্রশ্ন তোলে এগুলো আমাদের অজানা না কিন্তু। তাহলে আমাদের আর কি দরকার পড়েছে ওদের প্রোফাইলে যাবার? ইন জেনারেল ওদের বক্তব্য সবাই আমরা জানি। পয়েন্ট বাই পয়েন্ট তো সবার জানা দরকার নেই। যারা গবেষণা করেন তাঁদের দরকার হতে পারে। আমাদের জেনারেল মানুষদের কিন্তু জানার দরকার নেই ডিটেইলস। বরং আমাদের বেশি জানতে চাওয়াটা ক্ষতিকর হতে পারে আগেই বলেছি। যা

দরকার নেই তা অতিরিক্ত জানতে চাওয়াটাও শয়তানের ধোঁকা। ও কিন্তু মেহনত করেই যাচ্ছে।

তাহলে ওরা এগুলোর জবাব জানবে কীভাবে যদি আমরা না বলি? ভাই, আমি আগেই বলেছি ওরা জানার জন্য পোস্ট দেয় না। ধরেন আপনি জানতে চান, ইসলামে দাসপ্রথা কেন অনুমোদিত। আপনি কী করবেন? বিজ্ঞ আলিমের কাছে জিজ্ঞেস করবেন, জবাব যদি আপনাকে সন্তুষ্ট না করে তাহলে আরেকজনকে। কারণ আপনি জানতে চাচ্ছেন আসলেই। আপনার জানাটা দরকার। কিন্তু এটা না করে আপনি করলেন কী, আপনি একটা বিলবোর্ড ভাড়া করে লিখলেন “একুশ শতকে এসেও ইসলামে দাসপ্রথা অনুমোদিত, জবাব চাই”। মানে কী? মানে হল, আপনার জবাব দরকার নেই, আপনার জনমত দরকার। প্রশ্নের ধরন দেখলেই বুঝা যায়, সে জবাব চায়, নাকি ট্রল করতে চায়। নবীজী সাঃ এর সাথে ঘটা একটা ঘটনা থেকে ওদের মানসিকতা আরো ক্লিয়ার হবে—

হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিতঃ সুর্যাস্তের পর উতবাহ, শাইবাহ,আবু সুফিয়ান,আবুল বাখতারী,আসওয়াদ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব,যামআহ ইবনে আসওয়াদ,ওলীদ ইবনে মুগিরাহ,আবু জেহেল ইবনে হিশাম,আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া,উমাইয়া ইবনে খালাফ, আস ইবনে ওয়ায়েল,নুবাইহ, মুনাব্বাহ একত্র হয়ে কাবার চত্বরে নবীজী সাঃ কে ডাকাল।অনেক প্রলোভনেও যখন রাসূলুল্লাহ সাঃ ইসলাম প্রচার থেকে বিরত হতে রাজি হলেন না, তখন তারা হুজুর সাঃ এর কাছে দলিল দাবি করল। বলল, আমরা আপনার উপর ঈমান আনব যদি আপনি যদি আপনার আল্লাহর কাছে দুআ করে-

১) এই পাহাড়গুলো সরিয়ে দেন।

২) আমাদের মক্কা শহরকে প্রশস্ত করে দেন।

৩) সিরিয়া ও ইরাকের মত আমাদের এলাকায়ও নহর জারি করে দেন।

৪) কুসাই বিন কিলাব সহ আমাদের বাপদাদাদেরকে জীবিত করে দেন। তারা আপনার সত্যতা স্বীকার করলে আমরা আপনাকে মেনে নেব।

৫) একজন ফেরেশতা নিয়ে আসুন যিনি আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে।

৬) আপনার জন্য বাগ-বাগিচা, ধনভাণ্ডার, স্বর্ণরূপার মহল বানিয়ে নেন।

৭) আমাদের মাথার উপর আসমান ভেঙে ফেলুন।

৮) আল্লাহ তাআলাকে ও ফেরেশতাদেরকে দলে দলে আমাদের সামনে হাজির করুন। (নাউযুবিল্লাহ)

এরপর বলছে, আপনি আকাশ পর্যন্ত সিড়ি স্থাপন করুন।সেই সিড়িতে পা রেখে আমাদের সামনে আকাশে উঠে যান। কিতাব নিয়ে ৪ জন ফেরেশতা সহ নেমে আসুন যারা আপনাকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেবে। যদি আপনি এটাও করেন তবু আপনাকে সত্য বলে মানতে পারব না।(তাফসীরে ইবনে কাছীর, হাঃসাঃ ১/১১৬-১২১)

দেখেন শেষমেশ কী বলল, যাই দেখান আমরা বিশ্বাস করব না, করব না, করব না। ইসলামবিদ্বেষীদের মেন্টালিটি এমনই। তাহলে কি আমরা কিছুই করবো না? হ্যাঁ, করব। দুয়া করব। নবীজী সাঃও আবু জেহেল আর উমার রাঃ এর একজনের হিদায়াতের জন্য দুয়া করেছেন। আমরাও ওদের হিদায়াতের জন্য দুয়া করব। আমাদের আরো কিছু করণীয় আছে—

● তালেবে ইলমগণ যারা এই সেক্টরে কাজ করতে চান, অবশ্যই দাওরা শেষ করে তারপর। কখনোই পড়াকালীন নাস্তিক লেখকদের বইপত্র পড়া যাবে না। মোবাইল ব্যবহারও আমি সমর্থন করি না ১৮ বছরের নিচে। ইন্টারনেট ব্যবহারও ফারেগ হবার পর। অভিভাবক ও সম্মানিত উস্তাযগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভাত পচলে তাও খাওয়া যায়,
পোলাও পচলে আর খাওয়া যায় না।

● আমরা যারা আম পাবলিক, এই সেক্টরে কাজ করার পরিকল্পনা নেই এই মুহূর্তে, আমরা সব নাস্তিক আইডি আনফলো করে দিব, সব নাস্তিক পেজ আনলাইক করে দেব, সব নাস্তিক তর্কবিতর্কমূলক গ্রুপ আনফলো করে দিব। এগুলো ঈমান হরণের প্রথম স্টেপ।
● নাস্তিকদেরকে ওদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিব। ক্বলু সালামা। পারলে দুয়া করব। গালি দিবো না একদম।
● প্রশ্নের ভঙ্গি দেখে যদি মনে হয় সে আসলেই জানতে চায় তবে লিংক, বই ইত্যাদি দিব। আপনার জবাবের চেয়ে লিংক, বই এগুলোতে
সে বেশি ভাবনার সুযোগ পাবে। (আমার প্রোফাইলে, ওর প্রোফাইলে না)
● কোন নাস্তিক তর্কাতর্কি করার চেষ্টা করলে জবাব দেব না। ঠিক আছে ভাই, তুমি তোমার মত, আমি আমার মত।
● ওদের স্ট্যাটাসে আপনার কমেন্ট, রিঅ্যাক্ট, ফলো, শেয়ার এগুলোতে ওদেরই লাভ হয়। পাবলিসিটি বাড়ে। নিউজ ফীডে উপরে চলে আসে বার বার।
● ব্যক্তিগত ইলম চর্চার উপর গুরুত্ব দিব। বেঁচে যাওয়া সময় নফল আমল, যিকির, তিলওয়াতে লাগাব। আত্মশুদ্ধি, আলিমদের
লেকচার (বয়ান) শোনার মধ্যে লাগাব।
● আরিফ আজাদ সমগ্র, মিনারসমগ্র (আসিতেছে), সত্যকথনসমগ্র সংগ্রহে রাখব। আক্বীদার ব্যাপারে সঠিক ধারণা রাখব।
● আলিমগণের সাথে উঠাবসা করব। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তাঁদের পরামর্শ নিব।
● নিজের ঈমান-আমল হেফাজতের জন্য আল্লাহর কাছে সবসময় দুয়া করব।
বাড়িয়ে দেবার দুয়া করব।
● দ্বীনের কোন বিষয়ে খটকা লাগলে ইস্তিগফার, আঊযুবিল্লাহ পড়ে বাম দিকে তিনবার থু থু ফেলা। এই আমল করব। প্রথমেই কাউকে বলব না। বার বার এমন হলে কোন সম্মানিত আলিমের সাথে পরামর্শ করব। সবাইকে বলে বেড়াবো না।
● যে বিষয়ের খটকা লাগবে ঐটা বলেই মানুষকে দাওয়াত দিব। ধরেন, মিরাজ নিয়ে আপনার হঠাৎ সমস্যা হচ্ছে। তো আপনি সবাইকে
মিরাজের কুদরত, আল্লাহর অসীম ক্ষমতা নিজ রাসূলকে কাছে
নেবার, উনি চাইলে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই নিতে পারেন। আল্লাহর রাসূল যে খবর আমাদেরকে দিয়েছেন সেটাই সত্যি, যদিও তা আমাদের বুদ্ধিতে ধরেনা— এগুলো বলে বলে দাওয়াত দিবেন।

সাজিদ, ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, সত্যকথন, আরজু— সব যুক্তি তর্ক শেষে

‘না দেখে বিশ্বাস’ করাটাই ঈমান। যুক্তিতর্কে বিশ্বাসের নাম ঈমান

না। আমরা না দেখে বিশ্বাস করি, আমরা মুমিন্স। তবে আমাদের সে

বিশ্বাসই মানুষ হয়ে জন্মানোর উদ্দেশ্য, সার্থকতা। অন্য প্রাণি না

দেখে বিশ্বাস করতে পারে না। আমরা পারি ‘না দেখে’ বুদ্ধি বিবেচনা

দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে। তাই আমরা মানুষ। যারা পারে না তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, উলাইকা কাল আনআম। শরীর, ইন্দ্রিয়, কৌশল, বুদ্ধি অন্য প্রাণীরও আছে। কখনো কখনো বেশিও আছে। হাতি-তিমির শরীর দেখে আমরা অবাক, কুকুরের ঘ্রাণ/বাদুড়ের শ্রবণ/ঈগলের দৃষ্টি আমাদের অবাক করে। মৌমাছির এয়ার কন্ডিশনিং টেকনোলজি, পিঁপড়ার আর্কিটেকচার আমাদের অবাক করে। একটা জিনিসেই আমরা শ্রেষ্ঠ, ‘না দেখে বিশ্বাস’ আভাসের আলোকে। কিছু আভাস দেখে আমরা বিশ্বাস করি, যে আভাস তোমরা দেখ না । ওই আভাসগুলোর ব্যাখ্যা (interpretation) আর তোমাদের বুদ্ধির জট ছাড়ানোর জন্যই আমরা লিখি এগুলো।

কিন্তু আমাদের ‘না দেখে বিশ্বাস’ই আমাদের মনুষ্যত্বের পক্ষে একমাত্র যুক্তি।

বিনা যুক্তিতে আল্লাহ আছেন

বিনা যুক্তিতে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বিনা যুক্তিতে রাসূল যা বলেছেন সব সত্যি, তিন সত্যি।

আলহামদুলিল্লাহ।

নব্যধারার লেখালেখির সালতামামি
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·SATURDAY, DECEMBER 30, 2017

লেখালেখির বা ইসলামী সাহিত্যের একটা নতুন ধারা এসেছে এবছর। প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ, উল্টো নির্ণয়, আর্গুমেন্ট অব আরজু, সত্যকথন, লজ্জা, বিশ্বাসের যৌক্তিকতা, নাস্তিকতার স্বরূপ

সন্ধানে, আপনাদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। আলিমগণের তত্ত্বাবধানে আল্লাহ তাআলা কিছু তরুণকে একাজে লাগিয়েছেন। বছরের শেষ দিনে তাই এই নতুন ধারা নিয়েই কিছু কথা, কিছু উপলব্ধিঃ

ক. এই বইগুলো কি নাস্তিকদের জন্য?

কখনোই না। কুরআন থেকে যারা হিদায়াত পায় না, এই বইগুলো তাদের হিদায়াত দিতে পারবে না। এগুলো কখনোই ওদের জন্য না। প্রথমত, ওরা এই লেখাগুলো পড়ে না। পড়লেও সেটা পড়া না, চোখ বুলানো। দু’একজন পড়লেও লেখক কি বলেছে, কি বুঝাতে চাইছে তা বুঝার জন্য পড়ে না। ভাবে, অন্ধ মুমিন্স লিখেছে, কী আর লিখবে। তাহলে এই বইগুলো কাদের জন্য? আমি মনে করি এই প্রত্যেকটা বই আমাদেরই জন্য, পুরোপুরিই আমাদের জন্য। আমরা যারা প্রতিনিয়ত ব্লগ, ফেবুর সুবাদে ওদের ছোবলের সম্মুখীন হচ্ছি। এইডস হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, তখন যেসব জীবাণুর খবরও ছিলো না এতদিন, তারাই ইনফেকশন করে। শেষ পর্যন্ত রোগী এরকম কোন একটা কমজোর ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশনে (opportunistic infection) মারা যায়। এইডসে কেউ মরে না। চামচিকার লাথি খেয়ে মারা যায় কাদায় আটকানো হাতি।

আজ মুসলমানের সন্তানদের এই অবস্থা। ঈমানের জোর থাকলে যে প্রশ্নগুলো কোনদিনই মনে আসার কথাও ছিল না, সেগুলোই আজ ঈমান খেয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এইডস রুগীর মত। ঈমানের জবাব হল, আল্লাহ বিধান দিয়েছেন, কল্যাণ আছে বলেই দিয়েছেন। রাসূল বলেছেন, ব্যস এটাই সত্যি। ঈমানে যুক্তির জায়গা নেই। ওষুধ লাগে তখন যখন রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল। সুস্থ দেহে ওষুধ লাগে না। জোরালো ঈমানে যুক্তি লাগে না। ঈমান শব্দের অর্থই বিশ্বাস, শুনলাম ও মানলাম, সামি’না ওয়া আত্ব’না। তবে এখন আমাদের ফজরের নামাযে ওঠার মত ঈমানের অভাব, তাই নাস্তিকদের-খ্রিস্টান মিশনারীদের লো আইকিউয়ের প্রশ্ন,

তথ্যচুরি, নোংরা ব্যাখ্যা এগুলোর যৌক্তিক জবাব দিতে হচ্ছে। সময়ের প্রয়োজনেই।

এগুলো আমাদের মুমিনদের জন্যই। ‘নাস্তিকতার জবাব’ বলে বইগুলোর ব্যাপকতা কমিয়ে দেয়া হচ্ছে। যার নাস্তিকদের ব্যাপারে ইন্টারেস্ট নেই, সে এই বইগুলো পড়ছে না। অথচ ‘উল্টো নির্ণয়’ বইটা তো পুরোটাই আমাদের জন্যই নাসীহা, নাস্তিকতার জবাব বলে চালিয়ে বইয়ের কার্যকারিতাকেই আমরা কমিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের ‘ডাবল স্ট্যান্ডার্ড’ও অনেকটা তেমনই। আমাদের জন্যই নাসীহা, আমাদের ঈমানের তৃপ্তির জন্য। এইডসের রুগীকে মরণ পর্যন্ত এন্টিবায়োটিকের উপর রাখা হয়, দৃশ্যমান ইনফেকশন না থাকলেও, যাতে ইনফেকশন না হয়।।
আমাদের এইডসওয়ালা ঈমানের জন্য এই ধারার বইগুলোও অগ্রিম এন্টিবায়োটিক (Prophylaxis)।

খ. জেনারেল শিক্ষিতরা লড়ছে?

বড় অপারেশন করে প্রফেসর, সেলাই দেয় লেকচারার লেভেলের এসিস্টেন্ট ডাক্তার, ড্রেসিং করে ইন্টার্নী ডাক্তার। কুরআন-হাদিস সংরক্ষণ-ব্যাখ্যা-গবেষণা এটা সবচেয়ে উঁচু লেভেলের কাজ। আলিমগণ এগুলো করেন। আমাদের ক্ষমতাও নেই ওখানে। আজ আরিফ আজাদ যে সাজিদ লিখল কুরআন-হাদিস ঘেঁটে, সেই কুরআন-হাদিস কোন আলিম অনুবাদ করেছেন, ফিকহের কিতাব আলিমরা অনুবাদ করেছেন, বিভিন্ন বই যা থেকে এই লেখকেরা রেফারেন্স গুছিয়ে আপনাদের সামনে দিল সেগুলো সব আলিমগণের লেখা। হ্যাঁ, ওরা জেনারেল শিক্ষিত। জেনারেল শিক্ষিতদের বুঝ থেকে প্রশ্নগুলো আসছে, তাই জেনারেল শিক্ষিত লেভেল থেকেই জবাব আসছে। অপপ্রচার যে দৃষ্টিকোণ থেকে, ব্যাখ্যাও সে দৃষ্টিকোণ থেকে। ওরা বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে প্রশ্নগুলো তুলছে, আমাদের ঈমানের ‘বৈজ্ঞানিক’ অংশটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাই বিজ্ঞানওয়ালারা জবাব লিখছে। আজ আমরা বিজ্ঞানভিত্তিক ঈমান না এনে সত্যিকার ঈমান আনতাম

সাহাবীদের মত, তাহলে এসব প্রশ্নের জবাবই দেয়া লাগতো না, মনেই আসত না। আমাদের ঈমান আবার এইডস রুগী, বিজ্ঞান নির্ভর ঈমান। তাই এইরকম দুর্বল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো লাগে। আলিমরা সেটা করবেন না, তাঁদের করা উচিতও না, আমি মনে করি। জেনারেলরাই যথেষ্ট। ওনারা উম্মতকে হারানো স্বাস্থ্য ফিরায়ে দিক আর অন্যান্য বড় অসুখের চিকিৎসা দিক, এসব জ্বর-সর্দি-কাশি আমরাই আটকাচ্ছি ইনশাআল্লাহ।

তবে অবশ্যই আলিমগণের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এসব কাজ হওয়া চাই। নাসীহা হোক, খণ্ডন হোক আর ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন সাহিত্য-গল্প-উপন্যাস-কবিতা হোক। ‘ইসলামী’ ট্যাগ থাকা মানেই সেটা আলিমগণের দ্বারা সত্যায়ন করে নিতে হবে। ওনারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমের ওয়ারিশ। হাদিসেই আছে। শরীয়ার গার্ডিয়ান। সব বিকৃতি, ভ্রান্ত মত, ব্যক্তিক চিন্তা থেকে দ্বীনের আসল রূপ সংরক্ষণ করছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী কোন বিনিময় ছাড়া। জেনারেল শিক্ষিতদের স্বতন্ত্র চিন্তাজগতের চিন্তাপ্রবাহ ঠিক ‘ইসলাম’ পথেই যাচ্ছে কিনা তা আলিমদের দিয়ে যাচাই করাতে হবে, এবং আলহামদুলিল্লাহ আমাদের লেখকরা তা করছেনও। মোটকথা আজ জেনারেল ভাইয়েরা যে মেহনত করছেন তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আলিমগণেরই মেহনত-দুয়া-সোহবতের ফসল, এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

গ. তাহলে এসব বই লেখার উদ্দেশ্য কি?

জি, এসব বই লেখার উদ্দেশ্য হল আমাদের পিছুটান ছুটিয়ে দেয়া। নাস্তিক-মিশনারীদের এসব হাওয়াই মিঠাই আমাদের যুবসমাজকে দ্বীনের পথে আগে বাড়তে দেয় না। মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে, পিছুটান দেয়। এসব বই আমাদেরই সংশয় নিরসনের জন্য, ওদেরকে মুমিন বানানোর জন্য না। এসব প্রশ্ন আমাদের মনেই উদিত হয়, কারণ পশ্চিমা রেঞ্জের ভিতর আমরা চলি, আমাদের মানস চলে। পশ্চিমা ডেফিনেশনের বাইরে যা কিছু সব আমাদের সন্দেহ হয়। জীবনবোধ-ভদ্রতা-সভ্যতা-সাফল্য-মানবতা এসবের

যে সংজ্ঞা পশ্চিমারা দেয়, আমরা অবচেতন মনে তাকেই স্ট্যান্ডার্ড মনে করি, দ্বীনদাররাও। এসবের যে ডেফিনেশন ইসলাম দিয়েছিল তা আজ আমাদের মন-মগজ থেকে বেরিয়ে গেছে। ‘কষ্টিপাথর’ বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাবেন হয়ত। তাই ইসলামের কিছু বিষয় আমাদের পশ্চিমা সংজ্ঞার ফুটো দিয়ে পাস করে না। তখন লাগে খটকা। এই খটকা, এই পিছুটানই আমাদের ইসলামের পথে যেতে দেয়না, ইসলামের গভীরে ঢুকতে দেয় না। টেনে ধরে। এই বইগুলো সেই পিছুটান সরানোর জন্য। যাতে আমরা নিঃসন্দেহ হয়ে নিজেদের ঈমান-আমাল-ইলম বাড়ানোর কাজে আগে বাড়তে পারি। নিঃসংকোচে নিজের দ্বীনকে সাহাবীদের পর্যায়ে নেবার লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করতে পারি। নিজের সংশোধন, পরিবারের সংশোধনে লেগে যেতে পারি। ‘ক্বদ আফলাহা মান তাঝাক্কা’, সফল তো সে-ই যে নিজেকে সংশোধন করে।

ঘ. আগামী বছর জেনারেল শিক্ষিত ভাইবোন যাঁরা লেখালেখি করবেনঃ

১. আগামী বছর মিনার ভাই, আরিফ আজাদ ভাই, আশরাফুল ভাই, সত্যকথন সহ আমার জানা মতে বেশ ক’জন লেখকের ‘সংশয় নিরসন’মূলক বই আসার কথা। এখন উম্মাহর সবচেয়ে বেশি দরকার দ্বীনী নাসীহা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাসীহা। ওনারা পুটিং লাগাক, আমরা পালিশ করি। ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন এবং মানসম্পন্ন কবিতা, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, উপন্যাস প্রয়োজন। আমি অনুভব করি। ফররুখ আহমদের কাব্যগুলো এখন খুব দরকার, ইকবালের কবিতার ভালো অনুবাদ হওয়া দরকার। সেকুলার সাহিত্য আমরা পার হয়ে এসেছি, আমি আমার সন্তানকে কি পড়তে দিব? কার কবিতা পড়তে দিব, কার উপন্যাস পড়তে দিব?

২. লেখা যাই হোক অবশ্যই আলিমের সম্পাদনায় হওয়া চাই। ‘ইসলামী’ ট্যাগওয়ালা অনেক সাহিত্যে শরীয়াবিরোধী উপকরণের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এমনটা কাম্য নয়।

৩. সেকুলার সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে হিমু বানানো, উদাসীন বানানো, দুনিয়া থেকে গাফেল, আখিরাত থেকে গাফেল। সেজন্য তারা কখনো প্রেমিকার রূপের বন্দনা করেছে, কখনো অন্য মতবাদের বন্দনা করেছে, তাদের সংজ্ঞায় মানবতার বন্দনা করেছে। অস্ত্র হিসেবে। আমরাও যদি একই কাজ করি তাহলে কেমন হল? সেদিন এক মাদ্রাসা ছাত্রকে দেখি মানসসুন্দরীকে নিয়ে গদ্যকবিতা লিখেছে। প্রেম তো করে না, মনে মনে যাঁর ছবি আঁকে তাকে নিয়ে, হয়তো স্ত্রীকে নিয়েই। সেখানে ‘টোলাদৃতা’, ‘প্রেমান্বিতা’ এবং আরো দাঁতভাঙ্গা শব্দ তৈরি হয়েছে যেগুলো অভিধানে নতুন করে ঢুকাতে হবে। হয়ত এসব শব্দ তৈরি করতে গিয়ে অনেক মাথা খাটাতে হয়েছে, সময়ও লেগেছে। কিন্তু এতোখানি ভাবালুতা কি আমাদের মানায়? আমি জানি না, জাস্ট প্রশ্ন করছি।

আমাদের সাহিত্যের উদ্দেশ্য ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করা, পাঠককে আল্লাহমুখী করা, আখিরাতমুখী করা, শরীয়ামুখী করা। নাহলে আমাদের আর সেকুলারদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? শুধু এটাই? জি, একমাত্র এটাই। না হলে প্লিজ ‘ইসলামী’ ট্যাগ দেবেন না।

আর আমাদের সাহিত্য যেন ওদের হাসির খোরাক না হয়। যারা লেখালেখি করতে চান দয়া করে মাওলানা যাইনুল আবেদীন হুজুরের ‘সাহিত্যের ক্লাস’সহ অন্যান্য রচনা, আর আদীব হুজুর মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ সাহেবের রচনাগুলো পড়ার দরখাস্ত। সাদাসিধা মনের কথাই সাহিত্য, আগের সেই জবড়জং শব্দবাজি এখন আর চলে না। আগে যে যত দুর্বোধ্য ভাষা, নতুন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করত সে তত বড় সাহিত্যিক, এক হুমায়ুন আহমাদ এসে অনেক কিছুই পরিবর্তন করে দিয়ে গেছেন।

৪. যারা লেখালেখি করব, শুধু লেখালেখি না। ব্যক্তিগত ইলম বাড়াতে হবে। বিশেষ করে ইসলামের বেসিক কিছু বিষয়ে কনসেপ্ট একদম ক্লিয়ার লাগবে। একজন মুফতি সাহেব একবার বলেছিলেন আমাকে— ‘একজন মুফতি যা জানেন, আমারও তা জানতে হবে; কিন্তু বলার সময় উনি বলবেন, আর আমি সব

কথা বলবো না সাবধানতার খাতিরে’। তাই শরীয়ার কিছু বিষয়ে ইসলামের ক্লিয়ার নির্দেশনা জানতেই হবে। যেমনঃ আক্বীদা বিস্তারিত, সব মানহাজ। যাতে নাসীহা/খণ্ডনের সময় তাকফির করে না বসি। সব ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাগবে। ‘ওয়ালা ওয়াল বারা’, তাওহীদের ক্ষেত্রগুলো, ফিতনা সম্পর্কে ইলম, হদ-কিসাস-শরীয়া আইন। আলহামদুলিল্লাহ এখন এসব বিষয়ে এখন বাংলায় অনেক কিতাব রচনা করছেন, সালাফদের কিতাব অনুবাদ করছেন আমাদের সম্মানিত আলিমগণ।

৫. আর আমরা বাকিরা পড়ব, আগে বাড়ব। নিজেকে সংশোধন করে ফরজ থেকে সুন্নাহ, সুন্নাহ থেকে মুস্তাহাবে উঠব। যুহদে উঠব, তাকওয়ায় উঠব, ইখলাসে উঠব। নিজ পরিবারকে সংশোধনের চেষ্টা করব। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তালিম, বই পড়ার উৎসাহ দিব, ঈমানী আলোচনা করব। আলিমগণের সোহবতে যাব বেশি বেশি, বাবাকে নিয়ে যাব তাফসীরে।

নতুন বছরটা ওদের আরো খারাপ যাক।

আহ, আমার নিজের এখনো কত সংশোধন বাকি। কত গুনাহ ছাড়া বাকি। গত বছরটা পেয়েও কাজে লাগাতে পারলাম না। হায়, আমার কি হবে। এই মুহূর্তে তওবা করলাম, আগে বাড়ার এরাদা করলাম। আমীন।

কেউ আমীন না বলে যাবেন না।

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·THURSDAY, JANUARY 18, 2018

আজ আপনাদেরকে পৃথিবীর এক শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। তাদের সামরিক বিভিন্ন শাখার সুশৃঙ্খল সব কর্মকাণ্ড আর লোমহর্ষক সব অভিযানের গল্প শোনাবো আপনাদের। আত্মত্যাগ, ক্ষমতা আর দক্ষতার জুড়ি মেলেনা এমনই অপরাজেয় এক আর্মি।

এখন তো সীমানা পাহাড়া দেয় বর্ডার গার্ড নামে আলাদা আধাসামরিক বাহিনী। সীমান্তে উত্তেজনা দেখা দিলে তখন আর্মি মোতায়েন করা হয়। এক আজব দেশের গল্প শোনাচ্ছি আপনাদের। যেখানে সীমান্তে বারোমাসই চলে ভয়াবহ উত্তেজনা। উভয় পক্ষই আল্লাহর দেয়া ২৪ ঘণ্টা মোতায়েন রেখেছে সুসজ্জিত সেনাবাহিনী। পুরো দেশের সীমানা জুড়ে শক্তিশালী কাঁটাতারের বেড়া। ওপাশ দিয়ে শত্রুপক্ষের নানা কিসিমের আর্মিক্যাম্প। টহল-কুচকাওয়াজ- মহড়া সবই চলছে ধুমসে।ওদের একাডেমী গুলোও সীমান্তের ওপাশেই, যেখানে প্রতিমুহূর্তে যোগ হচ্ছে নতুন রিক্রুট, গুণিতক হারে বাড়ছে ওদের সেনাসংখ্যা। প্রতিদিনই অসংখ্যবার হামলার চেষ্টা করছে ওরা। নিশ্ছিদ্র বেড়াটায় একটু খানি ফাটলের অপেক্ষা। সামান্য ফাটল পেলেই শত্রু হামলে পড়বে। এ দেশ যে বড় সুন্দর, সুজলা-সুফলা, সকল দেশের রাণী। একবার ঢুকতে পারলেই সোনার দেশে লুটপাট চালিয়ে শেষ করে দেবে রাক্ষসগুলো।

এখন আসি যে দেশের গল্প শুরু করেছি। ইনফ্যান্ট্রি বা পদাতিক ডিভিশন। দেশের সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত। সীমান্তের এই পাশেই আমাদের পদাতিক বাহিনীর শত শত ক্যাম্প। একটু ভিতরেই শত শত ক্যান্টনমেন্ট। আরেকটু ভেতরে শত শত মিলিটারী একাডেমী, তৈরি হচ্ছে আরো সেনা, দেয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণ। শত শত টহল প্লাটুন সার্বক্ষণিক টহল দিচ্ছে। সাদা পোশাকের। এক সকালের ঘটনা। পাহাড়ি পথ ধরে এমনি একটি প্লাটুন টহল দিচ্ছে। তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিচ্ছে সব। গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্তে তাদের কাজে নিয়োজিত। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এখন তো এক সেকেণ্ড জিরোনোর সময় নেই। হঠাৎ দূরে যেন ধোঁয়ার রেখা? কী ব্যাপার? কমাণ্ডিং অফিসার দূরবীনে চোখ লাগিয়ে নিশ্চিত হলেন। হ্যাঁ, ধোঁয়াই বটে। তার মানে শত্রু? দ্রুত মার্চের নির্দেশ দিয়েই ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করলেন ক্যান্টনমেন্টে, আরো সৈন্যসাহায্য চাইলেন।

ঠিক তাই। গ্রামের ঐ অংশের কাঁটাতারের বেড়াটুকু দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়েছে। ঢুকে পড়েছে শত্রু। খুন, লুটপাটের উৎসব শুরু হয়েছে। পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে দানবেরা। তাদের উল্লাসে নরক গুলজার। দ্রুত মার্চ করে কাছাকাছি গিয়ে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল আমাদের প্লাটুন। ক্রল করে একদম কাছে পৌছে গেল শত্রুর। প্রতিশোধের আগুনে ধক ধক করে জ্বলছে চোখগুলো। ‘ফায়ার’— অফিসারের নির্দেশ পেতেই একসাথে গর্জে উঠল রাইফেল, এসএমজি, এলএমজি। অপ্রস্তুত শত্রুবাহিনী সামলে নিয়ে পজিশন নিল। উভয় পক্ষে নিহতের সংখ্যা বাড়ছে। ওদিকে অফিসারের ফোন পেয়েই ক্যান্টনমেন্ট থেকে শত শত লরি রওনা দিয়েছে সেনা নিয়ে। বন্ধ করে রাখা অপ্রয়োজনীয় রাস্তাগুলোও খুলে দেয়া হয়েছে। সবগুলো রাস্তা দিয়ে ওরা আসছে দ্রুতবেগে। এরা আবার সাদার উপর ধূসর চকরাবকরা ইউনিফর্ম। স্থানীয় প্রশাসন ‘জরুরি অবস্থা’ ঘোষণা করেছে। রিইনফোর্সমেন্ট এসে পড়েছে, দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের সেনারা। শত্রুপক্ষের শেষ সৈন্যটির মৃত্যু নিশ্চিত করা হল এইমাত্র। মৃত সহকর্মীদের লাশগুলো নিয়ে চলে যায় আমাদের ইনফ্যান্ট্রি প্লাটুন। আর্মি মেডিকেল কোর এবং ইঞ্জিনিয়ার্স কোরের একটি প্লাটুন এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই। যুদ্ধবিধ্বস্ত গ্রামটি পুনর্নির্মিত হবে, আহতদের সুস্থ করে তোলা হবে, আবারো কর্মব্যস্ততার কোলাহলে মুখর হয়ে উঠবে গ্রামখানি। অবদান রাখবে দেশের জিডিপিতে।

বিরক্ত লাগলো? ধুর মিয়া, এটা কোন গল্প হলো? একটা টিপিক্যাল যুদ্ধের ধারাবিবরণী দিয়ে বলছেন গল্প বললাম? রোসো রোসো। একটা কথা বললেই আমার উপর রাগ পানি হয়ে যাবে মশাই। যে দেশটার গল্প বলার চেষ্টা করলাম, ওটা দেশ নয় গো। ওটা আপনার নিজের দেহ। জি স্যার এতোক্ষণ যে যুদ্ধের কথা বললাম সেটা প্রতি সেকেণ্ডে আপনার দেহে চলছে। শত্রু বদখত সব ব্যাকটেরিয়া রাক্ষস আর ভাইরাস দানবের বিরুদ্ধে এভাবেই আশ্চর্য শৃঙ্খলায় প্রতিটা যুদ্ধে আপনি জিতে চলেছেন আপনার অজান্তে। আপনার চামড়া বেড়াটির বাইরেই ওরা গিজগিজ

করছে কোটি কোটি। বাচ্চা দিচ্ছে, খাদ্য সংগ্রহ করছে, আর কাটা-ফাটা পেলেই ভিতরে ঢুকে ইনফেকশান করার ধান্ধায় আছে। আর আপনার প্রতিরক্ষা বাহিনী শ্বেতকণিকা প্রতিনিয়ত আপনাকে বাঁচাতে প্রাণপণ যুদ্ধ করে চলেছে, আপনার খবরই নেই।

প্রথমে যারা মোকাবিলার জন্য এগোলো, এদেরকে টহলরত অবস্থায় মানে রক্তে থাকা অবস্থায় বলে ‘মনোসাইট’ ব্রিগেড। চামড়ার নিচে ক্যাম্পে থাকলে বলে ‘ল্যাঙ্গারহ্যান্স সেল’ ব্রিগেড। অন্যান্য ক্যাম্পে থাকলে বলে ‘ম্যাক্রোফেজ’ ব্রিগেড। লিভারের ক্যান্টনমেন্টে থাকলে বলে ‘কাপফার্স সেল’ ব্রিগেড। হাড্ডির ক্যান্টনমেন্টে থাকলে বলে ‘অস্টিওক্লাস্ট’ ব্রিগেড। ক্যাম্পের ব্রিগেডগুলো সীমানা পাহারা আর মারামারি করে। আর ক্যান্টনমেন্টের ব্রিগেডগুলো মারামারির পাশাপাশি পরিবেশ সাফ রাখা, রক্তে ক্যালসিয়াম ঠিক রাখা এসব কাজও করে। আর জরুরি অবস্থা হল যাকে আমরা জ্বর বলি। লোকাল তাপমাত্রাও বাড়তে পারে আর কেন্দ্রীয় সরকার জারি করলে তখন জ্বর বলে। স্বল্প জ্বর আসলে ভালো জিনিস। ব্যাকটেরিয়ার বংশবিস্তার ও চলাফেরা কমে। ফোন পেয়ে যারা পরে রওনা দিল, ওদের নাম নিউট্রোফিল। মনোসাইট-নিউট্রোফিল হল সম্মুখযুদ্ধের জন্য ট্রেনিং নেওয়া। পদাতিক বাহিনী, ইনফ্যান্ট্রি। আর মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ার্স কোরের যারা আসবে ওদের নাম ফাইব্রোব্লাস্ট, আক্রান্ত স্থানকে মেরামত করে। রাগ ভেঙ্গেছে তো? তাহলে চলেন আমাদের দেহরাজ্যের অন্যান্য বাহিনীগুলোর সাথে পরিচিত হই?

মনোসাইট-নিউট্রোফিল ব্রিগেডের সেনারা অতিশয় ভদ্র। লাশ সরানোর সময় সহকর্মীদের সাথে সাথে শত্রুদেরগুলোও সরিয়ে ফেলে। আসলে সরিয়ে ফেলেনা, খেয়ে ফেলে। তবে শত্রুদের পোশাকগুলো রেখে দেয়। এই পোশাক, জুতো, হেলমেট, আইডি কার্ড— সব পাঠিয়ে দেয় ক্যান্টনমেন্টে আর্মি ইন্টেলিজেন্সে। ওরা এগুলো নিয়ে গবেষণা করে। এই পাঠিয়ে দেয়াকে বলে Antigen Presentation মানে ব্যাকটেরিয়ার বিশেষ বিশেষ অক্ষতিকর অংশ

ওরা প্রেজেন্ট করে। আর যারা গবেষণা করে ওদেরকে বলে ‘বি- লিম্ফোসাইট’। গবেষণার ইনফর্মেশনটা চলে যায় একাডেমীতে আর আর্মি অর্ডন্যান্স কোরে। একাডেমীতে কিছু সেনাকে ঐ জামা-জুতো-হেলমেট চিনিয়ে মুখস্ত করিয়ে দেয়া হয়, ঐ সেনাগুলোর নাম ‘মেমোরি সেল’। পরবর্তীতে ঐ জামাজুতো পরা কাউকে পেলেই আর কথা নেই, ডাইরেক্ট অ্যাকশন। স্বল্পতম সময়ে অ্যাটাক করে শেষ করে দেবে এরা। আগে থেকেই রেডি, পজিশন নিয়েই থাকে। আলাদা আলাদা জীবাণুর জন্য আলাদা আলাদা ব্রিগেড পজিশন নিয়ে থাকে। আর অর্ডন্যান্স কোরের কাজ হল ঐ জামাজুতো গবেষণা করে ঐ ধরনের জীবাণুর জন্য বিশেষ বোমা বানানো। একেক জীবাণুর জন্য একেক মডেলের বোমা, মানে অ্যান্টিবডি আরকি। এগুলোও রেডি থাকে, ঐ জামাজুতোওয়ালা কেউ ঢুকলেই হয়েছে। এই অর্ডন্যান্স কোরকে বলে ‘প্লাজমা সেল’। কী নিখুঁত দেখেছেন, কী সাজানো- পরিকল্পিত।

যদি শত্রু বেশি শক্তিশালী হয়, তখন? এখন তো আমরা অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, আধাখেঁচড়া খেয়ে শত্রুদেরকে মিউট্যান্ট বানিয়েছি। যেমন রুগী, তেমন ডাক্তার। রুগীরাও চায় ম্যাজিক, ডাক্তারও দেয় অ্যান্টিবায়োটিক। দুজনই খুশি। রুগীও অ্যান্টিবায়োটিকের ম্যাজিকে একদিন খেয়ে আর খায়না। লাভ হল শত্রুর। বেশি শক্তিশালী শত্রুর ক্ষেত্রে সারা দেহে সৈন্য উৎপাদন বেড়ে যায়। এটা দেখার জন্যই রক্ত পরীক্ষা করতে বলে। আপনারা তো মানেন না। আপনার দেহে ইনফেকশনের লেটেস্ট অবস্থা জানার জন্যই টেস্ট দেয়। সারা দেহে বা ঐ স্থানে জরুরি অবস্থা জারি হয়। বন্ধ রাস্তাগুলো খুলে দেয়, মানে বন্ধ রক্তনালীগুলো; যাতে বেশি সৈন্য পাঠানো যায়, ফলে লাল হয়ে যায়। আর রস জমে এলাকা ফুলে যায়, আমাদের সৈন্যদের চলাচল সহজ করার জন্য। শত্রু শক্তিশালী, আমাদের সৈন্যরা হাজারে হাজারে আত্মাহুতি দিতে থাকে বাঘের মত লড়ে। মৃতদেহ দিয়েই আটকে দেয় শত্রুর অগ্রযাত্রা। এই মৃতদেহগুলোকেই আমরা ‘পুঁজ’ নামে চিনি।

ভাইরাস নামে আরেকধরনের শত্রু আছে। এরা আরো ছোট। চুপিচুপি ঢুকে পরে দেহের ভিতর, ব্যাকটেরিয়ার মত ঢাকঢোল বাজিয়ে না। ওদের নিজেদের বাচ্চা দেবার ক্ষমতা নেই। ওরা আমাদের কোষে ঢুকে পড়ে, দখল করে নেয় কলকারখানাগুলো। তখন কারখানাগুলো আমাদের জিনিস না বানিয়ে ওদের দরকারী জিনিস বানায়। সেগুলো দিয়ে তৈরি হয় বাচ্চা ভাইরাস, লাখে লাখে। মানে আমাদের কোষ দখল করে ক্যান্টনমেন্ট বানায়। আমাদের আর্মি ইন্টেলিজেন্স আক্রান্ত কোষের সিগন্যালে জেনে যায় ঘটনা। দেহের জায়গায় জায়গায় আর্টিলারী ও আর্মার্ড ক্যান্টনমেন্ট আছে, লিম্ফ নোড বলে তাকে। ট্যাংক, মর্টার মানে আর্মির বোমারু ব্রিগেড; আমরা বলি NK cell (Natural Killer cell)। খবর পেয়ে হাজারে হাজারে আমাদের আর্টিলারী ও আর্মার্ড ব্রিগেড ফরোয়ার্ড করে ট্যাংক-মর্টার নিয়ে । আক্রান্ত কোষ অর্থাৎ শত্রুর ক্যান্টনমেন্টগুলোকেই উড়িয়ে দেয় নিমেষে। এইডসের ভাইরাস কেন এত সিরিয়াস জানেন তো? ওরা অন্য কোষ কে ক্যান্টনমেন্ট বানায়না, খোদ সেনাবাহিনীকেই আক্রমণ করে বসে। এক এক সেনাসদস্যকেই বানিয়ে ফেলে এক একটা ক্যান্টনমেন্ট। পুরো দেশ হয়ে পরে আর্মিবিহীন। ফলে অন্যান্য শত্রুজাতি (জীবাণুটীবাণু) এমনকি শত্রুরাজ্যের বেসামরিক পাবলিকও (যারা নর্মালি ক্ষতি করে না) লুটপাট করে। ধ্বংস হয়ে যায় দেশ।

আরো আছে আর্মি সিগন্যালস কোর। আমরা বলি বেসোফিল। যুদ্ধের ফ্রন্ট ও সেন্ট্রাল কমান্ডের মধ্যে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করে। জরুরি অবস্থা ও আর্মির অনুকূল পরিবেশ তৈরির নির্দেশ পাঠায়। যেমন হাঁচি, সর্দি বাড়িয়ে দেয় যাতে শত্রুকে ঝড়-বন্যা-জলোচ্ছ্বাস দিয়ে ঘায়েল করা যায় বা আরো শত্রু আসাটা বন্ধ করা যায়। হেপারিন নামে কেমিক্যাল তৈরি করে রক্তকে পাতলা করে যাতে রক্ত সবখানে সেনা বহন করে নিতে পারে। সিগন্যাল দিয়ে রাস্তা চওড়া করে, মানে রক্তনালী মোটা করে দেয় যাতে বেশি সেনা যেতে পারে একসাথে।

ইওসিনোফিল নামে আরেকটা ব্রিগেড আছে যারা সিগন্যালসের কাজও করে।
আবার সম্মুখযুদ্ধেও যায়। তবে বড় সাইজের শত্রুর সাথে, যেমন কৃমি।
কোন কৃমি পথ ভুলে রক্তে এলেই সেরেছে। হাজারে হাজারে সাদা-লাল চকরাবকরা পোশাকের সেনা এসে ফায়ারিং, গ্রেনেড চার্জ, বেয়নেট চার্জ করে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে বাবাজিকে।

লেখাটা এখানেই শেষ না। আরও চলবে ইনশাআল্লাহ। আজকে একটা কৌতুক দিয়ে শেষ করি। একটা সময় আর্মির কাজ ছিল শুধুই মারামারি করা। এখন আর্মির কাজ অনেক জটিল। যত জটিল হয়েছে তত প্রতিরক্ষা কার্যক্রমের সুবিধার্থে কাজকে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন ইউনিটে-কোরে ভাগ করা হয়েছে। মানব সভ্যতার হাজার বছর থেকে শিক্ষা নিয়ে সমরবিদরা মাথা খাটিয়ে বের করেছেন এসব কৌশলগত কর্মবণ্টন, তৈরি হয়েছে ‘মিলিটারি সায়েন্স’ নামে আলাদা শাস্ত্র। এবার কৌতুকটা বলব। আস্তে হাসবেন প্লিজ, জোরে হেসেন না।

“আপনার দেহের এই নিখুঁত ‘মিলিটারি সায়েন্স’ টা কিন্তু কোন পরিকল্পনা ছাড়াই হয়েছে। এলোমেলোভাবে, । লক্ষ বছরের ঝড়, ভূমিকম্প, ঠাডা পড়ে হুদাই এমনি এমনিতেই এই সূক্ষ্ম পারফেক্ট আর্মি ট্যাকটিক্স আপনার বডিতে ডেভলপ করেছে। এটা নিয়ে রাজনীতি করার কিছু নেই, অন্ধ মুমিন্স কোথাকার!”

আর্মির বন্ধুদের ট্যাগ করতে পারেন, মজা পাবেন ওনারা বেশি।

বরফ গলবেই...
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·SUNDAY, MAY 13, 2018

ভূমিকা:
১. লেখকের প্রচুর বয়স ও অভিজ্ঞতা
২. আল্লাহকে খুশি করার জন্য লেখা। কোন পক্ষের লাইক-সাপোর্ট পাওয়ার জন্য না।

৩. শব্দচয়নে খটকা লাগলে শব্দ বাদ দিয়ে ভাবটা ধরার চেষ্টা কাম্য
৪. ইগনোর করায় তো আমাদের জুড়ি নেই-ই। ইগনোর করার প্রতিভাটি কাজে লাগাব ইনশাআল্লাহ।

প্রথম অংশ: ভাইয়েরা আমার...

ক.
আমার বাপ-মায়ের খিদমত আমার দায়িত্ব, আমি বাধ্য। আমার স্ত্রী শরয়ীভাবে বাধ্য নন।এটুকু মেনে পরের আলোচনা।

খ.
খিদমত যদি ভদ্রমহিলা করেন তবে আমার এহসান করলেন। এই এহসানের বদলে আমি তাঁর এহসান করি কি না। আমার আচার ব্যবহারে তাঁর ‘দোষ ধরা’টা প্রকাশ পায়, না কি ‘এহসানের কারণে কৃতজ্ঞতা’ প্রকাশ পায়।

গ.
যদি এমন মুহসিনা স্ত্রী চান, কষে দুআ করুন। সদকা-ওমরাহ-গিলাফ ধরে- ইফতারে দুআ করতে থাকেন খেয়ে না খেয়ে।

ঘ.
বিষয়টা ইন জেনারেল একটা ফর্মুলায় ফেলে সমাধান করার মত না। এক এক পরিবার এক এক রকম। জি-বাংলা কালচার সব পরিবারে নেই। এমন পরিবারের সংখ্যা কম নয় যেখানে শাশুড়ি কাঁটা বেছে বেটার বউকে খাইয়ে দেয়। আবার অত্যাচারী শাশুড়িও বিরল নয়। হৈমন্তী টাইপ বউও যেমন আছে, কূটনী বউও অঢেল। কোন পরিবারে শ্বশুর-শাশুড়ি স্বামীর উপর পুরো/আংশিক নির্ভরশীল। কোন বাপ-মা ছেলের কামাই খাবেই না। সুতরাং একটা পোস্টে ফরম্যাট ডিফাইন করলে সমস্যা যাবে না।

ঙ.
আমি কি লেভেলের খেদমত করাতে চাই আমার বউকে দিয়ে। আমার মা-কে একটু এগিয়ে দেবেটেবে। ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেবে। মা একা থাকে, গল্পটল্প করবে। মা অসুস্থ থাকলে সকালে রান্নাটান্না করবে। মায়ের সঙ্গী হিসেবে চাই? নাকি বুয়া হিসেবে চাই? ঘরের সব কাজ করবে। মায়ের হুকুম তামিল করবে। পা টিপে দেবে। অবশ্যই প্রথমটুকুন।

চ.
আমার মা আল্লাহ না করুন শয্যাশায়ী হলে, আমি নিজেই আমার বউকে কাছে ঘেঁষতেও দেব না। খাওয়ানো- পায়খানা সাফ সব নিজ হাতে করব। নিয়ত এমন থাকা চাই। এমন সুবর্ণ সুযোগ বউকে কেন দিব। চাকরি ছুটি নিয়ে, দরকার হলে ছেড়েও।

ছ.
কোন ইস্যুতে আমার মা সবসময় ঠিক, দোষ বউয়ের। এটাও কাম্য না। ভাল স্বামী একজন ভাল ডিপ্লোম্যাট। বউয়ের থেকে চারিত্রিক সনদ নিয়ে আমাকে মায়ের পায়ের নিচে জান্নাতে যেতে হবে। কারও কাছে জালেম হওয়া যাবে না। এটা বিয়ে করার পর অটো শেখা হয়। টেনশন নাই। কিভাবে দোষ মিনিমাইজ করে পারস্পরিক সুধারণা রিবিল্ড করা যায়, এটা একটা আর্ট। পলিটিক্যালি হ্যান্ডল করতে হয়।‘স্বামীত্ব’ একটা ডিপ্লোমেটিক ও রাজনৈতিক পোস্ট।

জ.
মেয়েটা সব ছেড়ে আমার কাছে এসেছে। বাপ-মা, বান্ধবী, ভাই-বোন, পরিচিত পরিবেশ। আমাকে তো কিছুই ছাড়তে হয়নি। আমি যদি তার বাপ-মা, ভাইবোন, বান্ধবীর রিপ্লেসমেন্ট হতে না পারি, আমি মনে করি আমি স্বামী হিসেবে ব্যর্থ। একটা ছোট চারাগাছ জন্মভূমি থেকে উপড়ে এনে আমার বাগানে লাগালাম। আমাকে হতে হবে বেড়া। ইমোশনাল, মনস্তাত্বিক, ব্যক্তিত্বের প্রতিকূলতা আমি আগে ফেস করব। তার দুনিয়াবি শূন্যতা

পূরণ না করলে সে আমার দীনী শূন্যতা পূরণটা করবে কিভাবে? মাইন্ড ইট, মেয়েটা শুধু আপনার জন্য এতগুলো ত্যাগ স্বীকার করেছে। আপনার কাস্টডিতে সে আছে, আর আপনি তাকে ইমোশনালি/পরিবেশগতভাবে প্রোটেক্ট করতে পারছেন না। পুরুষত্বের গায়রতে লাগে?

ঝ.
সব পরিবারে দীনের বুঝ সমান না। ভাসুর-দেবরের দীনের বুঝ নাই। আমার বউয়ের ফরজ পর্দা কীভাবে হবে। গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য শাদী বানালাম। এখন যে মেয়ের খালু-ফুফার সামনে পর্যন্ত পর্দা তরক হয়নাই। আমার ঘরে এসে ফরজ তরক হচ্ছে। এক গুনাহ থেকে বাঁচতে গিয়ে আরেক গুনাহের ভাগী হলাম। বেশ তো। স্বামী স্ট্রিক্ট হতে হবে স্ত্রীর পর্দার ব্যাপারে। এভেইলেবল স্থানেই কিভাবে নিশ্চিত করা যায় সে চেষ্টা করতে হবে।

ঞ.
আমার স্ত্রীর আমার মা-কে প্রয়োজন নেই। তার ওসব আগে থেকেই ছিল। ছিলাম না কেবল আমি। শুধু আমার জন্য সে এসেছে। আর আমার কিন্তু বিবিকেও দরকার, মা-কেও দরকার। তাই ঠান্ডা। কোন পাশের কথায় তাওয়া যেন গরম না হয়। স্ট্রেট-ফরোয়ার্ড হওয়া যাবে না এই জায়গায়। যেকোন অভিযোগ প্রসেসিং করে পাড়তে হবে। কাঁচের বোতল, হ্যান্ডল উইথ কেয়ার (হাদিস)।

ট.
নবীজীর ফ্যামিলি লাইফ নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক রচনার জন্য উলামাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ‘প্রিয়তমা' একটা সুন্দর বই। আম্মাজানদের মত বিবি চাওয়ার আগে নিজেকে নবীজীর মত শ্রেষ্ঠ স্বামী হিসেবে তৈরি করা চাই। উফ… সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ঠ.
এটা ইসলামিক ফেমিনিজম না, এটা আমি মনে করি আমাদের হাতের কামাই। হলিস্টিক ইসলামিক প্র্যাকটিস না থাকায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা মেয়েদের ঐ স্বীকৃতিটুকু দিইনি যেটা ইসলাম তাদের দিয়েছে। তাদের কাজের স্বীকৃতি ও পারিবারিক মর্যাদা না দিয়ে বরং খাবারে দোষ ধরা-যৌতুক- প্রহার এসব অনৈসলামিক আচরণ করে যে অনাস্থা আমরা অর্জন করেছি তারই বহিঃপ্রকাশ এগুলো। সাথে যোগ হয়েছে জি-বাংলা ইফেক্ট।
এটা রিভার্স করার একমাত্র টেকনিক হল, আমরা পুরুষরা ঠিক হয়ে যাওয়া। আমার স্ত্রী একজন মুসলিম হিসেবে, প্রতিবেশী হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, আমার সন্তানের মা হিসেবে যেখানে যতটুকু হক/ইকরাম/ইহসান তার প্রাপ্য সেটুকু তাকে দেওয়া। বিলিভ মি, আমরা এটা করা শুরু করলে তারা আমাদের চেয়েও বেশি করবে। তাদের সফটওয়ার এভাবেই বানানো।

ড.
এহসানের বদলা এহসান। মেয়েরা হল এমপ্লিফায়ারের মত। যা শোনে তাও বড় করে বলে। যা পায়, তাও বড় করে দেয়। যদি কারও আহলিয়া শ্বশুর-শাশুড়ির খিদমত করতে সরাসরি ইনকার করে, স্বামীর প্রতি উপদেশ: আপনি বউয়ের বাপ-মায়ের খিদমত/ খোঁজখবর করা শুরু করুন। কষে লেগে যান, দেখেন না বিনিময়ে কী রিএকশন আসে। ইনশাআল্লাহ ১ করলে ১০ ফেরত পাবেন।

দ্বিতীয়াংশ: বোনেরা তোমার....

ক.
সিনারিও ১:
বাপ-মা বয়স্ক এবং ছেলের উপর একদম নির্ভরশীল। অধিকাংশ নববিবাহিত

ছেলেরই দুই বাসা ভাড়া করে একটাতে বাপ-মা, একটাতে বউ রাখার সামর্থ্য নেই। আর্থিক ও শারীরিকভাবে নির্ভরশীল শ্বশুর-শাশুড়িকে কোথায় ফেলতে চাচ্ছেন?

খ.
সিনারিও ২:
বাপ-মা শারীরিকভাবে নির্ভরশীল। তবে আর্থিকভাবে না। আপনার স্বামী আপনাকে নিয়ে আলাদা বাসায়। কিন্তু ছেলের দায়িত্ব বলে সে অফিস থেকে সোজা মায়ের কাছে যায়। খায় কি খায় না, মায়ের সেবাযত্ন করে, বাজার করে নিয়ে যায়, ওষুধ খাওয়ায়ে মশারি টাঙায়ে ঘুম পাড়ায়ে এরপর আসে। কেয়ারটেকার তো সন্ধ্যার পর থাকবে না। রাতে ক্লান্ত হয়ে আবার বাজার নিয়ে বাড়ি ফেরে। হ্যাপি?
আপনি এক বাসায় থাকলে তার জন্য সহজ হত। আপনার হকও, মায়ের হকও আদায় হত। আর যদি চান যে, প্রতিদিন মায়ের বাসায় যাবার কি দরকার, তাহলে বদদ্বীন কাউকে বিয়ে করুন, যে কম কম যাবে।
আর স্বামীর শ্রম লাঘব করতে যদি মন না চায়, তবে নিজের ভালবাসাকে প্রশ্ন করুন।

গ.
সিনারিও ৩:
সবাই সুস্থ। জাস্ট এক বাসায় থাকলে আপনার স্বামীর বাড়ি ভাড়াটা বাঁচে। কিছু সেভিংস থাকে সংসারে। বেচারা একটু রিলাক্স থাকে।কী করণীয়?

ঘ.
শ্বশুর-শাশুড়ির খিদমত আপনার ওপর ফরজ না, নো ডাউট। কিন্তু নফল তো। বুড়োবুড়ি আর ক'দিন। সংসার তো আপনারই। অনেক তো সবর করলেন। আর ক'টা দিনে যদি কিছু দুআ পাওয়া যায়, লস তো নেই। চলে গেলে তো চান্স শেষ।

ঙ.
স্বামীর ইতায়াত তো জরুরী আপনার উপর, যতক্ষণ না সে নাজায়েয কাজের আদেশ দেয়। স্বামীর অনুরোধ যদি হয়, আমি তো বাইরে বাইরে থাকি, আমার বাপমাকে একটু যদি দেখতে। এটা এখন কি আপনার জন্য? নাজায়েয হুকুম তো দেয়নি। স্বামীবাবুরা, ভাষাটা অনুরোধের করলেই কিন্তু কাজ ৯০% হাসিল হয়ে গেল। অনুরোধে যা হয়, তা কি আদেশে হয়? এটাই বেডাগোরে বুঝাতে পারলাম না।

চ.
ক্যাচাল লাগার আগে একসাথে থাকার অপশনটা ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। শুরুতেই শর্ত দিলেন, আমাকে আলাদা বাসায় রাখতে হবে। (আলাদা ঘর হলেই তা আদায় হবে, বাসা জরুরি নয়)। এটা আপনার হবু ভালবাসার মানুষটার দ্বারা কতটুকু সম্ভব। বুনিয়াদ কি ভালবাসা, নাকি কমফোর্ট। যতক্ষণ একসাথে থাকার সুযোগটা নেয়া যায়, নিন না। এবং মেজরিটি দ্বীনদার মেয়েরা নেনও। কমসে কম স্বামীর দিকে চেয়ে।

ছ.
একেবারে লেজেগোবরে অবস্থা হলে পৃথক হবার অপশন তো আছেই। তবে আগেই না। বদদ্বীনদের কষ্ট না হতে পারে, দ্বীনদারদের জন্য খুব কঠিন। এরা না পারে উপরি কামাতে, না পারে মায়ের হক ভুলতে। আলাদা সংসারের অপশনটা শেষ স্টেপ হিসেবে নেওয়াটা ভাল, শুরু হিসেবে নয়।

জ.
স্বামীর হক কিন্তু অনেক। বোনেরা অনেকেই কিন্তু পরিষ্কার ধারণা রাখেন না। আলোচ্য নয় বলে এড়িয়ে যাচ্ছি। স্পষ্ট হাদিসে আছে: ছেলের উপর মায়ের হক বেশি, আর মেয়ের উপর তার স্বামীর। তাই স্বামীর হক আর নিজ পিতামাতার হককে প্রতিপক্ষ বানাবেন না। এবং ভাইস ভার্সা। দীনদার স্বামী অবশ্যই আপনার বাবামায়ের খোঁজখবর করবে। যদি ঝামেলা করে, আপনি তার বাপমায়ের খিদমতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। টনক নড়বেই, ছেলেদের

প্রচুর ইগো। ইগোতে লাগবে: বউটা আমার কত করে, আমি ওর কিছুই করি না? ইনশাআল্লাহ।

ঝ.
আর হ্যাঁ, আর্লি বিয়ের যে সামাজিক আন্দোলন শুরু হয়েছে। বিশেষ করে দ্বীনদার অংশটাতে। সেখানে আর্লি বিয়ে করে আলাদা থাকা একটা ২২/২৫ বছরের ছেলের জন্য সম্ভব? তাহলে আপনারা বদদীন কালচারের মত ৩৫+ বর খুঁজেন। যে আপনাকে আলাদা বাসায় রাখবে। সবাই দীনের জন্যই স্যাক্রিফাইস করছি, এটা মনে করলে দেখবেন দিনশেষ সবই সুখ। আল্লাহ সহজ করুন।আমিন।

তৃতীয়াংশ: হবু শ্বশুর-শাশুড়িরা

ক. যদি কোনভাবে সম্ভব হয় ওদের বিয়ের পর আলাদা সংসার করে দিন। সম্পর্ক গঠন, সেক্সুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সংকোচ দূরীকরণে এটা আসলেই দরকার।

খ. বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থায় যদি আমরা আর্লি ম্যারেজকে প্রমোট করতে চাই তবে এটা (আলাদা বাসা) অসম্ভবপ্রায়। সেক্ষেত্রে ওদের প্রাইভেসি এরিয়া শুধু ওদের ঘরটুকু না রেখে মাঝেমধ্যে প্রশস্ত করে দিন। নবদম্পতিকে রেখে আপনারা মাঝেমাঝে হুদাই ঘুরতে চলে যান এদিক ওদিক। লেট দেম ফ্লাই ইনসাইড।

গ. আপনার মেয়ের সাথে যেমন আচরণ প্রত্যাশা করেন, বেটার বউয়ের সাথেও তেমন আচরণ করা চাই। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বর্জন করুন।

ঘ. বউয়ের দোষ চোখে পড়লে বউকে না, ছেলেকে বলুন। ছেলের মধ্যে ডিপ্লোমেসি গড়ে উঠুক। সফটলি হ্যান্ডেল করার অভ্যাস হোক। কিভাবে ডিপ্লোম্যাটিকভাবে একটা কথা বলা যায় ছেলেকে শেখান।

ঙ. মনে রাখবেন, আপনি বেটার বউয়ের গার্জিয়ান নন। আপনার ছেলে তার স্ত্রীর অভিভাবক। সুতরাং তার কোন কিছু আপনি সংশোধন করবেন না, আপনার ছেলে করবে। নিজেকে প্রতিপক্ষ বানাবেন না, আস্থাভাজন হোন। আপনার ছেলের ব্যাপারে কমপ্লেন যেন আপনার কাছে এসে করতে পারে মেয়েটা, এতটা আস্থা তৈরি করুন।

চ.
শাশুড়িজী, ৩০ বছর আগে আপনার চোখের স্বপ্নটা মনে আছে তো- ‘নিজের একটা সংসার’। একই স্বপ্ন নিয়ে ঐ বাচ্চা মেয়েটাও আপনার ঘরে এসেছে। তাকে কিছুটা স্বায়ত্তশাসন দিন। আপনি যেটুকু পাননি, তাকে ওটুকু দিন। এরপর দূরে দাঁড়িয়ে দেখুন না কত সুখ। নিজে কষ্ট করে রেঁধে আরেকজনকে চেটেপুটে খেতে দেখে সুখ না? তুলনাহীন সুখ।

ছ.
আপনার ছেলে আপনারই আছে। এসব জি-জলসা টাইপ মানসিকতা আর কত। বরং আলাদা করে দিয়ে দেখবেন ভালবাসা বাড়বে। আরও বেশি মা-ন্যাওটা হয়ে যাবে। কাছে থাকলে যতবার আসত, একটু দূরে ঠেলে দিলে আরও তিনগুণ বেশি মা মা করে আসবে। বেটার বউও আপনাকে বিচারক মানবে। জমে বরফ।

জ.
ফ্রী হোন। বউ-শাশুড়ি সম্পর্কটা হোক দুই প্রজন্মের বন্ধুত্ব।

উপসংহার:
বিষয়টা এত বেশি সাবজেক্টিভ। প্রত্যেকে নিজ রোল প্লে করতে হবে।
অবজেক্টিভ সমাধান (আমাদের কী করণীয়) কিন্তু খুঁজলে হবে না। আমার

যা করার কথা সেটুকু আমি করছি কি না।
আর্থিক- স্বাস্থ্যগত-দীনদারি সব বিষয়গুলো সামনে এনে স্বামী- স্ত্রী পরামর্শ করুন। আলিমগণের কারো পরামর্শ নেয়াকে জরুরী মনে করুন। দীনকে সামনে রেখে আল্লাহর খুশিকে উদ্দেশ্য বানিয়ে ফয়সালা করুন। যে সিদ্ধান্ত আল্লাহর খুশির জন্য, তাতে কেউ নাখোশ হলে তাকেও আল্লাহ নিজ দায়িত্বে খুশ করে দিবেন (হাদিস)। আলিমগণের পরামর্শ নিলে বাস্তবায়নে হিম্মত পাবেন, তৃপ্তি পাবেন। এতে ঘরের খবর পরে জানবে ভাবছেন? আলিমগণ আমাদের অভিভাবক, ওনারা পরের মানুষ না। খুজলি হলে ডাক্তারকে বলতে লজ্জা পান? এটাও তেমনি। সব বিষয়ে কোন প্রিয় আস্থাভাজন আলিমকে ইনভলভ করুন। আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাহওয়ালা পারিবারিক জীবন দান করুন। সকল ক্ষেত্রে সুন্নাহ জিন্দা রার তাওফীক ফরমান। আমীন। আমীন।

(ছেলেদের বিবাহ-পূর্ব কাউন্সেলিং- এর দোকান খুলব ভাবতেসি। মাথার মিদ্যে খালি পরামর্শ গিজগিজ করে। আসলে বয়স তো প্রচুর। শেষ)

পরিবারে দাওয়াহ: কিছু কৌশল
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·SUNDAY, MAY 27, 2018

এই নোটের পাঠকদের মধ্যে বিভিন্ন মানহাজের ভাইবোনেরা আছেন। আসলে আমরা কেউই কিন্তু এই আদর্শিক প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত নই। ভালো লাগার দিক থেকে কেউ তাবলীগী, তাসাউউফপন্থী, সালাফী, রেজভী, জামাআতে ইসলামপন্থী, কোন না কোন আদর্শঘেঁষা আমরা সবাই। সবার আদর্শের দালিলিক অংশটুকুর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শুরু করছি। নোটের প্রথমে কিছুটা তবলীগের কথা আছে। বিরক্তি ওভারকাম করে শেষ পর্যন্ত পড়ার অনুরোধ। রতন পেতে সমুদ্র সেঁচতে হয়, যমীন খুঁড়তে হয়। শুভকামনা।

বিরক্ত হবেন না:

২০১৫ সালের কোন এক এশার নামাযের পর। লালকুঠি জামে মসজিদ, মাজার রোড, গাবতলী। ৩ দিনের জামাতের আজ শেষ দিন। এই ৩ দিন জামাত মসজিদের বারান্দায় ছিল, আমল বারান্দায়ই হয়েছে। ভিতরে ঢুকতে দেয়া হয়নি, মাজারপন্থী কমিটির নিষেধ, ওহাবীদের থাকতে দেয়া যাবে না। এশা বাদ তালিম শেষে মহল্লার জনা পঞ্চাশেক লোকের মজমা। শুনেছে এই জামাতে সরকারের ইন সার্ভিস একজন জয়েন্ট সেক্রেটারী সাহেব আছেন।

- স্যার, আপনি কেন তবলীগে আসলেন সেই কাহিনী শোনান।

সবার অনুরোধে সফেদ দাড়িবিশিষ্ট অফিসার ভদ্রলোক প্রায় আধাঘণ্টা নিজের ঘটনা শোনালেন। সারাংশ আপনাদের খিদমতে তুলে ধরছি ওনার জবানীতেই:

“ আমার বড়ছেলে কিছুটা উগ্র জীবনযাপন করত। ছাত্ররাজনীতি থেকে শুরু করে বাপমাকে আতঙ্কে রাখার মত যা যা আছে সবই করত। কর্কশ ব্যবহার তো আছেই। নামাযকালামের তো খবরই নেই। মেডিকেলের ফাইনাল পরীক্ষা শেষে আমার ছেলে এসে বলে, আব্বা, চিল্লায় যাব, জামাকাপড় বানিয়ে দাও। পারিপার্শ্বিক দেশের অবস্থা দেখে আমার মনের সায় ছিলনা, কিন্তু ছেলে দীনের কাজে যাবে। বাধা দিলে আল্লাহ আবার নারাজ হয় কি না এই ভয়ে অনুমতি দিলাম। রেজাল্ট খারাপ করে ফেরত আসল, পরীক্ষা দিয়ে আবার গেল। তাও বাধা দিলামনা, কিন্তু মনে মনে ওর এসব কীর্তিকলাপ মোটেও পছন্দ হচ্ছিল না। ৩ চিল্লা শেষে যখন ফেরত আসল, মা-বোনকে নিয়ে প্রতিদিন তালিম করত। আমার কিছুটা বিরক্তই লাগত, একই বই প্রতিদিন পড়ার কি আছে। কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই ফলাফল দেখতে শুরু করলাম। বাসার টিভিটা একন আমি ছাড়া আর কেউ দেখেনা, আমার স্ত্রী জি-বাংলার আর মেয়ে কার্টুন দেখার পোকা ছিল। ক্লাস ফাইভ পড়ুয়া মেয়েটাও ফুল পর্দা করে বাইরে যাওয়া শুরু করল,

এমনকি কাজের মেয়েটাও। আমি বুঝতে পারছিলাম যা হচ্ছে ভালই হচ্ছে কিন্তু কেন যেন মানতে পারছিলাম না।

আমার স্ত্রী-কন্যা পাশেই এক বাসায় সাপ্তাহিক তালিমে যেত। আমার ছেলে যখন বেটার-বউকে নিয়ে চিল্লায় গেল তখন এমন রাগ হল, স্ত্রী- কন্যার তালিমে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। বড়ছেলের উপর আরও রাগ হল যখন আমার আপত্তি সত্তেও ছোটছেলেটাও চিল্লায় গেল।

কিন্তু আমি টের পাচ্ছিলাম আমার উচ্ছৃঙ্খল বড়ছেলের জীবনে আশ্চর্য এক শৃঙ্খলা এসেছে। তার পোশাকআশাক, চলাফেরা, কথাবার্তায় গাম্ভীর্য, ম্যাচুরিটি, শান্তভাব, নম্রতা, আত্মবিশ্বাস, সুবিবেচনা, সহনশীলতা এসেছে। যা আগে চিন্তাও করা যেত না। একই প্রভাব ছোটছেলের জীবনেও পেলাম। ছেলেদের ভিতর যে গুণগুলোর স্বপ্ন দেখতাম, তা বাস্তবে লক্ষ্য করলাম। মানুষ গড়ার, সুকুমারবৃত্তি অর্জনের জায়গা তাহলে এটাই। আমিও নিয়ত করেছি রিটায়ারমেন্টের পর ৩ চিল্লার জন্য যাব ইনশাআল্লাহ। আমার জন্য দুআ করবেন।“

শুনে মজমায় একজন কেঁদেকেটে একসা হচ্ছে। জামাতের আমীর সাপ। শোকরের কান্না। ইয়া রাব্বি, আমি কিছু করিনাই। সব আপনে করেছেন। আপনে একাই করেন। কেউ কোন ক্ষমতা রাখে না। “লাা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ, সাদাকাল্লাহু ওয়াহদাহ, ওয়া নাছারা আবদাহ”। ২০১৬ সালে আব্বু অবসরে যান, ৩ চিল্লা পুরা করেন। ২টা টিভি বাসা থেকে বের করে দেন। আম্মুকে নিয়ে ১৫ দিন সময় দেন তবলীগে। আমার বাসায় মহল্লার মহিলাদের সাপ্তাহিক তালিমের পয়েন্ট অনুমোদন হয়। বিল্ডিংয়ের মেয়ে বাচ্চারা আমার স্ত্রীর কাছে কুরআন শিখতে আসে। প্রতি রমজান বাসায় খতম তারাবীহ হয়, বিল্ডিংয়ের পুরুষ-মহিলা দুই ফ্ল্যাটে। আলহামদুলিল্লাহ। হেদায়েত দেনেওয়ালা একমাত্র আল্লাহ। বান্দা এমনকি নবীরাসূলগণও হেদায়েত দেবার ব্যাপারে অসহায়। নবীর নিজ পিতৃসম চাচা, নবীর স্ত্রী, নবীর সন্তানও হেদায়েত পায়নি। আমাদের

উপর হুকুম হল আমরা দাওয়াত দিব, হিদায়াতের মাধ্যম হব, আসবাব তৈরি করব, পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করব। দাওয়াহর ব্যাপারে নিজ পিতামাতা, স্বামী বা স্ত্রী, এডাল্ট সন্তান এরা প্রথম হকদার দাওয়াহ পাবার। কিন্তু এদের দাওয়াহ বিষয়টা কিছুটা নাজুক। আলাদা কিছু হিকমাহর প্রয়োজন হয়। কাট কাট দাওয়াতে, চাপাচাপিতে অন্তর কঠিন হয়ে যাবার সম্ভাবনাও থেকে যায়। এটা নিয়েই আজকের আলোচনা।

ক. পিতামাতাকে দাওয়াহ:

আমি নিজে থেকে আসলে কিছুই করিনি। তবলীগে ৩ চিল্লা শেষে বাড়ি ফেরার সময় “ওয়াপসী কথা” নামে একটা বয়ান হয়। সোজা বাংলায় Lecture on return বা ফিরতি বয়ান। সেখানে ফ্যামিলিতে কাজ করার উপরও একটা অংশ থাকে। সেখান থেকে কিছু পয়েন্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করব। যদি কারো কাজে আসে। আল্লাহ আমাদের নিয়তকে কবুল করুন।

• প্রথমে নিজেকে দীনের উপর মজবুত হতে হবে। নিজের জীবনযাত্রা, চালচলনে দৃশ্যমান পরিবর্তন আসতে হবে। আগের আমি আর বর্তমান আমি-র মাঝে আমার পিতামাতা যেন পার্থক্য ধরতে পারেন।

• যখন আপনি দীন পালন শুরু করেছেন, তখন সবাই আপনাকে অবজার্ভ করছে। আপনি একটা সাদা কাপড়। একটা কালো বিন্দুতেও চোখ আটকাবে। তাই কথাবার্তা ব্যবহারে দীনের খেলাফ যেন না হয়। পিতামাতার সাথে আরও নরম, ভাইবোনদের সাথে আরও আন্তরিক। তাবলীগে দাঈর সিফত মুখস্ত করিয়েছে। শুনবেন? দলিল চাইলে দিতে পারবনা। “আকাশের মত বিশাল/

পাহাড়ের মত অটল/ মাটির মত নরম/বরফের মত ঠাণ্ডা”। শয়তান আপনার পিছনে লাগবে, লাগাবে; রিএক্ট করা যাবে না।

• পিতামাতাকে ক্রমাগত জবানী দাওয়াত দিলে বিগড়ে যাবার উদাহরণ আছে। তোকে পেটে ধরেছি, তোর চেয়ে কম বুঝি? ছেলে হয়ে বাপকে জ্ঞান দিচ্ছি, এটা সব বাবার ভাল না ও লাগতে পারে। মুখে না বললেও মনক্ষুণ্ন হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই পরিবারে আমলী দাওয়াত বেশি কার্যকর জবানী দাওয়াতের চেয়ে। হ্যাঁ জবানী দাওয়াত দিবেন, তবে আপনি না। আসছি সে প্রসঙ্গে। বাসায় আগের চেয়ে বেশি উন্নত আখলাক দেখান।

• বাসায় দিনের নির্দিষ্ট সময় হাদিসের তালিম করুন। রিয়াজুস সলিহীন / মু্ন্তাখাব হাদিস। প্রশ্ন আসতে পারে বুখারী/ মুসলিম কেন নয়? বুখারী/মুসলিমে অনেক হাদিস মাসআলা সংক্রান্ত। যাদের দীনের বুঝ নেই, সে পরদিন আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। পুরস্কারের কথা শুনলে পরদিন আবার বসবে। এজন্য রিয়াজুস সলিহীন/মুন্তাখাব হাদিস। ফাজায়েলে আমাল নিয়ে কিছু কথা হয় বলে উল্লেখ করলাম না। কিছু জিনিস বাদ দিলে ফাজায়েলে আমাল বইটা অন্তরে খুব প্রভাব ফেলে। ওতে একটা হাদিসের সাথে সাথে সে সম্পর্কিত সাহাবীদের কওল, সালাফদের কওল সব একাসাথে জমা করা আছে। একসাথে এত কথা অন্তরে হিট করে। সম্ভব হলে ইখতিলাফী অংশটুকু মার্ক করে নিয়ে বাকিটুকু তালিম করতে পারেন বাসায়। যে বই-ই পড়ুন চ্যাপ্টার মার্ক দিয়ে সব চ্যাপ্টার থেকে একটা দুটা হাদিস পড়বেন, তাহলে বৈচিত্র থাকবে। আগ্রহ ধরে রাখা যাবে।

এটা খুব ইফেক্টিভ। আপনি নিজে দাওয়াত না দিয়ে নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়ে, তাঁর কথা দিয়ে দাওয়াত দিচ্ছেন। নামাযের তাগিদ শোনাচ্ছেন, সাদাকার লাভ শোনাচ্ছেন। নবীজী ও সালাফদের জবানীতে। আপনার দাওয়াতে মাইন্ড করার সুযোগও থাকলো না, দাওয়াত দেয়াও হল। নবীর কথার নূর পরিবারের অন্তরে পৌঁছানোও হল।

পয়লা দিন থেকেই বসবে এমন ভাববেন না। আমার বাবাও প্রথম ২ বছর বসেননি। পারিনি বসাতে। মা-বোনও প্রথম প্রথম নাও বসতে পারে। তখন কি করবেন? একা একাই পড়বেন। প্রতিদিন, নির্দিষ্ট সময়ে। জোরে আশপাশ শুনিয়ে। আর বসার আগে সবাইকে ডাকবেন, আম্মু এসো একটা হাদিস শুনি। এই বল্টু আয়, একটা আয়াত শোন। আব্বু এসোনা একটা হাদিস শুনো, দেখ কত সুন্দর সুন্দর কথা। একদিন-দুইদিন-দশদিন কেউ বসলো না। একদিন না একদিন ছোটভাইটা বসবে, বোনটা বসবে। একদিন মা এসে বসবে, পড়তো বাপ শুনি তুই কি পড়িস। ব্যস শুনিয়ে দিলেন পুরস্কারের ৫টা হাদিস। মজা পেয়ে গেল। আপনার কাজ অর্ধেক শেষ। একবার বসাতে পারলেই হল। আর বলতে হবেনা মাকে সিরিয়াল না দেখতে, বোনকে পর্দা করতে আর বাপকে দাড়ি রাখতে। তালিমের অভ্যাস করান, ব্যস।

• জবানী দাওয়াত নিজে দিলেন না (বাপমাকে)। ভাইবোনদের নাসীহা দিবেন সমস্যা নেই। আরেকজনকে দিয়ে দেয়াবেন। আপনার প্রিয় আলিমকে বাসায় দাওয়াত করেন, বাপকে নাসীহা করান। মহল্লার কোন দীনদার সাথে দুনিয়াবি সম্মানী (দুনিয়ার বড়ত্ব আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল বলে) কোন ব্যক্তি থাকলে তাকে বাসায় নিন, পরিচয় করান, নাসীহা করান। তবে

অবশ্যই তাকে বাবামায়ের মনমানসিকতার আপডেট জানিয়ে বাসায় নিবেন, তাহলে কোন লাইনে নাসীহা করতে হবে তিনি বুঝে নিবেন।

নিজের কথা বলি, যদিও বলা ঠিক না। আমি আমার বাবাকে নাসীহা করার জন্য সাবেক অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, মেডিকেল প্রফেসর ইত্যাদি তাবলীগের মুরব্বিদের বাসায় নিয়েছি, দাওয়াত করেছি। আব্বুর সাথে আলাপ করিয়েছি। মালয়েশিয়ান জামাতের রিটায়ার্ড ভার্সিটি প্রফেসর, চাইনিজ জামাতের উইঘুর আলিম, ইন্দোনেশিয়ান ডাক্তারসহ যত বিদেশী জামাত আসত মহল্লার মসজিদে আমীর সাহেবকে বাসায় নিতাম শুধু আব্বুর জন্য। আব্বুও খুশি হতেন। হোস্টেলে জার্মান জামাত এলো সেবার। নর্ডিক নওমুসলিম হামযার বয়ানে আব্বু অফিস থেকে এলেন শুনতে। এভাবেই নিজে আখলাক দেখান, আর নাসীহার জন্য অন্য কাউকে ব্যবহার করুন। হিদায়াত আল্লাহর হাতে, আমাদের কাজ পরিবেশ বানানো।

• এবার সবচেয়ে বড় জিনিসের কথা বলব। দুআ। পরিবারের জন্য দুআ করতে হবে। আল্লাহর আদেশ: নিজেকে বাঁচাও, নিজের পরিবারকে আগুন থেকে বাঁচাও। আপনার সামনে আপনার পরিবারকে হেঁচড়ে জাহান্নামে নেয়া হবে। সেদিন কেঁদেকেটে লাভ হবে না। আজকে কাঁদুন, যদি হওয়ার থাকে, আজকে কাঁদলে কিছু লাভ হতে পারে। আমি পরের এক চিল্লায় প্রতি ওয়াক্ত নামাযে শুধু আমার পরিবার স্পেশালি আব্বু জন্য দুআ করেছি। সদকা করে করে দুআ করেছি। আবার বুদ্ধি করে এভাবে দুআ করেছি: আয় আল্লাহ, পুরো উম্মাতের আব্বাদেরকে পরিবারকে পুরা পুরা হিদায়াত দাও। সব আব্বুদেরকে কবুল করে নাও। দুআকে প্রশস্ত করলে নাকি নিজের ক্ষেত্রে আগে কবুল হয়। এমন না যে আমার দুআর কারণে, আব্বু আগে থেকেই দীনমুখী ছিলেন। আল্লাহর আযাবের ভয়েই তো আমাকে বাধা দেননি। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সহজ করেছেন। রোজা রেখে রেখে পরিবারের জন্য দুআ করুন। রহমতের দরিয়ায় জোশ উঠলে আর কতক্ষণ।

স্ত্রীকে দাওয়াহ:

কোন এক চিল্লার সফরে একজন আমীর সাহেব পেয়েছিলাম। প্রতিদিন ‘মুযাকারা' নামের যে আমলটা হত তাতে উনি কোন না কোন কথায় ‘ঘরওয়ালীকে কিভাবে ঠিক করা যায়' এই টপিকটা তুলে আনতেন। বলতেন, ঘরওয়ালী যদি সহযোগিতা না করে তবে দাওয়াত দেয়া ও নিজে দীনের উপর থাকা কোনটাই সম্ভব হবে না। ওনার বাতলানো টেকনিক থেকে কিছু যদি আপনাদের কাজে লাগে দেখেন:

• মহিলারা স্বামীর অনুগামী হয়। স্বামীর আমলের দ্বারা
মুতাসসির (প্রভাবিত) হয়। তাই স্বামীকে আমল ঠিক করতে হবে, দীনের ওপর মজবুত হতে হবে। তা দেখে স্ত্রী প্রভাবিত হবে। স্বামীর পরিবর্তন, নম্রতা, তিলওয়াত, তাহাজ্জুদ, দুআ, কান্নাকাটি দেখে দেখে তার হৃদয়দ্বারে করাঘাত পড়বে। একসময় খুলে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনার মজবুতি দেখে তার অনুভূতি হবে ‘এটা ইম্পর্টেন্ট কিছু'। আর আপনি যদি দীন হালকাভাবে মানেন, সেও গুরুত্ব বুঝবে না।

• তালিমের কৌশলটা ফলো করতেই হবে। বাকি কাজ নবীজীর হাদিসেই
করবে।

• বন্ধুদের মধ্যে/প্রতিবেশীদের মধ্যে যার স্ত্রী দীনদার তাকে
স্ত্রীসহ বাসায় দাওয়াত করুন। দুজনকে বসিয়ে দিন। বন্ধুত্ব হোক। আস্তে আস্তে নাসীহা হবে পরের দিনগুলোতে। মেয়েরা বাঁকা হাড়ের মত (হাদিস)। বলেকয়ে শেখাতে পারবেন না। ওনারা দেখে শিখবে। দীনী জীবন

দেখানোর চেষ্টা করুন। যার বাসায় দীনী পরিবেশ আছে, ছলেবলেকৌশলে বেশি বেশি সে বাসায় নিয়ে যান।

স্যরি। আবার তাবলীগ। তাবলীগে মহিলাদের সাপ্তাহিক জমায়েতের একটা আমল আছে। এক বা একাধিক মসজিদ মহল্লার মহিলারা এক বাসায় সমবেত হয়। পরিচয়, হাদিস পড়া, ঈমানী আলোচনা হয়। মাসে একবার পুরুষ মাইক দিয়ে বয়ান করে। ঐ বাসাটা কাকরাইল থেকে দেখে দীনী পরিবেশ নিশ্চিত করে অনুমোদন দেয়া হয়। আলহামদুলিল্লাহ আমার মহল্লার পয়েন্টটা আমার বাসায় আল্লাহ দিয়েছেন। এক সাথীভাই স্ত্রী নিয়ে বড্ড পেরেশান ছিলেন। অনেক কষ্টে হাতেপায়ে ধরে স্ত্রীকে আমার বাসায় আনলেন। আমি আগে থেকে মা-বউকে বলে রাখলাম অমুকের বিবি আসবে আজ। উনাকে আচ্ছামত স্বাগত জানানো হল, মেহমানদারি করানো হল, কোন নাসীহা দিতে নিষেধ করেছিলাম। এতগুলো পর্দানশীন দীনপালনে সচেষ্ট মহিলা দেখে, ব্যবহার দেখে আল্লাহ তাঁর দিলে মহব্বত ঢেলে দিলেন। পরের সপ্তাহে স্বামী না বলতে নিজেই এলেন। এরপরের সপ্তাহে তাঁকে হাদিস পড়তে দেয়া হল। এখন তিনি রেগুলার আসেন, ফুল পর্দা করেন। ইসলামী জীবনে অভ্যাস্ত হয়েছেন। এমন কেস গত একবছরে আমার বাসায় কয়েকটা ঘটেছে আলহামদুলিল্লাহ। যেসব এলাকায় পুরুষরা দাওয়াতে বেশি এক্টিভ সেখানে ভুরিভুরি এমন উদাহরণ ঘটে।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য মেয়েদের দীনী জীবন প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিতে পারলে তারা পুরুষের চেয়ে বেশি দ্রুত দীনে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

• স্ত্রীর সাথে উত্তম আখলাক দেখান। বললাম না দেখে শিখবে। ঘরের
কাজে সাহায্য করা থেকে শুরু করে বউয়ের চুল আঁচড়ে দিন। তার দোষ ধরা একদম বাদ। আপনি যা যা করবেন তিনি তা ফেরত দিবেন, তার চেয়েও বেশি।

• ঘরের ঢুকার কিছু সুন্নাহ+আদব শিখিয়েছিলেন ঐ আমীর সাহেব।

- ঢুকে জোরে সালাম দেয়া

- ডান পায়ে ঢোকা,

- একটা দুআ আছে, পারলে মুখস্ত করুন

- দরুদ

- সূরা ইখলাস

- স্ত্রীর সাথে মুসাফাহা (সালামের পরিপূর্ণতা মুসাফাহা)

- মুআনাকা (জড়িয়ে ধরা)

- ছোট হলেও কোন হাদিয়া নিন। একটা কিছু এনে বলুন, তোমার জন্য।
হোক একটা চকলেট। এত ব্যস্ততার মাঝে তার কথা যে মনে পড়েছে এতেই মুখ ঝলমল করে উঠবে।

- তার প্রশংসা করা

- ঘরে ঢুকে নবীজী সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন

- ঘরের কাজে অংশ নেয়া

এগুলো করতে পারলে এটাই আপনার স্ত্রীর জন্য আমলী দাওয়াহ হবে।

• কঠোর হবেন না। একদম না। সূরা ফুরকানের ৭৪ নং আয়াত বলে দুআ
করুন।

স্বামীকে দাওয়াহ:

• স্ত্রীর ক্ষেত্রে যা যা বলা হলো সবগুলো ‘ভাইস ভার্সা'।

• স্বামীর কাছে দীন শিখতে চান। তাকে এটুকু বুঝান, আমাকে ভাত-
কাপড় দেয়া যেমন তোমার দায়িত্ব, আমাকে দীন শেখানোও তোমার দায়িত্ব।
আপনার মাসআলার প্রয়োজনে তাকে মসজিদে ইমামের কাছে পাঠান।

• তোয়াজ-তমিজ করে ঘরে তালিমে বসান। বাকি কাজ হাদিসই করবে।
ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল তো সবসময়ই করেন। আল্লাহর জন্যও একটু করুন।
অনেক সাথী দেখেছি যারা বউয়ের কারণে দীনের পথে এসেছে।

• দীনী কিতাব কিনতে পাঠান। তাফসীর মাহফিলে পাঠান। শুনে এসে
বলবা আমাকে কী বলেছে। আবার বেশি প্রেসার দেবেন না। সারাদিন অফিসে কাজ করে। তার ক্লান্তি বুঝে। দুনিয়াবি তাগাদা, বাজার সদাই কমিয়ে দীনের বাজার ধরিয়ে দেবেন মাঝেমধ্যে। আপনার প্রয়োজন মেটাতেই সে গাধার মত খাটে, আপনাকে একটু খুশি দেখতে। আপনার প্রয়োজন যদি দীন হয় তবে সেটার জন্যও সে খাটবে ইনশাআল্লাহ।

• বদমেজাজি হলে জাস্ট খেদমত বাড়ান। এবনরম্যালি খিদমত করুন।
অবাক করে দিন যাতে জিগেস করে, কেন এত খিদমত করছ। তখন দীনী প্রয়োজনের কথা বলুন।

বয়স্ক সন্তানকে দাওয়াহ:

• স্বামী/স্ত্রীর প্রসিডিউর ফলো করুন। বয়স্ক সন্তান কথা
শুনতে চায় না। তুমি বুড়া হইসো, তুমি আল্লা-বিল্লা করো, আমার টাইম হলে আমিও করবোআনে, এমন মানসিকতা রাখে। সরাসরি নাসীহাহ উপকারী নাও হতে পারে।

• প্রচুর দুআ করুন। সূরা ফুরকান ৭৪ নং আয়াত। সন্তানের জন্য
বাপমার দুআ আর আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই (হাদিস)।আলোর বেগে দুআ কবুল হবে। সাদাকা, রোজার সাথে দুআ করুন।

আমাদের দাওয়াহ ও নাসীহাহ পাবার প্রথম হকদার আমাদের পরিবার। নবীজীকেও আল্লাহ আদেশ করেছেন, নিজেকে ও পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। আমাদের হাদিয়া, তোহফা, আখলাক, ইকরাম, ইহসান পাবার প্রথম হকদার পরিবার। অথচ পরিবারেই আমাদের আচরণ সবচেয়ে অশীলিত, রাফ, অমার্জিত, অনিয়ন্ত্রিত। সবাইকে হাদিয়া দিই, বউকে দিইনা। ঘরে ঢুকি বাঘের মত। বউ-সন্তান বমার ভয়ে তটস্থ থাকে। দাঈ এমন হবে না। তাবলীগের আঙ্গিকে কথাগুলো বললাম, ওখান থেকেই শিখেছি বলে। যার যার ভালোলাগা আদর্শে ফেলে ফলো করুন, রেজাল্ট পাবেন ইনশাআল্লাহ। আর লেখকের জন্য দুআ করতে ভুলবেন না। লেখক দুআর খুব বেশি মুখাপেক্ষী। আল্লাহ মাফ করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

দাম্পত্য: কুররতা আইয়ুন (পার্ট ১)
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·THURSDAY, MAY 24, 2018

ভূমিকা:

কোন ভূমিকা ছাড়া শুরু করা যাচ্ছে না বলে দুঃখিত। এই লেখা শুধুমাত্র যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে জীবনকে সাজাতে চান তাদের জন্য। সেকুলারিস্ট/ফেমিনিস্ট/ওয়েস্টার্ন ইসলামিস্টগণ অহেতুক পড়ে পছন্দ হবে না। খামোখা হবে ব্যাপারটা।

ক.

এখানে সবকিছুই সুন্নাহ সাব্যস্ত নয়। কিছু আছে দলিলসাব্যস্ত, কিছু আছে আলিমগণের নিরীক্ষিত কওল, কিছু আছে কমনসেন্স ও আদব। যদি খটকা লাগে ফিকহীভাবে আস্থাভাজন আলিমের তাহকীক ও পরামর্শ নিবেন। কিতাব যথেষ্ট নহে। কিতাবের সাথে রিজাল যুক্ত হলেই ইলম পূর্ণতা পায়।

খ.

পাঠ্যপুস্তকে আমাদের শুধু ভাল কেরানী, পুঁজিবাদের ভাল সেবক হওয়া শেখায়। যেন জীবনে চাকরগিরির ক্যারিয়ারই সব। টাকা কামানোই একমাত্র উদ্দেশ্য। বেশি বেশি বস্তু কেনাই কামিয়াবি। ভেবে দেখেন চাকরি যেমন একটা মেজর ইভেন্ট আমাদের জীবনে, বিয়েও কি একটা মেজর ইভেন্ট না? সন্তান জন্ম ও পালনও কিএকটা মেজর টাস্ক নয়? তাহলে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা যদি ভবিষ্যত জীবনের জন্য আমাদের গড়ে

তোলারই দাবি করে, তবে ভালো চাকুরের সাথে ভালো স্বামী/ভালো বাবা/ ভালো সন্তান হবার সিলেবাস কোথায়? তার মানে ওরা আপনার সুন্দর জীবন চায় না, চায় শুধু আপনার সু্ন্দর সার্ভিসটুকু। ষাট বছর হলে ছিবড়ে ফেলে দেবে ছুঁড়ে, ব্যস। দে ডু নট বদার যে আপনার ছেলে মানুষ হল কি না। আপনার ডিভোর্সে ওদের কিসসু আসে যায় না। আপনি আপনার বৃদ্ধা মা-কে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠালেও ওরা দেখবেনা। আপনার কাজ নেবার জন্যই এত আয়োজন, এতকিছু। এই নোট সিরিজটা আমাদের সিলেবাসের সেই অসূ্র্যম্পশ্যা অংশটুকু নিয়েই যেগুলো কখনও আলোর মুখ দেখেনি।

গ.

ফিকহী বা দীনী যেটুকু শিখেছি পেয়েছি, আপনাদের খিদমতে আরজ করলাম। কারো উপকারে এলে আল্লাহ বান্দাকে সাদাকায়ে জারিয়ার বদলা দিবেন এই আশায় লিখে দিলেম। অভিজ্ঞতালব্ধ ও দীনী ও আদবগত জিনিসগুলোকে মেডিকেল সাইন্সে গুলিয়ে আপনাদের জন্য শরবত বানালাম। মন্দ লাগলে উলামা হযরতগণ তো আছেনই আমাদের সংশোধনে। আলহামদুলিল্লাহ।

ঘ.

কিছু জায়গায় ‘ভালগার’ কথা আসতে পারে। মাফ চাই। বোনদের পড়ার দরকার নেই। অতিরিক্ত কৌতূহল ভাল না কিন্তু। আপনাদের জন্যও লেখবানে। সবর।

লাড্ডু খাওয়ার আগে:

ক. চেষ্টা শুরু করুন আগেই:

অনেকেই আমরা বিয়েকে গুনাহমুক্তির উপায় মনে করি। ভাবি, এক'দিন যেমন চলছে চলুক, বিয়ে করে একদম দরবেশ হয়ে যাব। তা তো বটেই। নতুন করে গুনাহের সম্ভাবনা বিয়ে কমিয়ে দেয় বহুলাংশে। তবে পূর্ব থেকেই আপনি যে গুনাহগুলোতে অভ্যস্ত সেগুলো বিয়ের পরও কাটানো সম্ভব হয় না। যেমন: পর্ণো বা হস্তমৈথুন। এমনকি এসব কারণে সংসার ভেঙে পর্যন্ত যেতে পারে। বিস্তারিত জানুন “মুক্ত বাতাসের খোঁজে” বইটি থেকে।

১.

বিয়ের কিছুদিন পরেই আপনি দেখবেন পর্ণোছবিতে আপনি যে বৈচিত্র্য পেতেন, স্ত্রীর মধ্যে তা পাচ্ছেন না। আপনার ঘরের মেয়েটি একটি পবিত্র দীনদার মেয়ে। অপরদিকে যেসব পর্ণস্টারদের আপনি দেখে অভ্যস্ত, তারা কামকলায় পারদর্শী। পর্ণো অভিনেত্রীদের ফুলবডি মেকআপ থাকে, আপনি আপনার স্ত্রীর ত্বকের ব্যাপারেও হতাশ হবেন। কেননা মানুষের ত্বক অমন মসৃণ হয় না, দাগ থাকে, তিল থাকে, লোমকূপ থাকে। পর্ণো অভিনেত্রীদের নির্লজ্জ শীৎকার (কামচিৎকার) আপনি আপনার লজ্জাশীলা স্ত্রীর মধ্যে পাবেন না। ফলে হতাশ হয়ে বৈচিত্রের জন্য আপনি আবার ফিরে যাবেন পুরনো স্বভাবে। এজন্য বিয়ে আপনাকে এই বদভ্যাস ছাড়তে সহায়ক হবে, তবে রাতারাতি নিয়ামক নাও হতে পারে। এজন্য বিয়ের আগেই ছাড়ার চেষ্টা করুন। কিভাবে করবেন পরে বলছি।

২.

হস্তমৈথুন আরেক বদভ্যাস যা বিয়ের পরও ছাড়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।
স্ত্রীর মাসিকের সময় বা নাইওর গেলে আপনি সুযোগ খুঁজবেন এটা করার।
কারণ পুরনো অভ্যাস/ফ্যান্টাসি আপনার মনে হবে। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে শয়তান আপনাকে ধোঁকা দেবে। তাই এটাও বিয়ে আপনাকে ছাড়িয়ে দেবে তা নয়, বরং বিয়ের আগেই ছাড়তে হবে আপনাকে।

৩.

নজরের হিফাজতে বিয়ে আপনাকে জাস্ট সাহায্য করতে পারে। কিন্তু আপনার নিজের চেষ্টাই মুখ্য এবং তা শুরু করতে হবে বিয়ের আগে থেকেই। বিয়ে করার পর দিন থেকেই আপনি বিরাট চক্ষুসাধক হয়ে যাবেন এমনটা নয়।

৪. আল্লাহ বলেছেন, পবিত্র নারী পবিত্র পুরুষের জন্য। আপনি যদি নিজেকে তৈরি না করেন,পরিপূর্ণ তাওবা করে চোখের পানিতে ধুয়ে সাফ না করেন, অনুশোচনায় পুড়িয়ে খাঁটি না হন তাহলে পবিত্র নয়নজুড়ানো স্ত্রী তো ফর্মুলামতে পাচ্ছেন না। তাই নিজেকে নিজের স্ত্রীর জন্য তৈরি করুন। গুনাহ ছাড়ুন।

কীভাবে আগেই ছাড়বেন এগুলোঃ

১. যিকরুল্লাহর অভ্যাস

২. কুরআনের অভ্যাস

৩. নফল রোজা। আমার একদিন কি নফসের একদিন।

৪. বেশি বেশি নফল নামায গুনাহ থেকে বাঁচায় (ইশরাক, চাশত, আাওয়াবীন, তাহাজ্জুদ)

৫. ঐ মুহূর্তে ৩ টার একটা থেকে বেরিয়ে আসুন। হয় ডিভাইস থেকে, না হয় নির্জনতা থেকে, না হয় চিন্তা থেকে (কাউকে ফোন করুন, কথা বলুন)

৬. প্রতি নামাযের শেষে সূরা তাওবার শেষ ২ আয়াত, সূরা নাস, ফজরের পর ১০ বার সূরা ইখলাসের আমল করতে পারেন।

৭. ঘুমের আগে নেট চালানো বাদ।

৮. গুনাহ হয়ে গেলে তাওবা করুন। দুআ, সাদাকা করুন।

৯. পর্নোগ্রাফি যদি দেখেই ফেলেন, হস্তমৈথুনের ইচ্ছা যদি জাগে, প্রস্রাব করে আসুন, কামভাব কমে যাবে।

১০. নিজেকে শাস্তি দিতে পারেন। একবার গুনাহ হলে ২০ রাকাত নফল।

১১. ‘গুনাহ ছাড়া’ এটা আল্লাহর তাওফীক। আমি চাইলাম আর ছেড়ে দিলাম এমন না। আর আল্লাহ তৌফিক তাকেই দেন যার তলব আছে। যে চায়। এজন্য আমার গুনাহ ছাড়ার নিয়ত ও চেষ্টার কমতি নেই, এটা আল্লাহকে দেখাতে হবে। আল্লাহ তৌফিক দিবেন।

১২. মনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন বুঝলে মিসওয়াক করুন। নফসকে কষ্ট না দিয়ে গুনাহ ছাড়া অসম্ভব। আজকেই শেষ, নেক্সট বার থেকে কষ্ট দিব এমন হলে নেক্সট বার আর আসবে না জীবনে।

খ. নিয়ত করুন:

১. আল্লাহর রাজির জন্য বিবাহ বসিব।

২. আল্লাহর হুকুম পুরা করার জন্য

৩. নবীজীর সুন্নাহর উপর আমলের জন্য

৪. গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য

৫. দীন পরিপূর্ণ করার জন্য

৬. জান্নাতে একসাথে থাকার জন্য

৭. বিয়ে খাহেশাত না, বিয়ে একটা পবিত্র আমল।

গ. দুআ ও আমাল:

১. সূরা ফুরক্বানের ৭৪ নং আয়াত

২. সূরা ইয়াসীনের নং আয়াত

৩. আাগেপিছে ১১ বার দরুদসহ ১১১১ বার “আল্লাহুম্মা ইয়া জামিউ'”

৪. আপনি যেমন স্ত্রী চান (হার্ডওয়্যার +সফটওয়্যার) পুরো কনফিগারেশন বলে বলে দুআ করুন। আল্লাহকে সব বলা যায়। কোন লজ্জা করবেন না। চুল কতবড়, চোখ কেমন চান, হাসি কেমন চান, মনটা কেমন চান, রান্না কেমন চান সব বলুন। দেখবেন আল্লাহ এমন একটা ব্যালেন্স করে দেবেন, দিলখুশ হয়ে যাবে।

৫. সব চাওয়া শেষে লাস্টে ফয়সালা আল্লাহর উপর ছেড়ে দেন: “রাব্বি ইন্নী লিমা আনঝালতা ইলাইয়া মিন খাইরিন ফাক্বীর”- আয় আল্লাহ, আপনি আমাকে যেটা দিবেন ওটাই আমার দরকার, আমি ওটারই কাঙাল। (মূসা আলাইহিস সালামের দুআ)

৬. অনেক আমল আর চেষ্টার পরও বিয়ে হচ্ছেনা, নির্ভরযোগ্য স্থানে শারঈ রুকিয়া করা যেতে পারে।

ঘ. পাত্রী নির্বাচন:

কেমন সন্তান আপনি দুনিয়াতে রেখে যেতে চান প্রথমে এটা ঠিক করুন। তাহলে সন্তানের মা নির্বাচন সহজ হয়ে যাবে। যেরকম মা দিবেন, সন্তান অমনই হবে। স্ত্রীসহ তবলীগে গিয়ে এমন অনেক বাসায় দেখেছি ৫ বছরের মেয়ে দাওয়াতের কথাগুলো বলছে। ৩ বছরের মেয়ে পর্দা বুঝে গেছে, মা যার সামনে যায়না সেও তার সামনে যায় না। ১৫ মাসের মেয়ে বাচ্চা, মা ঘুমপাড়ানোর সময় আল্লাহ-আল্লাহ বলে ঘুম পাড়াতো, সেও একটা পুতুল নিয়ে আল্লাহ-আল্লাহ স্পষ্ট বলছে আর ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এজন্য নিয়ত ঠিক করুন। একটি দুর্ঘটনা, সারা জীবন-কবর-আখিরাতের কান্না।

১. আপনি তো আর আপনার স্ত্রীর কামাই খাবেন? না। তাই আপনার স্ত্রীর শিক্ষাগত ডিগ্রী আপনার কাজে আসবে না। অনেকে বলে বাচ্চাকে পড়ানোর জন্য শিক্ষিত মেয়ে লাগবে। বাচ্চাকে পড়াতে মাস্টার্স পাশ মা লাগবে না। হাইস্কুলেও মাস্টার্স টীচার অপ্রতুল। স্ত্রীর ডিগ্রী আপনাকে সুখী করবে না। আপনার প্যারেন্টস হয়ত সমাজে ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/ক্যাডার পুত্রবধূ দেখিয়ে সুখী হতে পারেন। কিন্তু আপনার সুখ ওতে নেই। বরং হাজার উদাহরণ পাবেন এগুলোই (উচ্চশিক্ষা/ডিগ্রী/কোর্স/চাকরি) অশান্তির কারণ হয়েছে।

২. বংশ ভাল হওয়া দরকার। বংশ মানে খান-চৌধুরী এগুলা না। এগুলোর ইসলামে অংশ নেই। বংশ বলতে পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের দীনদারি ও সামাজিক অবস্থান। এটা মানে দাদা ব্রিটিশ আমলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কিনা, বাবা সিএসপি অফিসার ছিলেন কি না, চৌদ্দগুষ্ঠি পাঠান কি না, আত্মীয়দের দুনিয়াবি যোগ্যতা কেমন এগুলো বংশ দেখার প্যারামিটার না। বংশ দেখার মিটার হল দীন। কয়েক খানদান ধরে দীনী মেজাজ আছে, ধরে নিতে পারেন মেয়ের মাঝেও দীনী পাবন্দি

আছে। দুইতিন পুরুষ আলিম বা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে আলিম/দীনের বুঝসম্পন্ন লোক বেশি, এগুলো দেখার বিষয়। জাস্ট ধারণার জন্য।

৩. রূপ একটা ভাইটাল বিষয়। যেহেতু আপনি টিভি দেখেন না, নজরের খিয়ানত করেন না। স্ত্রী কিছুটা সুন্দরী হলে এটা আপনার জন্য সহজ হবে। আমার ঘরেই চাঁদ আছে, রাস্তায় মোমবাতি দেখে কি করব? তবে এটাও আপনাকে ক্ষণিক তৃপ্তি দিতে পারে কিন্তু চোখের শীতলতা এর মাঝেও নেই। আল্লাহ না করুন, বউয়ের আগুনরূপ আপনার বরবাদির কারণও হতে পারে।

৪. নির্মমভাবে মেয়ের দীনদারি দেখবেন। কোন ছাড় দিবেন না। বিয়ের পর মানুষ করব, এটা শয়তানের ধোঁকা। নিজেই জংলী হয়ে যাবেন শেষে। বিয়ের আগে দীনদারি/ দীনি শিক্ষার কি হালত, বিয়ের পর কেমন দীনদারি মেইনটেইন করতে চান আলোচনা করে নেবেন। একমাত্র এটাই আপনাকে সুখী করবে। আর যদি কোনটা নাও থাকে দীনদার স্ত্রীর দীনই আপনার চক্ষু শীতল করবে, নয়নজুড়ানো বউয়ের স্বামী হবেন আপনি। নয়নজুড়াতে ৩৬-২৪-৩৬ জরুরি না। জরুরি একমাত্র দীন।

দীনদারির লেভেল বুঝবেন কিভাবে?

নামাযী মানেই দীনদার, নিকাব করলেই দীনপ্রাণা? আই ওয়াজ রিজেক্টেড বাই আ ফুল শারঈ পর্দানশীন গার্ল বিকজ আই ওয়্যার জুব্বা এন্ড পাগড়ি। পরে জেনেছি। নামায পড়ার চেয়ে ফুল পর্দা করা কঠিন। বোরকা পড়ার চেয়ে পর্দা লাইফস্টাইল মেনে চলা কঠিন। দাড়িওয়ালা ছেলে বিয়ে করা আরও কঠিন। সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা আছে কি না দেখবেন। পীর সহীহ কি না বুঝার মাপকাঠি হল সুন্নাহর পাবন্দি। বউও তো একজাতীয় পীর-ই। সম্ভব হলে পুরো সুন্নাহ শইল্যে নিয়ে মেয়ে দেখতে যাবেন। যেটুকু নিয়ে মেয়ে দেখতে যাবেন, বিয়ের পর এর চেয়ে কমবে আপনার সুন্নতগিরি। তাই লেভেল হাই তুলে যাবেন যাতে কমলেও বেশি না কমে।

৫. আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ‘কুফু' বা সাদৃশ্য। এক হাদিসে নবীজীও কুফু রক্ষা করতে বলেছেন। রূপে তো আপনার থেকে বেশি হতেই হবে। আর দীনদারি (এলেম বেশি থাকাই দীনদারি না, দীন মানার যোগ্যতা/আমল হল দীনদারির মাপকাঠি) যত বেশি ততই আপনার চোখ শীতল হবে। বাকি দুনিয়াবি বিষয়গুলো যেমন মালসম্পদ, আভিজাত্য, শিক্ষাগত ডিগ্রী (জেনারেল/দীনী) এগুলো যেন আপনার থেকে বেশি না হয়। সমস্যা হবে পরে। আপনার লেভেল থেকে ঠিক একটু কম বা কমসে কম সমতা যেন থাকে, বেশি যেন না হয়। আমার খুব কাছের একজনের ঘটনা। ছেলের বাপ মেয়ের বাপকে ‘স্যার’ সম্বোধন করত, ডেকোরামে উপরে বলে। তো স্বামীস্ত্রী ঝগড়ায় এটা উঠত। পরস্পরকে অপমানই তো করা হয় ঝগড়ায়। বিয়েটা টেকেনি। এজন্যই মোটা মোটা বিষয়ে কুফুর ব্যাপারটা খেয়াল রাখা চাই। জেনারেল শিক্ষিতরা আলিমা কমপ্লিট বিয়ে না করাই সাবধানতা। ইলমের কুফু। সমস্যা হতে শুনেছি, হলেও দোষ দেয়া যায় না। আমার এই কথাগুলো মানতে কষ্ট হতে পারে, কিন্তু এটা বাস্তব, বিবাহিতরা ভাল বুঝবেন। তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। বহু ব্যতিক্রম আছে। আমার জানাতেই অনেক আলিমা-জাহেল সুখে ঘর কচ্ছেন। আপাত সতর্কতার একটা ফর্মুলা বল্লাম। এক্সেপশন ইজ নট এক্সাম্পল। (ব্যক্তিগত মত, ইগনোর করুন)

ঙ. নয়নে নয়ন:

১. পয়লা আপনার মা-বোন-ভাবীদের পাঠাবেন দেখতে। আমরা ছেলেরা রূপ দেখেই কাইত। আর মা-বোনেরা যেয়ে খুঁটিয়ে দেখবে, মেয়ে তো মেয়ে, মেয়ের দাদীকে পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখবে। আর মেয়েদের একটা কঠিন সিফত আছে। আভাসে অনেক বুঝে ফেলে। দুএকটা প্রশ্ন করেই ভিতরের খবর বুঝে নিবে। এজন্য মা-বোনের পছন্দ হলে পরে আপনি দেখবেন। আর না হলে আপনি না দেখেই না করে দেবেন। এতে মেয়েটার বেপর্দাও হওয়া লাগল না আপনার সামনে খামোখা।

২. আপনার মহিলারা দেখে আসার পর বা আগে ইস্তিখারা করবেন। নবীজী যেমন গুরুত্ব সহকারে সূরা শেখাতেন, তেমনই গুরুত্ব দিয়ে আত্তাহিয়্যাতু শেখাতেন (হাদিস)। যেমন গুরুত্ব দিয়ে আত্তাহিয়্যাতু শেখাতেন, তেমনই গুরুত্ব দিয়ে ইস্তিখারার দুআ শেখাতেন (হাদিস)। ওহী বন্ধ, কিন্তু ইস্তিখারা বন্ধ হয়নাই। সাতদিন পর্যন্ত ২ রাকাত পড়ে ইস্তিখারার দুআ চলবে। স্বপ্ন দেখবেন এটা জরুরি না, তবে কোন একদিকে মন ঝুঁকে পড়বে, পজিটিভ বা নেগেটিভ। প্রত্যেক কাজে ইস্তিখারা করা চাই চাকরি/ব্যবসা/সাবজেক্ট চয়েস/বিয়ে/সন্তানের বিয়ে, যেকোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের আগে।

৩. মেয়ের সকল তথ্যাদি, মা-বোনের রিপোর্ট, ইস্তিখারার রেজাল্ট, মেয়ের পরিবার-আত্মীয় সম্পর্কিত ডেটা নিয়ে কোন প্রিয় ভারি বয়সের আলিমের সাথে পরামর্শ/মাশওয়ারা করুন। ওহীর অবর্তমানে আল্লাহর পক্ষ থেকে খায়েরের ফয়সালার জন্য নবীজী আমাদের ২ জিনিস শিখিয়েছেন-ইস্তিখারা ও আলিমের পরামর্শ। ভারি অভিজ্ঞ আলিমের ইশারায় কাজে কনফিডেন্স পাবেন, কলিজা আর কলিজা।

৪. আপনার বাবা কিন্তু এখন মেয়ে দেখবে না। আপনার বাবা দেখবেন বিয়ের পর। যতখন মেয়েটা আপনার বউ না হচ্ছে, ততখন সে আপনার দীনী বোন। দীনী বোনের পর্দা যেন নষ্ট না হয়।

৫. আপনার মা/বোন কিংবা মেয়ের ভাই/মাহরামের উপস্থিতিতে আপনি মেয়েকে দেখবেন। নবীজী তাগিদ দিয়েছেন বিয়ের আগে পরস্পরকে দেখার ব্যাপারে। একজন মুসলিমার প্রাপ্য সম্মান বজায় রেখে কথা বলবেন। এমন কোন প্রশ্ন করবেন না যাতে সে আহত হয়/লজ্জা পায়। কঠোর কোন দাবী করবেন না যে, বিয়ের এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, রাজি আছো কি না। এক বোন আমাকে দাবি পেশ করেছিলেন, বেডরুমের পাশাপাশি তাঁর শুধু পড়াশুনোর জন্য আরেকটা রুম লাগবে, দিতে পারবো কি না। কোনমতে মানে মানে কেটে পড়েছি। অবশ্যই ‘আপনি’ সম্বোধনে কথা বলবেন। তাঁকেও আপনার

ব্যাপারে জানার সুযোগ দিবেন। খালি নিজেই ইন্টারভিউ নিয়ে এসে পড়বেন না। প্রশ্ন করার সুযোগ দিবেন ম্যাডামকে।

৬. আপনার ভাল লাগলে আপনার অভিভাবকদের দ্রুত জানান। কারো একটা একটা জিনিস সুন্দর হয় না। প্রতিটা মানুষই সামগ্রিকভাবে সুন্দর। একটা কমি পূরণ করে দেয় আরেকটা কিছু। রূপ+কথা+দীনদারি+স্বামীকে নিয়ে স্বপ্ন সব কিছু মিলিয়েই একজন মেয়ে সুন্দর। শুধু রূপসী বহু পাবেন যাদের বাকিগুলোয় ভয়ানক কমতি আছে। তাই ওভারঅল নিয়ে চিন্তা করে সামগ্রিক সিদ্ধান্তে আসুন।

৭. সবার তকদীরে সবাই নেই। আপনার ভালো নাও লাগতে পারে। আপনি আপনার লোকজনকে জানান, তাঁরা ডিপ্লোমেটিক্যালি জানিয়ে দিবেন। মেয়েটিরও আপনাকে ভাল না লাগতে পারে। কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। আসল জনের জন্য দুআ করুন, আল্লাহ তাড়াতাড়ি উহাকে আমার বুকে আনিয়া দাও।

৮. মিয়া-বিবি রাজি হয়ে গেলে শানাই বাজাবেন না। মিউজিক জায়েজ নাই। তবে দেরি করতে নবীজী নিষেধ করেছেন। যে কারো দিল ঘুরে যেতে পারে। তাই দ্রুত তারিখ ঠিক করার চেষ্টা করুন। আর হ্যাঁ, পছন্দের পর বিয়ের আগে মেয়ের সাথে আবার দেখা করা তো দূর কি বাত, ফোনে গল্পগুজবও জায়েজ নেই।

আন-নিকাহ:

১.

বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে যাবার পর আপনাকে কঠোর কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একটা সম্পর্কের শুরুটা মোটেও সমীচীন হবে না আল্লাহর নারাজি দিয়ে শুরু করা। সুন্নাতের খেলাফ আল্লাহর হুকুম নষ্ট করে যে

সম্পর্কের শুরু তা বারাকাতময় হবে কিভাবে। খায়েশাতের বিয়ে যারা করে তারা খায়েশ পুরো করে, হৈহুল্লোড়, ফটোগ্রাফি, ভিডিও, গায়ে হলুদ, ডিজে-ডান্স, সাউন্ড সিস্টেম, লৌকিকতা। মনে রাখবেন, আপনি করছেন আমল, আল্লাহর খুশির জন্য। শুরুতেই ছাড় দিবেন না। নিজের পরিবার, কনের পরিবারের সামনে স্পষ্ট করে আপনার চাওয়া জানিয়ে দিন।

ক. গায়ে হলুদ:

হবে না। এটা এবং বাগদান (এনগেজমেন্ট) দিনের আলোর মত স্পষ্ট হিন্দু সংস্কৃতি থেকে প্রবিষ্ট। গায়ের মাহরামের ইনভলভমেন্টে ফরজ পর্দা নষ্ট হওয়া থেকে নিয়ে ফটোগ্রাফি, ডান্স, ডিজে, লোকদেখানো অহেতুক খরচ, ফ্রিমিক্সিং অনেকগুলো হারাম কাজের উপলক্ষ। যা কোনভাবেই আপনার দাম্পত্যজীবনে আল্লাহর লানত ছাড়া বারাকাহ টেনে আনবে না। হুঁশিয়ার।

খ. পর্দা:

ওয়ালীমাতে নারীপুরুষ আলাদা ব্যবস্থা হবে। কনে পর্দার সাথে থাকবে। নন-মাহরাম কেউ কনে দেখবে না। কনের ছবি কেউ তুলবে না, ভিতরের মহিলারাও না। বদদীন মহিলারাও ছবি তুলে স্বামীকে গিয়ে দেখায়। শুরুতেই ফরজের সাথে কম্প্রোমাইজ করবেন না। কমপক্ষে কনের পর্দা রক্ষায় কঠোর থাকুন। আল্লাহ খুশি হবেন।

গ. বিয়ে মসজিদে:

বাংলাদেশে ওপেন হার্ট সার্জারির পথিকৃৎ প্রফেসর ডা. এস. আর. খান স্যার এক বয়ানে বলেছিলেন, মুসলমানের আবার ক্লাব-কমিউনিটি সেন্টার এগুলা কি? মুসলমানের ক্লাব-কমিউনিটি সেন্টার হল মসজিদ। মুসলমানের অবসর কাটবে মসজিদে। মুসলমানের বিয়েশাদী, বিচারসালিশ সকল সামাজিক কর্মকাণ্ডের মারকাজ/কেন্দ্র হবে মসজিদ। আজ আমাদের সাথে মসজিদের কত দূরত্ব। এজন্যই আমাদের জীবনে বারাকাহ নেই।

মুসলমানের বিয়ে মসজিদে। সুন্নাহ এটাই। মেয়ের বাবা মেয়ের অনুমতি নিয়ে মসজিদে আসবে। মেয়ে আসবে না। ছেলের কাছে প্রস্তাব পেশ করবেন ইমাম সাহেব। ছেলে জোরে বলবে, আলহামদুলিল্লাহ আমি কবুল করছি। ৩ বার বলা জরুরি না। চিড়িয়ার মত দাঁড়িয়ে সবাইকে সালাম দেয়াও অদরকারি প্রথা। ব্যস, হো গ্যায়া। পুরো সমাজ, মানে উপস্থিত মুসল্লীরা সাক্ষী হয়ে গেল যে আপনি অমুকের এত নং বেটিকে শাদী করেছেন। ওয়ালীমা করলে সাক্ষীর সংখ্যা আরও বাড়ল। কাবিন, রেজিস্ট্রি, ২ সাক্ষী এগুলো সরকারি হিসাব। পরে করে নেবেন। আল্লাহর খাতায় আপনারা স্বামী- স্ত্রী, মেয়েটি আপনার জন্য হালাল। সাক্ষী পুরো সমাজ।

খেজুর ছিটানো সুন্নাহ। যেহেতু বিয়ে একটা আনন্দের উপলক্ষ, নবীজী ছিটিয়ে দিতে বলেছেন। সবাই লাফিয়ে ধরবে। ভিজা ভিজা আঠালো খেজুর নিবেন না, খোরমা নিবেন, তাহলে ছিটালে মসজিদ ময়লা হবে না। আর পাবলিক ধরবে হাতে, মুখে চিল্লাপাল্লা হবে না। তবে ইমাম/মসজিদের খাদিম নিষেধ করলে হাতে হাতে খেজুর বণ্টন রতে পারেন।

ঘ. কাবিন:

কাবিননামা দ্রুত করে ফেলবেন। এখন আমাদের ঈমান দুর্বল, তাকওয়ার অভাব। কাবিন, রেজিস্ট্রি মেয়ের নিরাপত্তার জন্য। ছেলে কিছুদিন

সংসার করে পালিয়ে গেল। বা লজ্জা ভুলে বেহায়ার মত অস্বীকার করল। তখন? মেয়েটা যেন আইনের দ্বারস্থ হতে পারে, বিচার পায়। এজন্য বিয়ের মজলিসেই, না হয় পরে যত দ্রুত সম্ভব।

ঙ. বরযাত্রী:

৫০০ বরযাত্রী যাবে মেয়ের বাপকে খসাতে। তারপর এসে খাবার নিয়ে সমালোচনা, গেট ধরা, শ্যালিকা হাত ধুয়ে দেয়া এসবের ইসলামে অনুমোদন নেই। হুজুর সা. নিজে মেয়েকে আলীর রা. ঘরে দিয়ে আসেন। আবু বকর রা. গিয়ে দিয়ে আসেন আম্মাজান আয়িশাকে রা.। মেয়ের বাড়িতে খানাপিনা হবে না। উত্তম তো কনের বাপ গিয়ে কনেকে দিয়ে আসবে। না হয় দীনদার ছেলে সাথে ২/৩ জন গিয়ে মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে আসে, মেয়ের বাসায় কিচ্ছুই খায় না। মোট কথা মেয়ের বাপের কোন খরচ নেই মেয়ে বিয়ে দিতে। মাহর, ওয়ালীমা সব ছেলেপক্ষের খরচ। ইসলামে মেয়ে পিতার জন্য বারাকাহ। আর আমরা হিন্দুয়ানি প্রথা ঢুকিয়ে জাহেলিয়াতের মত মেয়েকে পিতার জন্য বোঝা বানিয়ে দিয়েছি। একান্তই মেয়ের বাবা লৌকিকতার তাগিদে খানাপিনার চাপাচাপি করলে অনূর্ধ্ব দশ গিয়ে খেয়ে আসবেন। ইসলাম সহজ, খায়েশাতই কঠিন।

চ. যৌতুক:

প্রশ্নই ওঠে না। আগেই বলেছি মেয়ের বিয়েতে মেয়ের বাবার কোন খরচ ইসলাম রাখেনি। খবরদার। কোন চাপাচাপি/দাবি করবেন না। শ্বশুর জামাইকে হাদিয়া দিবে ভাল কথা। এজন্য সারা জীবন পড়ে আছে। বহুত হাদিয়া দিবে। জাস্ট বিয়ের সময় নিবেন না। এমনকি বরের বাসায়

কাপড়চোপড় পাঠানো, তা নিয়ে আবার গীবতের মজমা বসে। আপনি একটু কঠোর হলে কত গুনাহ রোধ করতে পারেন।

অনেকে যৌতুক নেন না ঠিকই, আবার বউকে কথাও শোনান। বরযাত্রী যান না, আবার শাশুড়ি বউকে খোঁটাও দেয়, তোমার বাপের তো কোন খরচই হয়নি, খালি মেয়েটা দিয়েই খালাস। অনেকসময় এই খোঁটার ভয়েই মেয়ের বাপ অনুষ্ঠান করে/যৌতুক দিতে চায়। মুসলিমকে এই খোঁটা দেয়া/উপহাস ভয়াবহ রকমের কবিরা গুনাহ। তাওবা ছাড়া মাফ না হবার সম্ভাবনা।

কিছু বিষয়ে আল্লাহর জন্য কঠোর হয়ে যেতে হয়। যারা বেজার হবে, তাদের খুশি করার দায়িত্ব আল্লাহর (হাদিস)। আপনার কাজ শুধু আল্লাহকে খুশি করা। যত পরিমাণ সুন্নাহর উপর আমল হবে ধরে নিবেন আপনার দাম্পত্য জীবন তত সুখের হবে ইনশাআল্লাহ।

২.

অনেক সময় এত স্ট্রিক্ট থাকা সম্ভব হয় না। আপনি শুরুতেই ছাড় দিলে আপনার সব যেত, ফরজও যেত। এখন শুরুতে কঠোর হলেন, ছাড় দিলেও কিছু তো হবে। আল্লাহর কিছু ফরজ হুকুম তো রাখতে পারবেন। এখন আলিমগণের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করুন কতটুকু ছাড় দিবেন। ফরজ পর্দা প্রভৃতির সাথে আপোস প্রশ্নই আসে না। তুলনামূলক কম সিরিয়াস বিষয়গুলো আলিমের পরামর্শক্রমে ছাড় দিতে পারেন।

ছ. মাহর:

আমার আগে ১ জন মাত্র রাবী, সহীহ সনদ। মেয়ের বাপ মাহর চেয়েছে ৪০ লাখ টাকা। কেন? আমার মেয়েকে যদি ছেলে ছেড়ে দেয়। ঠিকই ৬ মাসের মধ্যে ৪০ লাখ টাকা পে করেই ডিভোর্স হয়েছে।

বেশি মাহর বিয়ে টেকার ইনসিওরেন্স না। বরং যে বিয়ে মাহর কম, সে বিয়েতে বারাকাহ বেশি (হাদিস)। মাহর বিষয়টার অনেক সামাজিক প্রভাব আছে। উলামাগণের অনেক কিতাবও পাবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, হঠাৎ যদি আপনি মারা যান, আপনার স্ত্রীসন্তান যেন পথে বসে না যায়, কিছুটা আর্থিক সিকিউরিটি ইস্যু। তাই বরের সামর্থ্যানুযায়ী যতটা সম্ভব মাহর নির্ধারণ করুন। সামর্থ্যের মধ্যেই বেশিটা। লোক দেখানোর জন্য সামর্থ্যের অতিরিক্ত মাহর দাম্পত্য বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

অনেকে মাহরে ফাতেমী নির্ধারণ করেন। আলী রা. যে মাহরে ফাতিমা রা. কে বিয়ে করেছিলেন। আলী-ফাতিমা রা. কেমিস্ট্রির বারাকাহ পাবার জন্য এটা করা হয়, কেননা এতে স্বয়ং নবীজীর অনুমোদন ছিল, সেই হিসেবে। তবে এটাও জরুরি না। জরুরি হল সামর্থ্যের ভিতরে লৌকিকতা বিবর্জিত হওয়া। আলিমগণের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না এ বিষয়ে।

জ. বাসর-রাত/ প্রথম-রাত:

কিছু ইলমের জন্য নির্ধারিত সময় আছে। অসময়ে শিখলে তা ভাল ফল বয়ে আনে না। ফিতনার কারণ হয়। বান্দা পরীক্ষায় পড়ে যায়।

- বাসররাতের আগ পর্যন্ত যারা পৌঁছে গেছেন বাস্তব জীবনে

- ঈদের পর বাসররাতে পৌঁছবেন

- অলরেডি বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেছেন

- সুন্দর দাম্পত্য জীবন কাটাচ্ছেন

- যৌনজীবন নিয়ে সমস্যায় আছেন,

এই চ্যাপ্টারটা শুধুই তাদের জন্য। বাকিরা পড়া মানে নিজের ‘অবিবাহিত জীবন' আরও কঠিন করে ফেলবেন এবং ফিতনায় পড়ে যাবেন।

তাই নোটের এই অংশটুকু ঈদের পর দেয়া হবে শুধু উপরের ক্রাইটেরিয়ার ভাইদেরকে ইনবক্সে। কোন ঈদ তা পরে জানিয়ে দেব না, এখনই জানিয়ে দিচ্ছি। এই বছর রোজার ঈদের পর ইনশাআল্লাহ। সমাপ্তিও ওখানেই টানব খন।

অধিক কৌতূহলবশত কেউ মিথ্যা হলফ করে নিজেকে বিবাহিত দাবি করে কেউ যদি নোট চান, এবং নিজেকে জটিল পরীক্ষায় আবিষ্কার করেন, লেখক তা থেকে দায়মুক্ত ইনশাআল্লাহ। যারা নোটটা নিবেন তারাও তাঁদেরকেই দিবেন যারা উপরের শর্ত পুরা করেন। প্লিজ অধমকে গুনাহগার বানাবেন না। অনেক বিশ্বাস করে আপনাদেরকে দিব জিনিসটা।

ডাক্তার হবার সুবাদে অনেক মানুষ, তাবলীগের সাথী, সমবয়েসী উলামাগণ যৌনজীবনের বিভিন্ন সমস্যায় পরামর্শ চেয়েছেন নানান সময়। সেগুলো সামনে নিয়ে কিছু পড়াশুনা করেছি, বিভিন্ন তথ্য তাদের থেকে নিয়েছি, সমাধান প্রস্তাব করে ফিডব্যাক নিয়েছি, কৌশল শিখিয়ে ফিডব্যাক নিয়েছি। আলিমগণের এ বিষয়ে তেমন লেখা চোখে পড়েনি। পরবর্তী নোটের টপিক মোটামুটি এমন: যৌনমিলন, যৌনসমস্যা ও প্রতিকার (ওষুধ ছাড়া) এবং সন্তান ধারণ। নিজের চিকিৎসা বিদ্যা, আলিমগণের পরামর্শ ও জনাত্রিশেক মানুষকে দেয়া সমাধান (নন-মেডিসিন) ও নেয়া ফিডব্যাক থেকে লব্ধ কৌশল আপনাদের সামনে তুলে আনব। ইনবক্সে চাহিবামাত্র

ঈদের পর দেয়া হইবে। সেকুলার বিজ্ঞান আসলেই পূর্ণ ফলাফল দেয় না যতক্ষণ তাওহীদ/ আল্লাহর দেয়া সমাধান না মেশানো হয়। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি।

ঝ. সারাজীবনসাথী:

আর দাম্পত্য জীবনে আচরণ কেমন হবে সে বিষয়ে নিচের বইগুলো পড়ার প্রস্তাব থাকবে।

১. দুজন দুজনার, মাওলানা আতীক উল্লাহ দা. বা.

২. ওগো শুনছো, ঐ

৩. আই লাভ ইউ, ঐ

৪. প্রিয়তমা, মাওলানা সালাহউদ্দিন জাহাঙ্গীর দা.বা.

৫. মুফতি আবদুল্লাহ আল- মাসুম দা. বা. রচিত একটা বই আছে দারুণ।

৬. মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী দা.বা. এর একটা বই আছে।

সবগুলোর নির্যাস নিয়ে একটা নোট লেখার ইচ্ছা রইল। আল্লাহ কবুল ফরমান।

ব্রেইনওয়েভস
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·TUESDAY, JUNE 12, 2018

পুরনো স্ট্যাটাসগুলো একখানে করে ফেললাম। নিজেরই প্রয়োজনে। বিভিন্ন সময় নানা চিন্তাপ্রবাহ কাজ করে। স্ট্যাটাসে ওগুলো ধরে

রাখি। পরে খুঁজতে গেলে পেইন পাই। তাই একখানে করে ফেললাম। কারো যদি কাজে আসেটাসে।

১.

যারা অলরেডি লেখালেখি করছেন/ সামনে লেখালেখি করবেন ভাবছেন তাদের জন্যঃ

নাস্তিকতা, সালাফগণের অনুবাদ বিষয়ে কাজ হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। যদিও অপ্রতুল, কিন্তু হচ্ছে। আমার মনে এক নতুন ভাবের উদয় হয়েছে। নিজে যোগ্যতার অভাবে সাহস পাচ্ছিনে।

ওরা প্রাচ্যবাদ মানে আমাদের নিয়ে, আমাদের বিশ্বাস/সমাজ/মূল্যবোধের সমালোচনা করে চলেছে গত ১০০০ বছর। আপনারা 'পাশ্চাত্যবাদ' মানে সেকুলার পাশ্চাত্য সমাজ নিয়ে একাডেমিক লেভেলের লেখা লেখুন। 'নারীমুক্তি' শব্দের আড়ালে ওদের সমাজে লুকোনো নারীনিগ্রহকে প্রকাশ করে দিন। গণতন্ত্র শব্দের আড়ালে দুর্নীতি আর হাজারো আর্থসামাজিক সমস্যাগুলোকে তুলে আনুন। জবরজং শ্রুতিমধুর শব্দের আড়ালে পাশ্চাত্য সামাজিক ব্যর্থতার ছবি আঁকুন। বেকারত্ব, বিনাচিকিৎসায় মৃত্যু, ধর্ষণ, ধনীগরীব বৈষম্য, পর্নোশিল্পে নারীর আর্তচিৎকারের ছবি আঁকুন। মূল্যবোধের ভগ্নস্তূপের ছবি আঁকুন।

মেকআপের আড়ালে থাকা লোলচর্মা বৃদ্ধা পশ্চিমের মুখোশ খুলে দিন। প্রবাসী ভাইয়েরা এসব লেখকদের তথ্য দিয়ে সাহায্য করুন। ভাতে মারুন, পানিতে মারুন।

এই ফিল্ডে কাজ করতে পারেন এমন পটেনশিয়াল বন্ধুদের ট্যাগ করে আহ্বানখানি পৌঁছে দিন না।

২.

পশ্চিমাদের মুখরোচক শ্রুতিমধুর শব্দগুলোর মধ্যে এটা একটা। শব্দভরা খালি মানবাধিকার আর মতপ্রকাশ। আহা...। যেন দেশটা ভোটারেই চালায়। দেখেন, কারা চালায়।

পিকটা ভাল লাগসে। বাংলাদেশেও না আসে কোনদিন। আপনার দরজায় এসে টাক টাক করে বলবে: অন্দর হো জী? ইয়ে লো তুমহারে লিয়ে এক বুঁদ গাণাতান্ত্রা লেকে আয়া। পিয়ো জী ভারকে।

৩.

প্রশ্ন: সুন্দর মেয়ে যদি না পাই?

উত্তর:

সুন্দর' এর সংজ্ঞা ডিফাইন করা দরকার। ইউরোপিয়ানরা আমাদের যে সফটওয়ার ইন্সটল দিয়ে গেসে তাতে বলা আছে, যে মাইয়া দেখতে যত ইউরোপিয়ানদের মত (সাদা) সে তত সুন্দর। তামাম দুইনয়ায় ওরাই সুন্দার ওরাই সভ্য ওরাই 'সব ভালোর জনক', ওরাই অর্থনীতি/বিজ্ঞান/সমাজবিজ্ঞান সব শাস্ত্রের জনক-জননী। আর আফ্রিকা-আরব-ভারত-চীন সব বানের জলে ভাইসা আসছে।

ইউরোসেন্ট্রিক 'সুন্দর' এর সংজ্ঞা চালায়ে কী পরিমাণ ইউরোপীয় কসমেটিকসের পুঁজিবাদী 'চোষণ' চলতেসে রেস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ডে। ফ্রান্স আর এটালীর মেজর অর্থনীতি কসমেটিকসে চালায়। আর বিউটি পার্লার ব্যবসা এগুলারে বাজার দিচ্ছে। এক একটা মোড়ে চায়ের দোকানের চেয়ে বিউটি পার্লার বেশি।

বাংলা ব-দ্বীপের আমরা অরিজিনাল জাতিগতভাবে দ্রাবিড়। তামিলদের দেখছেন তো। ওটাই আমরা। পরে নানা জাতের মিশেলে ডিসকালার হয়ে গেসি। আমাদের সৌন্দর্য 'শ্যামলা'/ শ্যামবর্ণ। সাদা ধবধবে আমাদের সৌন্দর্য না। ওটা আমাদের শেখানো হয়েছে। চিন্তা করেন এখন, চোখ বুজে। একটা শ্যামলা বা কালো জাতির এভারেজ পছন্দ সাদা। মেয়েরা সাদা হবার প্রতিযোগিতায় মত্ত। দেদারসে বিক্রি হয় ফেয়ার এন্ড হ্যন্ডসামও। মোড়ে মোড়ে পার্লার চুনকাম সেবা দিচ্ছে। শ্যামলা বলে কিছু মেয়ের বিয়ে হচ্ছেনা। শ্যামলা হলে যৌতুক হাঁকা হচ্ছে। শ্যামলা মেয়েরা ছোট মন নিয়ে বড় হচ্ছে।

তখন এর কারণটা কি। জাতিগত সৌন্দর্যবোধ কেন নৃতাত্ত্বিক স্বাভাবিকতার বাইরে যাচ্ছে?

শ্যামা মেয়ের উজ্জ্বল গ্লসি মসৃণতার সাথে ককেশীয় ধলার ফোটা ফোটা মেছতার তুলনা চলে? সাদা তো মূলাও হয়। ওরা এখন স্কিন ট্যান করে শ্যামা হইতাসে। সৌন্দর্য শিখেছে আমাদের কাছে।

আমরা এমনিই শ্যামা। ট্যান করা লাগে না। শ্যামলায়ই আমরা সুন্দর। শ্যামলাই আমাদের সৌন্দর্য। আমাদের চোখে আমাদের শ্যামা মেয়েটা লাগুক চোখ ধাঁধানো সুন্দরী।

৪.

ক. প্রলেতারিয়েতও পুঁজির ও মুনাফার মালিক

খ. প্রলেতারিয়েতকে মালের মালিক বানানো

গ. পুঁজির সুষম বণ্টন

ঘ. ঘাম শুকানোর আগে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ

ঙ. প্রলেতারিয়েত হবে পেটিবুর্জোয়া

চ. দরকষাকষির ক্ষমতা অর্জন ও মানসম্মত মজুরি

ছ. যাকাতের শিষ্টচক্র (বুর্জোয়া যত মাল কামাবে, প্রলেতারিয়েত তত মালের অংশ পাবে)

জ. মজুদদারি, লটারি ও সুদ দিয়ে সম্পদ কেন্দ্রীকরণ বিলোপ

ঝ. ৪ খলিফার খেলাফতকালে ইউটোপিয়া বাস্তবায়ন

ঞ. সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি সম্পদ নয়, তাকওয়া। সম্পদের ভিত্তিতে শ্রেণী ও শ্রেণিবৈষম্য বিলোপ

প্রয়োজন ছিলো না ১লা মে'র

দুনিয়ার মজদুর এক হও

পুঁজিবাদ নিপাত যাক

শাসকগণের নিকট ইসলামী অর্থব্যবস্থা কায়েম করার আবেদন।

৫.

যদি ধরেও নিই ফরজে কিফায়া,

আমার তরফ থেকে যারা ফরজে কিফায়া আদায় করে দিচ্ছে; আর কিছু না পারি, যে প্রক্রিয়ায় আদায় করছে সেই মানহাজ সমর্থনও না করি তাও সমস্যা নেই। কমসে কম, অ্যাট লিস্ট, ওদেরকে দোষ না দিই। এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ না থাকলে জুলুম হয়ে গেল।

ওদের ঘরছাড়ায় আমার ঘরকুনোত্ব জায়েয হয়ে যাচ্ছে। ওদের রক্তে আমাদের প্রেসের কালি জায়েয হচ্ছে। ওদের পাটির দাগে আমার তুলতুলে ফোমটা, ওদের সন্তানের অশ্রুতে আমার বাচ্চার খিলখিল, ওদের বিবির পথচাওয়া নজরে আমার বউয়ের কাজল জায়েয হয়ে যাচ্ছে। ওদের খওফে আমার আমান জায়েয হচ্ছে। কমসে কম দোষ তো না দিই।

(দীর্ঘশ্বাস)

৬.

আহলুস সুন্নাহর ন্যূনতম মতভেদপূর্ণ পক্ষগুলোর প্রতি এতটা বিদ্বেষী যেন না হই যে, পরে তারাই বেশি হক প্রমাণ হয়ে গেলে তাদের সাথে যেতে না পারি।

এতটা বিদ্বেষ না জমুক, যাতে নিজ মত/দল বাতিল প্রমাণ হলেও হক প্রমাণিত দলে যেতে লজ্জা লাগে (যাদের বিরুদ্ধে এত কথা বলেছি, তাদের সাথে যাই কিভাবে?)

সময় দিই। ঘোলা পানি থিতিয়ে পড়ার টাইম দিই। আর এই সময়টুকু দুআ করি: আল্লহুম্মা আরিনা হাক্কা হাক্কাওঁ ওয়ারঝুকনা ইত্তিবা' ; ওয়া আরিনা বাতিলা বাতিলাওঁ ওয়ারঝুকনা ইজতিনাবা।

আল্লাহ, আমাকে হককে হক বুঝার ও তার অনুসরণের তৌফিক দাও। এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে চেনার ও তা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দাও।

উম্মতের বিভেদ কমবে না। আরও বাড়বে। আরও বাড়তেই থাকবে। হাদিসগুলোর ভাবার্থ তেমনই। দুআ করা ছাড়া এই ঘোর অমানিশায় হকের অনুসরণ অসম্ভব যদি আল্লাহ নিজ থেকে হক পর্যন্ত পৌঁছে না দেন। যাকে পরম হক মনে করছি, সেই যে বিচ্যুত নয় তার কি গ্যারান্টি আছে? জানালাগুলো খোলা থাক। ইলমী আলোচনা চলতে থাকুক। নিজ অবস্থানে গালিগালাজ আর হেয় করার শেকড় গজিয়ে না যাক।

উম্মতের এখনও মাথা গরম। আর ওটা মাথা ঠাণ্ডা করে করার আমল। প্রচণ্ড আত্মসংযমের সাথে করার আমল। মাথা ঠাণ্ডা না হলে ব্যাপকভাবে ওটার তৌফিক না আসারই সম্ভাবনা। ছোট মতানৈক্যর বিপরীতে পারস্পরিক মান্যতা-ইকরাম এর সিফত না আসলে উম্মাহর জাগরণ না আসাই ভাল। জেগে গেলে যদি একজন আরেকজনের গর্দান মেরে দাও, এর চেয়ে ঘুমিয়েই থাকো।

৭.

"বাংলাদেশ প্রেক্ষিত"

সরল পোস্ট, কোন মাসআলায় ফেলবেন্না।

ক. বাংলাদেশে পলিসি বানানোয় যাঁরা সম্পৃক্ত তাঁরা একসময় ফিল্ডে চাকরি করেছেন। সাধারণত যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব র্যাংক এর অফিসারগণ এবং পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট মিলে পলিসিগুলো বনে। কিন্তু তাঁদের সময়কার ফিল্ডের অবস্থা আর এখন ফিল্ডের অবস্থা কি এক? পলিসি যারা বাস্তবায়ন করবে (ছোটরা) আর যারা বানান (বড়রা) তাঁদের মাঝে বিশাল একটা গ্যাপ। ফিল্ডের বাস্তবতা, ফিল্ড অফিসারদের সীমাবদ্ধতা এগুলো আমলে না নিয়ে পলিসি মেকিং গুড়ে বালি। জনগণের মতামত না নিলেন, পলিসি ইম্প্লিমেন্টরদের মতটা নেয়া হয় বলে মনে হয় না পলিসিগুলো দেখলে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এটা একটা অন্তরায়। সময় ক্ষেপণ কমিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে এই গ্যাপ কমিয়ে আনা দরকার। সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

খ. 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' ও 'কষ্টিপাথর' উপহার দিয়েছি কয়েকজন স্যারকে যুগ্মসচিব ও সচিব পর্যায়ের। প্রশংসা মাকসাদ না। যদি কোনদিন কোন পলিসি মেকিং-এ কোন পর্যায়ে বা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে ন্যূনতম প্রভাবও পড়ে। হায় আমার মীযানের পাল্লা। তবে পজিটিভ ফিডব্যাক পেয়েছি একদুজন থেকে। আল্লাহ প্রশংসার একমাত্র উপযুক্ত।

গ. কেউ হা হা রিএক্ট দিবেন না।

৮.

মজার ব্যাপার হল, আফ্রিকাতে ৭৫% লোক এক বেলা খায়। প্রায় সবগুলো দেশে বছরে কোন না কোন সময় দুর্ভিক্ষ লেগে থাকে।

পুঁজিবাদী জাতিরাষ্ট্রব্যবস্থার কাঁটাতার আর সম্পদের অসম বণ্টন। সমাধান পকেটে নিয়ে আমরা ঘুম। আমার পেট তো ভরা। তাতারীরা আমাদের বুদ্ধিকে পঙ্গু করেনি, আমরাই ওদেরকে প্রভাবিত করে ইসলামী সংস্কৃতিতে টেনে এনেছিলাম। কিন্তু কলোনিস্টরা মগজের উপর রাজত্ব করছে আজও।

আরও মজার ব্যাফার হলো, যারা আমাদের ঘুম ভাঙাতে চায়, তাদের আমরাই দেখতে পারিনা। আল্লাহ ছাড় দেন, কিন্তু ছেড়ে দেন না।

৯.

কুরআনের আরবি গ্রামাটিক্যাল মিরাকেল গুলো নুমান আলী খানের থেকে নিই। উনি আরবি ভাষাবিদ। আর কিছু নিইনা।

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে ডা: জাকির নায়েক আমার প্রথম ও শেষ পছন্দ।
ফিকহের পছন্দ মেলেনা বলে মাসআলা নিই না।

শাখাগত দীনী ব্যক্তিগত মাসায়েলে যেহেতু আমি ফিকহে হানাফী অনুসরণ করি, তাই উলামায়ে দেওবন্দ আমার পছন্দ।

ইক্বামাতে দীন ও ফিল্ডের ইস্যুতে অন-ফিল্ড আহলুস সুন্নাহ উলামাদের কথাই নিই।

আত্মশুদ্ধির প্রেসক্রিপশন আমার শায়খ যেটা দিয়েছেন সেটা মেনে চলি : সুবহানাল্লাহ- আলহামদুলিল্লাহ - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- আল্লাহু আকবার - দরুদ- ইস্তিগফার ১০০ বার করে সকাল বিকাল, কুরআন তিলওয়াত আধা পারা, আযান মন দিয়ে শোনা ইত্যাদি।

আর পিওর নাসীহা সবারটাই নিই।

বি:দ্র:

প্রতিকূল রাষ্ট্রে অবস্থানরত দাঈরা ইসলামের সব বিষয়ে অনমনীয় থাকবেন না এটাই স্বাভাবিক। এটা মেনে নিতেই হবে তাদের কথায় গা- বাচানো, তাল মেলানো থাকবে। কিন্তু আমাদের টার্গেট তো সালাফরা। মনে মনে হলেও তাঁদেরকেই ধারণ করা চাই। তাই না?

কার থেকে কি নিবো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নাহলে সীরাতাল মুস্তাকীম থেকে পিছলানো সময়ের ব্যাপার।

১০.

ফেসবুক বর্তমান বিশ্বে যেকোন মিডিয়ার চেয়ে শক্তিশালী মিডিয়া। পুঁজিবাদের একমাত্র শত্রু হিসেবে ইসলামের উপর যত ধরনের হামলা (সামরিক/বুদ্ধিবৃত্তিক/আবেগিক/সামাজিক), তার একটা হাতিয়ার হল: পরিভাষাগত হামলা। ওরা আমাদের উপর কিছু পরিভাষা ব্যবহার করে এই আগ্রাসনগুলোকে জাস্টিফাই করিয়ে নেয়। যেমন: সন্ত্রাসী, জঙ্গি, নারী অধিকার, নারীশিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সুশাসন, ক্ষমতায়ন, বৈষম্যদূরীকরণ, আধুনিকতা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রতিটা পরিভাষার পিছনে আছে প্রতারণা/ফাঁকি/শ্রমিক বানিয়ে রাখা/ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। বার বার বিভিন্ন মিডিয়ায় এই শব্দগুলো তারা ব্যবহার করে নিজেদের সুপিরিয়রিটি ও আমাদের ইনফিরিওর প্রমাণের জন্য। এটা সোশাল ইন্জিনিয়ারিং ও সাইকোলজিকাল ইনভেশন।

এই পরিভাষাগুলোকে আমরা ফেসবুক দিয়ে আমাদের জন্য স্পেসিফিক না রেখে জেনারেলাইজড করে দিতে পারি। এবং ওদের থিমগুলোকে

প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারি। যেমন: খ্রিস্টান জঙ্গি/ হিন্দু জঙ্গি ব্যবহার করতে পারি ব্যাপকভাবে। যেগুলো আমাদেরকে খারাপ প্রমাণে ওরা ব্যবহার করে, সেগুলো ওদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করব। আর ওরা ওদের যে কনসেপ্টগুলোকে এবসোলিউট কল্যাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেগুলোর ডেফিনেশন/সংজ্ঞায়নকে ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারি। নারী অধিকার, নারীশিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সুশাসন, ক্ষমতায়ন, বৈষম্যদূরীকরণ, আধুনিকতা এগুলোর কথা উঠলেই আমরা পাল্টা প্রশ্ন করব: তুমি কোন গণতন্ত্রের কথা বলছ, গণতন্ত্রের ইউরোসেন্ট্রিক (ইউরোপীয়) সংজ্ঞা নাকি অন্য কিছু। নারীশিক্ষা-অধিকার-ক্ষমতায়নের ইউরোপীয় সংজ্ঞা নাকি অন্যকিছু। ওরা যে পরিভাষাগুলো চাপাতে চায় সেগুলোকে এবসোলিউট বানানোর চেষ্টাকে ভণ্ডুল করে 'ইউরোপীয়' ট্যাগ দিয়ে কোণঠাসা করা।

ফেসবুক এটা করার অনেক শক্তিশালী জায়গা। সবাই শুরু করুন। আর জাতীয়তার সীমার বাইরে গিয়ে সম্বোধন করুন। আমার আরাকানের ভাই (নট আরাকানীরা), আমাদের সিরিয়ার বোন (নট সিরিয়ান), আমাদের ভারতের সন্তানরা (নট ভারতীয়)।

একটা শব্দ অনেক বড় বিষয়। একটা শব্দই একটা অস্ত্র। একটা শব্দই একটা ইতিহাস, একটা ভবিষ্যত। একটা শব্দই একটা বিপ্লব।

১১.

প্রচুর লিখতে হবে। সাহিত্যের ঘাড়ে ভর করেই ঢুকতে হবে। আরো আরো আরিফ আজাদ দরকার। যারা লিখছেন, লেখার মান আরো বাড়াতে হবে। যারা লিখছেন না, নিজের সত্তা ঘেঁটে একটু দেখি না চলেন। আর আমরা যারা

পাঠক, আমাদের দায়িত্ব এগুলো ছড়িয়ে দেয়া, অনলাইন-অফলাইনে। আর দুআ-বদদুআ চলবে। আমাদের অভিভাবক এমন একজন যিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

১২.

আমাদের এতীম বাচ্চারা দীন শিখছে। আল্লাহ এই ভাইদের উত্তম জাযা দিন। ভালো কিছু দেখলে অল্পতেই অনেক আশা খুঁজি, অনেক স্বপ্ন দেখে ফেলি।

এর মাঝে আপনার সন্তান কোনটা? তাকে এর মাঝে আবিষ্কার করার আগেই সতর্ক হওয়া দরকার কি না? কাফির তাতারীরা তখন বাগদাদ থেকে বহুদূর। সীমান্তে লড়াই চলছে। আব্বাসী খলিফার বাহিনী লড়ছে। আর উম্মাহর অভিভাবক রাজধানীর উলামাগণের মাঝে তখন চরম ইখতিলাফ: কাকের মাংস খাওয়া জায়েয কি না। প্রতিদিন বাহাছ, গলা ফাটানো ওয়াজ, দরস চলছে। ওদিকে সীমান্তে মুসলিম ভূখণ্ড রক্ষার লড়াই চলছে। তাতারীদের প্রবল পরাক্রমে প্রতিদিন জমিন হারাচ্ছে খেলাফত। কিছুদিন পর বাগদাদের পতন হল। মানুষের কাটা মাথার পাহাড়। তাতারীরা নির্দিষ্ট একটা পাহাড় দেখিয়ে গর্ব করে বলত, এই যে মাথাগুলোর পাহাড় দেখছ, এগুলো সব তোমাদের রাহবার মুহাদ্দিসদের মাথা।

সিরিয়া, আরাকান, আফগান এগুলো এখনো অনেক দূর। কাটা মাথার পাহাড়ে পরিচিত কিছু মাথা। এতীমদের দলে আমার বাচ্চাটা। দেরী আছে এখনো। আমি তো ভাল আছি।

১৩.

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন (মিলিয়ে নিন, এখানে না দিলেও চলবে)।
সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন। প্রতি প্রশ্নে একটি উত্তরই গ্রহণীয়।
প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।

ক. আপনি ব্যক্তিজীবনে কোন ধ্যানধারণা মতে চলেন?

১. নিজের মনমতো

২. বাঙালিয়ানা (বাঙালিয়ানার সংজ্ঞা সুপ্রীতি ধরের স্ট্যাটাস থেকে শিখে আসুন)

৩. ইসলাম

খ. আপনি পারিবারিক জীবন কিভাবে সাজিয়েছেন?

১. সদস্যদের ধর্মীয় স্বাধীনতা

২. ক্যারিয়ারকেন্দ্রিক পরিবার আবহ

৩. ইসলাম

গ. আপনি সামাজিক জীবনে কিভাবে চলেন?

১. লৌকিকতা

২. বিভিন্ন সার্কেলে তাল মিলিয়ে

৩. ইসলাম

ঘ. আপনি কোন অর্থব্যবস্থায় বিশ্বাসী?

১. পুঁজিবাদ

২. সমাজতন্ত্র

৩. ইসলাম

ঙ. রাষ্ট্রব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

১. গণতান্ত্রিক

২. সমাজতান্ত্রিক

৩. ইসলাম

চ. কোন আইন সর্বোচ্চ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে বলে মনে করেন?

১. ব্রিটিশ প্রবর্তিত

২. নতুন গবেষণালব্ধ

৩. ইসলাম

এই ৬ টা প্রশ্নের জবাব কী, তার উপর নির্ভর করবে আপনি নিচের ৩ টি প্রশ্নের জবাব কী দিবেন।

১. তোমার পালনেওয়ালা কে?

২. তোমার দীন/ জীবনপদ্ধতি কি?

৩. এই ব্যক্তি কে? (চেহারা দেখিয়ে)

কোন কোন ক্ষেত্রে মেনে চলতে পারছি না। কিন্তু অন্তরে রাখেন। দিলে আফসোস রাখেন। আল্লাহ, তুমি তৌফিক দিলে ঐ ক্ষেত্রেও মেনে চলব।
আফসোসের দাম আছে। বিশেষ কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মানতে পারছেন না, এই কষ্টটা রাখা চাই। চান্স পেলেই মানবো এমন তৈরি থাকা চাই।

হঠকারিতার জনক শাইতান। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম।

১৪.

বদদুআ করাও সুন্নাত। শুধু হিদায়াতের দুআ করাকেই সুন্নাত ভাবার একটা প্রবণতা দেখা যায়।

ফজরে 'কুনুতে নাজেলা' পড়ার প্রয়োজন কি এখনো দেখা দেয়নি। উম্মত কি যথেষ্ট কষ্টে নেই? উলামা হযরতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কমপক্ষে দুআটুকু তো করতে পারি। এটুকু থেকেও মাহরুম হচ্ছি? সব মসজিদে কুনুতে নাজেলা শুরু হলে রহমতের দরিয়ায় জোয়ার উঠতেও তো পারে। আমভাবে 'আমল' এর তৌফিক মিলতেও তো পারে ফিতনা সরে যেয়ে। তবে কি কোন ইশারা আমাদেরকে এই শেখানো আমল করতে দিচ্ছে না?

এতো নিফাক আমার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ছিলো? ইন্নালিল্লাহ। আর তো কিছুই করতে পারছি না। ইয়া আল্লাহ, আপনি প্রতিশোধ নেন। কাউকে ছাড়বেন না। ওদের আর যারাই ওদের সহযোগী, সবাইকে ধ্বংস করে দেন। ওদের জীবনকে দোযখ বানিয়ে দেন। ওদের দেশ ভেঙে টুকরো করে দেন। আসমানী বালা দিয়ে পেরেশান করে দেন। আর আমাদের মত নপুংসকদের মাফ করে দেন, পুরুষ না বানিয়ে কবরে নিয়েন না।

১৫.

ক.

প্রশংসা আল্লাহর যিনি নানান বান্দাকে দিয়ে নানান কাজ নেন। ইখলাসের ভিতে কাজ মকবুল হয়। কাজে আল্লাহ ব্যবহার করছেন মানে এই নয় যে, সে কবুল হয়ে গেছে। যেটুকু কাজ আল্লাহ নিচ্ছেন সেটুকু কবুল হচ্ছে কি না। এজন্য দুআ-ইস্তিগফার। আল্লাহ তৌফিক দিন আমাকে।

খ.

সেকুলার আইন, পলিসি, রুলসের সাথে যত পরিচয় হচ্ছে তত আমি সবগুলোর ভিতর প্রায়োগিক শূন্যস্থান অনুভব করি। অনেক সুন্দর ভারি ভারি কথা, সুপারিশ, পদক্ষেপ, মহাপরিকল্পনা। সুন্দর সুন্দর। দুর্নীতি নির্মূল, জবাবদিহিতা নিশ্চিত, সুশাসন, শুদ্ধাচার ইত্যাকার শ্রুতিমধুর শব্দ, কমিটি, সাবকমিটি, সভা, বিভিন্ন লেভেলে মতবিনিময়। সবই ঠিক আছে। প্রয়োগে গিয়ে শূন্যস্থান। অপূরণীয়, অক্ষয়, অব্যয়, অগ্রাহ্য করা যায় না, মুছে ফেলা যায় না। ওটা পূরণ হলেই সব হয়ে যায়, উজুদে এসে যায়, বাস্তবায়ন হয়ে যায়।

গ.

শূন্যস্থানটা চিৎকার করে বলতে চায়, একটা শব্দ বসাও আমাতে। ঐ শব্দটা বসাও, সব হয়ে যাবে, বসিয়েই দেখ। লজ্জা পেওনা, কারো ভয় করোনা, কে কী ভাবল কেয়ার করো না, বসিয়ে দেখোইনা। একটা শব্দ-- 'তাওহীদ'। 'আল্লাহ ছাড়া বাকি সব কিছু'র বিপরীতে এক আল্লাহকে মেনে নিলেই সব সমাধান হয়ে যায়। জবাবদিহিতা, সুশাসন, শুদ্ধাচার, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন। আল্লাহকে মেনে নিতে লজ্জা-ভয় যতদিন করবে, ততদিন সবকিছুই সমস্যা মনে হবে। আর সবখানে সব অবস্থায় আমার উপর

কর্তৃত্বশীল আল্লাহকে মেনে নিলেই সবকিছুকেই সমাধান মনে হবে। এই একটা শব্দ উচ্চারণে লজ্জা/ভয় খরচ করায় কোটি কোটি টাকা, হাজার হাজার ব্যর্থ/অর্ধব্যর্থ মিটিং, ট্রেনিং আর ব্রেনওয়ার্ক, চক্রবৃদ্ধি হারে তৈরি করে নতুন নতুন সমস্যা। কবে বুঝবো আমরা, হায়।

ঘ.

'জেন্ডার সমতা' বিষয়ে স্যার আজ দারুণ পড়িয়েছেন। নারী অধিকার/নারী ক্ষমতায়ন/নারী শিক্ষা এগুলো হবে আমাদের মত করে। এ অঞ্চলের মানুষের ধর্ম-মূল্যবোধ-মানসগঠনের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এগুলো করতে হবে। সেটাই উন্নয়ন। সুইজারল্যান্ডের ফর্মুলা আমাদের মানতে হবে কেন? এরকম সব ক্ষেত্রেই। ওদের সব ফর্মুলাই অন্ধভাবে মেনে ওদের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হবার এই মাইন্ডসেট থেকে বেরোতে হবে। ওদের সাথে আমাদের যায় না। শিখতে হলে জাপান/চীন/কাতার ময়দানগতভাবে ওদের চেয়ে আমাদের বেশি অনুসরণীয় হওয়া উচিত।

সারাদিনের ৬ ঘণ্টা সেকুলার ওয়াশের পর ঘুমের আগে আমার অনুভূতি: দিনশেষে সমাধান, সর্বস্তরে তাওহীদ। এক আল্লাহর কর্তৃত্ব মেনে নেয়া। ও মানুষ, ফা আইনা তাযহাবুন।

১৬.

আরেকবার বলা যায়না 'হাসবিয়াল্লাহ'? কোন 'কিন্তু' ছাড়া, কোন 'হিকমাহর ব্যান্ডেজ' ছাড়া?

যদি ভুল না হয়, আগুনে ফেলার টাইমে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম একমাত্র মু'মিন। উনি মিটে গেলে দীন মিটে গেল। ঐদিন তো উনি একটা হিকমত দিতে পারতেন। নমরুদের সাথে একটা মিউচুয়ালে কম্প্রোমাইজ করতে পারতেন।

যেহেতু আমি মিটে গেলে এই অভাগা দীনের কি হপে? কিন্তু হিকমত ছাড়াই 'কুফর বিত তাগুত' করেছেন।

উনি একা। আর আমরা ১২০ কোটিতেও একবার বলে উঠতে পারি না 'হাসবিয়াল্লাহ'। 'বাপের বেটা' হইতে পারলাম না। 'মিল্লাতে ইবরাহীম' জবানেই রয়ে গেল, ইয়া আবী। 'বাপে খেদানো' উম্মত, খালি নবীজী 'পুরো না মিটার' দুআ করেছিলেন ভাগ্যিস।

বিস্তারিত জানতে পড়ুনঃ 'মিল্লাতে ইবরাহীমের জাগরণ' প্রিয় হযরত Ali Hasan Osama অনূদিত।

১৭.

ক.

বদনজর সত্য। আমাদের অস্বীকার করার দ্বারা সত্য জিনিস মিথ্যা হয়ে যাবে না। আধুনিক বিজ্ঞান 'কুসংস্কার' 'অন্ধবিশ্বাস' বলে বলে মুখে ফেনা উঠিয়ে এখন এসে স্বীকার করছে যে, কারো পজিটিভ/নেগেটিভ ইমোশন আমার আপনার কোষের ভিতরের '৪র্থ দশায় থাকা পানিকে' প্রভাবিত করে পানির ধর্মকে চেঞ্জ করে দিতে পারে, ফলে আমরা অসুস্থ হতে পারি। বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বাঘা বাঘা ফেলোরা মত দিচ্ছেন। বিস্তারিত 'কষ্টিপাথর'-এ।

খ.

পর পর ২ টো রিসার্চ-এ 'নজর' বা পজেটিভ/নেগেটিভ ইমোশনের distant effect (দূর থেকে ছবির উপর) প্রমাণ হয়েছে। কষ্টিপাথর বইয়ে 'জীবনের অপর নাম পানি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। যারা নিজের, স্ত্রীর ও সন্তানদের

ছবি ফেসবুকে দেন তারা সাবধান হয়ে যান। আপনার পোস্ট করা ছবি দেখে কেউ 'মাশাআল্লাহ' বলে না। বারাকাহর দুআ করে না। বাচ্চা নিয়ে ডাক্তারের কাছে লাইন দেয়া লাগলে, বউয়ের সাথে ঝগড়াঝাটি বাড়লে বুঝে নিয়েন।

গ.

বেশি বেশি আয়না দেখা, নিজের দিকে তারিফের চোখে চেয়ে থাকা বাদ দিন (বোনেরা বিশেষ করে)। নিজেকে বেশি পছন্দ হলে 'মাশাআল্লাহ' বলুন। আয়না দেখার দুআ পড়ুন।

ঘ.

আরেকজনের কাছে নিজের গল্প কম করুন। আপনার কি কি আছে, কে কে আছে, ছেলে কত বড় চারকি করে, মেয়ে কত বড় জায়গায় বিবাহ হইছে, আপনি হ্যান ত্যান- এসব প্যাচাল পেড়ে আরেকজনের বদনজর টেনে আনবেন না।

ঙ.

মাশাআল্লাহ, বারাকাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ - এগুলো বলার অভ্যাস করুন। আপনার নজরও যেন না লাগে কারো উপর। কারো ট্রল করতে ইচ্ছে করলে 'কষ্টিপাথর' পড়ে এসে ট্রল করুন। নয়ত শুধু শুধু ট্রল করে নিজের ওজন কমাবেন না। দৌড়ে ওজন কমান, সুস্থ থাকুন।

১৮.

কোরিয়ান ভাষা শিখুন।

চাইনিজ, জাপানি শিখুন।

S@ifur's এ করুন ৫ টি ফ্রি ক্লাস... IELTS এ এক মাসে ৭ স্কোর। বিফলে মূল্য ফেরত।

যেকোন দেশে যাবার আগে ঐ দেশের ভাষা শেখাটা কত ইম্পর্টেন্ট, না? একটা যোগ্যতা। কোনো কোনো দেশ তো ভিসাই দিবে না থাকাপড়ার, যদি ভাষা না জানেন!

জান্নাতের ভাষা যেন কি? আমি আসলে জান্নাতে যেতে কতটা উদগ্রীব, কতটা আগ্রহী? আসলে?

আরবি না শেখার কি কি কারণ আছে আমার? কারণগুলো কতটুকু 'কারণ'?

১৮.

ক.

আমরা কিছু বেচারা আছি। না আলিম, আর না ইলমের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক কোন যোগাযোগের ছিটেফোটা। আমরা ফেসবুক গুতোই আর আপনাদের 'পয়লা দর্শন' করে রাখি। আপনাদের 'দেয়ালে' সাজানো ফুলের রঙ দেখি, গন্ধ নিই। চনমনে প্রেরণা নিই 'সিজনুল মুমিন'এর দিনগুলো কাটিয়ে দেবার। নতুন আশায় বুক বাঁধি। কাগজের প্লেন (পড়ুন স্বপ্ন) বানাই, উড়াই, উড়ি। শিশুর মত একটুতেই তৃপ্তির উপলক্ষ খুঁজি। দুঃস্বপ্নের ভিড়ে একটু স্বপ্ন চাই। আপনাদের ঝগড়া আমাদের দেয় হতাশা, স্বপ্নভংগের বোবাকান্না। কিছু বলতে পারিনা, সইতে পারিনা। দুজনই প্রিয় মানুষ। সদ্য হাটতে শেখা শিশুর মত ভয়ে থমকে যাই। আপনাদের মিলে যেতে দেখলে আবার প্লেন বানাই, উড়ি।

বিঃদ্রঃ দুজনের একটা যৌথ কাজ হয়তো আরো কাছে আনবে। আল্লাহ আমাদেরকে দ্রুত প্রস্তুত করুন বিজয়ের জন্য।

খ.

আমাদের কাছে তিনটা বড় ধরনের মওকা ছিল। এখনও আছে। তবে হিকমতের পরতে মওকাগুলো ঢাকা পড়েছে। ওয়াজ, জুমআর আগের আলোচনা আর যেকোন সেকুলার অনুষ্ঠানের আগে কুরআন পাঠের রীতি।

এই তিনটি জায়গায় কুরআনের সুস্পষ্ট আদেশগুলো আলোচনা ব্যাপকভাবে শুরু হওয়া দরকার। বিশেষ করে সেকুলার অনুষ্ঠানের আগে কুরআন পাঠ দিয়ে শুরু করা আমার কাছে মনে হয়েছে তামাশা। কুরআন বিরোধী কাজ (মিউজিক, মিক্সিং) এর আগে কুরআন পাঠ, তাও আবার কেউ শোনেনা। অপমান। এসব জায়গায় একান্তই তিলওয়াত করতে হলে 'বিধানমূলক' ও 'ইত্তেবায়ে হাওয়া'র শাস্তিমূলক ও দুনিয়ার খেলতামাশা সংক্রান্ত ভীতিপ্রদ অংশ বংগানুবাদসহ পড়া দরকার।

এখনও সময় আছে।

২০.

ছোট মানুষগুলো দেখতে কাছাকাছি। চেহারার আলাদা আলাদা বিষয়গুলোও ছোট ছোট থাকে বলেই বুঝি একরকম একরকম লাগে। আপনাদের কাছ থেকে জাস্ট এক সেকেন্ড সময় নেব।

এই বয়সী একটা মেয়ে দিয়েছেন আল্লাহ আমাকে। কেবল হাঁটতে শিখেছে। এক কদম দিলে পরের কদমটা তাড়াতাড়ি ফেলতেই হয়। সেটার ব্যালেন্সের জন্য পরের স্টেপটাও জরুরি হয়ে পরে। তার পরেরটা আরও জরুরি। এরপর

প্রত্যাশার চাপ সামলাতে না পেরে পড়ে যায়, আবার শুরু হয়। এভাবে সারাদিন দৌড়ের উপর থাকে আর দাদা-দাদী-ফুপি-বাপ-মা'র খেলনা হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করে। আমাকে আপাতত দ্বিত্ব ছাড়া শুধু 'বা' বলে ডাকে। মাঝে মধ্যে বুকের সাথে চিপে ধরে দুআ করি- ইয়া আল্লাহ আমার আল্লাহর পাগলীকে হাফিজা, আলিমা, মুআল্লিমা, মুবাল্লিগা, মুজাহিদা হিসেবে কবুল করুন। লম্বা হায়াতে দীনের খিদমত করার তৌফিক দিন।

গত ক' দিন সিরিয়ার বাচ্চাদের ধুলোমাখা রক্তমাখা মুখখানিতে আমার 'আল্লাহর পাগলী'র মুখ কপিপেস্ট করে চোখ বুজে দেখার চেষ্টা করি। অন্য এক অনুভূতি। নাম জানি না এই অনুভূতিটার। আপনেরা জানলে কমেন্ট কোরেন। আপনিও দেখার চেষ্টা করুন না প্রিয়জনের মুখগুলো বসিয়ে। আমাদেরও কি হতে পারে না এমনটা, হতে পারত না? সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াত ওদের উপর এসে পড়েছে। এবার এগোচ্ছে আমাদের দিকে। টেনশন নিয়েন না।

আহ, না জানি কত পরতের পর পরত হিকমাহ আর মাসলাহাতের পর এমন ভাগ্য আসে। ওগুলো ওদের মাথায় ব্যান্ডেজ না কিন্তু। পরতের পর পরত আপোস আর হিকমাহ পেঁচানো হয়েছে। চেষ্টা করলেই দেখতে পাবেন। আহ, আমার আল্লাহর পাগলী, আমাকে মাফ করে দিস, মা। তোর সামনের কষ্টের জন্য আমার আজকের হিকমাহটুকু দায়ী রে মা। আমার জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নিস মা। আমি তোর অসহায় হেকমতওয়ালা বাপ।

২১.

তথ্যগোপন, আংশিক উপস্থাপন, রেফারেন্স বানানো আর ভুল ব্যাখ্যা- নাস্তিকের প্রতিটি লেখার ভিত্তি। এই ৪ টা জিনিস দিয়ে কাউকে 'জারজ' প্রমাণ করে দেয়া যায়। সেই তার কাছেই সেটা 'যৌক্তিক',

'রেফারেন্সবহুল', 'শক্ত যুক্তি' মনে হবে এমনভাবে উপস্থাপনও করা যায়।

১. মুসলিম ও মুসলিম থাকতে চাই

২. মুসলিম কিন্তু কোনভাবে ভুল প্রমাণ হত ইসলাম, তাহলে বেঁচে যেতাম।

দুই দল। আপনি কোন দল? ১ নং হলে ওদের লেখা আপনি কেন পড়বেন? কী যুক্তিতে? আপনি কীভাবে আরো ভাল মুসলিম হওয়া যায় সে চেষ্টা রেখে ওদের লেখা পড়ে সংশয় তৈরি করছেন নিজের ভেতর। নিজে যেচে যেয়ে ঈমান হারালে সাজিদ-ফারিস আপনার কী করবে?

আর ২ নং তো কাফিরই। ওরা এদের ফলো করবে, লাইক দিবে, প্রশংসা করবে। এতে আপনার কষ্ট পাওয়ারও কিছু নেই। 'সরলমনা মুসলিমের ঈমান যাচ্ছে' বলে হায় হায় করারও কিছু নেই। এরা সরলমনা মুসলিম না, এরা ভোদাইমনা কাফির।

আর লেখকদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ। ওরা তথ্যচুরি, ভুলব্যাখ্যা করতেই থাকবে আর আপনি এগুলোর চুরি প্রকাশ করার পিছনে সময় নষ্ট করবেন না। বরং আপনারা ইসলামের সৌন্দর্য নিয়ে লিখতে থাকুন, যাতে ঈমান বাড়ে।
যারা যেচে গিয়ে ঈমান হারাচ্ছে, ওদের জন্য নিজেকে শেষ করে দেবেন না। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের গবেষণা ইসলামের পায়েই মাথা ঠুকছে।
'কষ্টিপাথর' এই অসহায় বিজ্ঞানকে নিয়েই। যারা ইসলাম মেনেছে বিশ্বাসে তারাই ঠিক ছিল, এটাই বিজ্ঞান স্বীকার করেছে বার বার।

আসছি ইনশাআল্লাহ। লিখে আমার পশ্চিম-ওয়াশ মগজ আত্মসমর্পণ করেছে বিশ্বাসী হৃদয়ের কাছে। আপনাদের কী অবস্থা জানাবেন কিন্তু।

(ভাষারীতির জন্য দুঃখিত)

২২.

ক.

কে কেমন বই পড়বেন সেটা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। পছন্দ-আগ্রহ এগুলো মেলেনা, মেলানোর চেষ্টা করাও ম্যাচুরিটি না থাকার লক্ষণ। তবে যে বই আমি পড়ার আগ্রহ পাইনা, তাকে 'গাঁটের পয়সা নষ্ট' বা 'মাগনা দিলেও পড়িনা' এগুলো আরও ম্যাচুরিটিহীনতা। আপনে যদি না পড়লেন তাহলে পয়সা নষ্ট বুঝলেন কিভাবে।

যেখানে কারো আবেগে আঘাত না দিলেও চলে, সেখানে এই হাত নিশপিশ করার কি অর্থ? একটা স্ট্যাটাস কি আপনার দিতেই হবে? বাধ্য? বে-ইলমী একটা মন্তব্য কি করতেই হবে?

খ.

অন্যদের কথা জানি না। 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' লেখা হয়েছে আমার জন্য। আমার পশ্চিম-ওয়াশ মগজ কিছু বিষয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগত। সংশয় না, অস্পষ্ট লাগত। যুগের জন্য নির্দিষ্ট বলে ভাবতাম। আমার মত পাবলিক হয়ত আরও আছে, তাদের বুকটাও যেন তৃপ্তিতে ভরে যায় এজন্য বই আকারে আনা। আমি এখনও ওটা পড়ি মাঝেসাজেই। লিখেও তৃপ্তি পেতাম, এখন পড়েও পাই। মিন্ট ফ্লেভার হৃদয়ে পড়ি "রদ্বিতু বিল্লাহি রব্বাও........রাসূলা"। আমার উদ্দেশ্য পুরা হয়ে গেছে। এখন কেউ 'পয়সা নষ্ট' বা 'মাগনাও পড়িনা' বললেও যায় আসেনা। আলহামদুলিল্লাহি আলা দ্বীনিল ইসলাম।

২৩.

- আপনি কি জানেন না, আরজ আলী মাতবর একজন নাস্তিক?

- জি

- তারপরও তার বই পড়বেন?

- না মানে, একটু জানার জন্য যে কি লিখেছে। খুব নাম ডাক শুনি তো।

- একজন মুসলিম থেকে নাস্তিক লোক তার বইয়ে কি কি লিখতে পারে তা কি আপনি জানেন না?

- জি জানি, তারপরও জানার জন্য আর কি?

- কুরআন- হাদিস সব জেনে ফেলেছেন?

- না, এখনও না।

- কুরআন হাদিস জানার ইচ্ছে হচ্ছে না, নাস্তিকের লেখা জানার ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি কি গবেষক? খণ্ডন করে কিছু লেখবেন ভাবছেন?

- না রে ভাই, এমনি।

- ভাই, একটা কথা বলি। আপনি স্পষ্ট শয়তানের ধোঁকায় আছেন, রুকিয়া করান।

- আসলে ভাই, আরিফ আজাদ ভাই ওনার যুক্তি খণ্ডন করে বই লিখেছে তো। বইটা ভালো মত বুঝার জন্য আরজ আলী কি লিখেছে জানাটা দরকার না? বলেন?

- ওওও, তাহলে তো শয়তানই আপনার ধোঁকার মধ্যে আছে। জলাতঙ্ক টিকাটা কাজ করে কি না জানার জন্য তো পাগলা কুকুরের কামড় একটা খেতেই হয়, তাই না?

বিঃদ্রঃ আরিফ আজাদ তার বইয়ে আরজ আলীর গণ্ডমূর্খ দাবিগুলো উল্লেখ করে করে খণ্ডন করেছেন। তাই আরজ আলীর দাবি জানার জন্য আলাদা করে তার বই কিনে পয়সা খরচের দরকার নেই। টাকা বেশি হয়ে গেলে দানসাদকা করেন। যদি একান্তই শয়তানে লাড়েচাড়ে তেহেলে ভিন্ন কথা।

২৪.

ক.

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আবার গুনাহগারকে দীনের কাজে ব্যবহার করেছেন। আপনাদের 'কষ্টিপাথর'-এর ডাক্তারি পরীক্ষা শেষ, মানে একজন সম্মানিত এক্স-ঢামেক সহযোগী অধ্যাপক স্যার সম্পাদনা শেষ করেছেন।শারঈ ও ভাষাগত সম্পাদনা করছেন সব্যসাচী তরুণ আলিম মুফতি Ali Hasan Osama হাফিযাহুল্লাহ। এই মূহুর্তটা খুব কঠিন। আপনাদের দুআ দরকার আমার।

খ.

এই বইমেলায় একটা দারুণ, প্রয়োজনীয়, 'ভাষায় প্রকাশ করা যায় না' এরকম একটা বই আসছে। আজকের দিনে এই মুহূর্তে এই পৃথিবীতে যে যেখানে আছেন, সেখানে বসে কুরআন-হাদিস ছাড়া আর যে বইটা পড়া আপনার জন্য অক্সিজেনের মত জরুরি। এ বিষয়ে আগে বাংলা ভাষায় মৌলিক-যৌগিক কোন লেখাই হয়নি। এবছর আর কোন বই না পড়েন, এটা পড়বেন প্লিজ মৃত্যু আসার আগে, পায়ে ধরছি আপনাদের। একটুও বাড়িয়ে বলছিনা, আমরা-আমাদের

সন্তানরা ভয়ংকর ভবিষ্যতের দিকে এগুচ্ছি।পাণ্ডুলিপি পড়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি নিজে ইনশাআল্লাহ ১০০ কপি কিনব, আত্মীয়স্বজনকে দেবার জন্য।... "মুক্ত বাতাসের খোঁজে".... লেখক: লস্ট মডেস্টি ব্লগ। বিষয়: পর্নোগ্রাফির চেপে রাখা কথা, ভয়াবহতা ও বাঁচার উপায়। অর্থসংকট কারো থাকলে আর কোন বই না কিনেন, কষ্টিপাথরও পরে পড়লেও চলবে। কিন্তু এ বইটা আপনাকে এখনই পড়তে হবে, এই মুহূর্তে।

গ.

পৃথিবীর সবার রুচি এক না। ফেবুতে যদি কারো লেখা আমার ভালো লাগে এবং তার সাথে আমার আর কোন লেনদেন না থাকে। স্রেফ তার লেখা আমি পড়তে চাই, এমন। তাহলে আমি তাকে ফলো করি। দারুণ অপশন। ফ্রেন্ড হলে একটা অসুবিধা আছে। তার লেখা আমার ভাল লাগে, কিন্তু আমার লেখা-ছবি- আপডেট এগুলো তার রুচির সাথে নাও যেতে পারে। তাই ফলো করি তাদের। শুধু শুধু তাদের বিরক্তির কারণ হইনা। আলহামদুলিল্লাহ।

২৫.

'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' নিয়ে...

এক.

মেহেরবানি করে এটাকে 'নাস্তিকদের বই', 'নাস্তিকদের উদ্দেশ্যে লেখা বই' বা 'নাস্তিকদের খণ্ডন করে লেখা বই' প্রভৃতি লকব না দিই। ভূমিকাতে বিষয়টা স্পষ্ট করেছি গোটা গোটা অক্ষরে। পর পর ২ টা নোট দিয়ে বিষয়টি ক্লিয়ার করতে চেয়েছি। এটা লেখার উদ্দেশ্য আমি-আমরা- আমাদের মধ্যে সংশয়ে হীনম্মন্যতায় যারা- আমাদের আগে বাড়ার জন্য।

দুই.

জিযিয়া-দাসত্ব-দাসীপ্রথা এগুলো শরীয়াহর বিধান। এগুলোর ব্যাখ্যা আলিমগণ যেটা করবেন, সেটা। ভূমিকায় আমি লিখে দিয়েছি যে বিধানের ব্যাখ্যা করা আমার উদ্দেশ্য-যোগ্যতা-কাজ কোনটার ভিতরই পড়ে না। আমি শুধু ইসলামী বিধানের 'কল্যাণ' খুঁজেছি। কল্যাণ, কি আবার পড়ুন-- 'কল্যাণ', সামাজিক ফলাফল। আমি এই পুরো বইয়ে দুটো জিনিস দেখাতে চেয়েছি--

১. ইসলামের বিধানগুলোই এখন পর্যন্ত দেয়া সবচেয়ে কল্যাণকর মডেল। আপনার পশ্চিমা বিবেকের কাছে বা অমুসলিমের কাছে কখনো 'জুলুম'/ 'অমানবিক' মনে হলেও এটাই ঐ অবস্থায় ঐ পরিমণ্ডলে সবচেয়ে নিখুঁত মডেল যেটা নিশ্চিত করে পক্ষ-বিপক্ষ দুজনেরই সর্বোচ্চ কল্যাণ। এটা বিধানের ব্যাখ্যা না, জাস্ট কল্যাণটা কি, এটা দেখানোই উদ্দেশ্য। অনেকে ব্যাখ্যা মনে করে চার্জ করছেন, তাদের জন্য বললাম।

২. ইসলামের বিধানকে কেউ কেউ বাঁকা চোখে দেখে। আবার তাদের হাতে আরো নিখুঁত কোন মডেলও নেই। আবার তাদের সংবিধান- সমাজ- প্র্যাকটিসে শোভা পাচ্ছে ইসলামের বিধানের মত বিধান। এই যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। একই জিনিস ইসলাম বললে দোষ, সেকুলার প্রভুরা বললে দোষ নেই। আরও উত্তম ফর্মুলা ইসলাম দিলেই দোষ। এই দ্বিমুখী নীতি তুলে ধরতে চেয়েছি।

আশা করি, আর কোন প্রশ্ন থাকবে না। একজন যোগ্য মুফতি সাহেব শারঈ সম্পাদনা করেছেন। ১ম সংস্করণও নজরে ছানী করেছেন একজন প্রতিভাবান তরুণ আলিম। আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহই অন্তরসমূহকে জানেন।

২৬.

অনলাইন লেখকদের এগিয়ে আসতে হবে... ইসলামী মনোভাবাপন্ন স্পন্সরদের এগিয়ে আসতে হবে... খুব দরকার। আমরা বাঘের মুখ থেকে ফিরেছি। আল্লাহ ফিরিয়ে এনেছেন। আমাদের সন্তানদেরকে আমরা সেই বাঘের মুখেই আবার ঠেলে দিতে পারি না। প্লিজ আপনারা কিছু করেন।

আরেকটা বিষয়। মানেন আর না মানেন, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিপক্ষ এব্যাপারে অনেক অভিজ্ঞ, অনেক অগ্রসর। ওদের বই-পত্রিকা নিয়ে আমাদের গবেষণা করতে হবে। পেজ মেকাপ-ছবি-মান এসব ওদের থেকে শিখতে হবে। সেভাবে আমাদের অস্ত্রগুলো শাণিত করতে হবে। একান্ত নিজের মতামত। ইগনোর করা যেতে পারে অপছন্দ হলে।

শিশুকিশোরদের জন্য লেখা আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে কঠিন। আমার হয় না। যোগ্য একদল লেখক এই সেক্টরেও তৈরি হওয়া দরকার। আল্লাহ সহজ করুন।

২৭.

বাঙলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসে বেস্টসেলার বই কয়টা? কতগুলো কপি বিক্রি হলে তাকে 'বেস্টসেলার' বলে? আমরা বিদেশী কিছু বইয়ের নাম জানি যেগুলো 'বেস্টসেলার' নামে বেশ পরিচিত। বেশ ঘটা করে তারা বইয়ের উপর লিখে থাকে:

ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার 'দাদা ভিঞ্চি কোড' এর লেখক ড্যান ব্রাউন রচিত- দ্য অরিজিন

কিন্তু বাংলা ভাষার কোন বইয়ে এ তকমা আমাদের গিলতে কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়। মানতে কষ্ট হলেও এটাই সত্য যে, ২০১৭ সালটা বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছে ১ম বাংলা বেস্টসেলার। ১ বছরে বিক্রি হয়েছে দেড় লাখ কপির বেশি। শুধু বাংলাদেশে। ইংরেজি অনুবাদটা হতে দেন না। বাংলা- বাঙালিত্ব চেতনা বিক্রি করে যারা খান, তাদের তো নাচার কথা বাংলা ভাষার এত বড় অর্জনে।

সুতরাং পরের বইটার নামকরণে ছোট ফন্টে না, বড় বড় ফন্টে লেখা হোক: বেস্টসেলার 'প্যারাডক্সিকাল সাজিদ' এর লেখক আরিফ আজাদ এর পরবর্তী বই 'আরজ আলী সমীপে'। আরিফ আজাদের প্রচার দরকার নেই। দরকার আমাদের।
দরকার বিশ্বসাহিত্যে বাংলার অহংকার করার মত কিছু একটার।

লেখাটা যেন সরানো না হয়। এ দাবি বাংলা ভাষার, ভাষা শহীদের রক্তের দাবি এটা। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাসের দাবি এটা। আলহামদুলিল্লাহ।

২৮.

ভাইলোগ,

গল্পস্বল্প অনেক হয়েছে, আরো হবে ইনশাআল্লাহ। 'সাজিদ-২' ভাই রাস্তায় আছে, 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-২' সাহেবও ঘর থেকে বাইর হয়নাই এখনো, দাঁত মাজতেছে। 'আরজু মিয়া' মাতিয়ে রেখেছে আপনাদের। আড্ডা- গল্প চলবে।

কিন্তু নাস্তিক্যবাদের পিওর তাত্ত্বিক দিকটায় আমাদের শত্রুব্যুহ ছিন্নভিন্ন করতে হবে। যুক্তির প্যাঁচগুলো, দর্শনের মোটা চামড়াগুলোও ছাড়াতে হবে। ওদের 'বীভৎস বিভ্রান্তি', 'কদাকার

লুকোছাপা' আর 'গা গুলানো সব হিপোক্রেসি' আমাদের সামনে যেন স্পষ্ট থাকে। শুধু তাই না, স্রেফ একটা তত্ত্ব হিসেবেও 'নাস্তিকতা' যে 'চতুষ্পদ লেভেলের নিউরোনাল মিথষ্ক্রিয়া' সেটা বুঝে নিতে হবে, তাহলেই এক কাপ দই ঢেলে বেরোবে এক টন দই। আমরাও মগজকে খেলিয়ে নিত্য নতুন যুক্তির অস্ত্র বানাতে পারব। সেজন্যই নাস্তিকতার তাত্ত্বিক অসাড়তা জানাটা খুব দরকার।

একসময় গ্রীক দর্শনের অসাড়তা প্রমাণে আমাদের আলিমগণ লড়েছেন। এখন তথাকথিত 'বিজ্ঞান দর্শন' এর নামে ভোগবাদ, মডারেট ইজলাম আর নাস্তিবাদের মোকাবেলা করতে হবে একসাথে। আলিম-নন আলিম একসাথে। এজন্য মাঠে অলরেডি নেমে গেছে-- 'সত্যকথন'। মাঠ তো সেই বইমেলা থেকেই ফাঁকা। আমি মোহগ্রস্তের মত পড়েছি পুরো বইটা। Asif Adnan, Niloy Arman , Shihab Ahmed Tuhin, Muhammad Mushfiqur Rahman Minar,Tanvir Ahmed , Mohammed Touaha Akbar, Jakaria Masud, Hossain Shakil এবং আরিফ আজাদ। নবরত্নের ঝলমলে দ্যুতির এক বাতিদান। আজ কেবল 'জুনিয়র' বলে এই ইতিহাসের অংশ হতে পারলাম না। এ কেমন বিচার।

লেখকদের সবাইও হয়তো আমার সাথে একমত হবে কেউ মন খারাপ করা ছাড়াই, Asif Adnan ভাইয়ের চিন্তার গভীরতা আলাদাভাবে নজরকাড়ার মত। সাগরের গভীরে ডুব দিয়ে মুক্তো তোলার মত। আমি বাকরুদ্ধ হয়ে শুধু পড়ে গেছি। আল্লাহ উনার লেখাগুলো, শুধু উনার না, পুরো 'সত্যকথনসমগ্র' বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়ে প্রত্যেক মুসলিমের বাসায় স্থান করে নেবার জন্য কবুল করুন। আমীন। কেউ সত্যকথন অর্ডার ও প্রাপ্তিস্থানের লিংক কমেন্টে দিয়ে দিবেন প্লিজ।

একদম তত্ত্বের গোড়া ধরে নাড়া দেবার জন্য আরেকটা মিসাইলের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। আমি পুরো পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখার সৌভাগ্য পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। এক কথায়-- ভয়ংকর। তবে গল্প পড়ে

আমাদের অভ্যাস যেন খারাপ না হয়ে যায়। একটু সময় নিয়ে প্রতিটা লাইন বুঝে পড়তে হবে। এক লাইন বুঝে আরেকটা। ভাল খাবার গপগপ করে খেলে হয় না। চিবিয়ে, জিহ্বার প্রতিটি টেস্টবাড দিয়ে ফীল করে করে খেতে হয়। শেষ করে আমার মনে হয়েছে, 'কাম সারছে' মাইর দেয়া একটা জিনিস, আর কাপড় খুলে মাইর দেয়া আরেকটা জিনিস। মিসাইলের নামটা বলবো? প্রেজেন্টিং বিফোর ইউ...............

রাফান আহমেদ এর "বিশ্বাসের যৌক্তিকতা"

২৯.

এবার ময়মনসিংহে কিতাবমেলা।

মেলায় বাড়ুক জেনারেল শিক্ষিতদের আনাগোনা। উলামা-তোলাবাগণ তো এসব কিতাব আরবি-উর্দুতেই পড়েন। আমাদের আসা ও বন্ধুদের নিয়ে আসা দরকার বেশি বেশি। এ আলো ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে।

বোনদের জন্য আলাদা ঘেরা ব্যবস্থা থাকুক। স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে কিতাব দেখেশুনে কিনতে পারার সুযোগ করে দেয়া চাই।

ইসলামী প্রকাশনাগুলো ধীরে ধীরে 'সরাসরি ইসলামী বই নয়, তবে ইসলামী মুল্যবোধের মুওয়াফেক জীবনঘনিষ্ঠ বা তথ্যমূলক' এজাতীয় বইও প্রকাশ করলে কেমন হয়? বা এ জাতীয় বই রাখলে। আল মাহমুদ, ফররুখ আহমদের কবিতা, নজরুল। এটা জাস্ট প্রস্তাবনা।

উল্টে যাক, ভেঙে যাক, বদলে যাক।

৩০.

এলপেনলিব চকলেটের দাম ১ টাকা থেকে ৩ টাকা করতে চান? তাহলে ঘোষণা দিন ৫ টাকা এখন থেকে। এরপর আন্দোলন হবে,কেন বাড়ানো হল? তখন ৩ টাকা বলে দিন।

নিউজ: এলপেনলিবের দাম ২ টাকা কমে এখন মাত্র ৩ টাকা। ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল 'পূর্ব' জেরুসালেম। ওয়াহ।

" হে ইবনে মাসউদ, তখন তুমি দেখবে কওমের নিকৃষ্ট লোকেরা, মুনাফিকরা তাদের সর্দার।"

৩১.

একটা সময় ছিল, এদেশে লভ্য সব খাবারই খেয়ে ফেলা যেত চোখ বুজে। 'মুসলিমপ্রধান' (?) দেশ বলে ধরে নেয়াই যেত মুরগিটা জবাইয়ের আগে জ্যান্তই ছিল; জবাইটা বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলেই হয়েছে। খাসির কাচ্চির খাসিটা 'ঘেউ' ডাকার প্রশ্নই উঠার প্রশ্ন ছিলনা।

ইনিয়ে বিনিয়ে যেটা বলতে চাচ্ছি তা হল, বিশ্বায়নের যুগে আমাদের ফুড ফ্যাক্টরিগুলোর অনেক উপাদানই বাইরে থেকে আসে। যেমন অনেক আগে যখন টিভি দেখতাম, ডিসকভারিতে জেলী-লজেন্স বানানো দেখেছিলাম। শুকরের চামড়া প্রসেস করে জেলীর মত জেলাটিন বানানো হল। আমরা যে জেলী খাই পাউরুটি দিয়ে, বাচ্চারা লিচি/জেল এসব নামে জেলী টাইপ চকলেট খায় এই জেলাটিন আসে কোত্থেকে। যদি ইউরোপ-ম্যারিকা-চীন থেকে আসে তাহলে

হালাল মনে করার কোন কারণই নেই। ওসব দেশে গরুটরুর চেয়ে শুয়োর মারা হয় বেশি। ফলে কমমূল্যে জেলাটিন বানাতে গেলে শুয়োরই অপশন।

ফ্যাক্টরির ফুড ইনগ্রেডিয়েন্ট এর উপর দালিলিক কাজ করছেন একজন এমবিবিএস ডাক্তার প্লাস মুফতি সাহেব। একই ব্যক্তি। ফুড ফ্যাক্টরিতে কর্মরত কোন ভাই আছেন লিস্টে যিনি এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন। নাজাতের উসীলা হবে ইনশাআল্লাহ।

৩২.

অনুশীলন:

মোড়ে মোড়ে ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যকলার চুনখসা অট্টালিকা। এঁকেবেকে 'হাওয়া মে উড়তা যায়ে' বিজলীর রিকশা। কখনো পূতিগন্ধা নর্দমা। শোসাতে শোসাতে দুপ্লেট সাবাড়, চুঁইঝাল খাসি। ভেটকি মাছের পেটি আর চিংড়ির মালাইকারি।

জামাই হতে চেয়েছিলেম এ এলাকার, ইন জেনারেল এতদাঞ্চলের কুমারীরা নাকি সুখদর্শিনী। এক শুভাকাঙ্ক্ষী সাবধান করেছিলেন ভাগ্যিস। হুঁশিয়ার, গণহারে সুন্দরী বেশি হলেও, খুবই ঝাল। শেষে নাকের পানি, চোখের পানি এক হবে কিন্তু। ভয়ে কেটে পড়েছিলুম।

বিদায় প্রিয় খুলনা। হয়তো এই শেষ, হয়তো এই শুরু। মায়া ধরিয়ে দিয়েছো। দুআ করি, মাদীনার মতো সারা পৃথিবীর জন্য হিদায়াতের নমুনা বনো। আমীন।

৩৩.

এখন যদি বলি, 'সোফিয়া'বুরে কেহ বানায় নাই।যে দাবি করতেছে বানাইছে সে বানায়নাই। তারে আমাজন জঙ্গলে পাহাড়ের গুহায় পাওয়া গেছে খুঁড়ে। লক্ষ বছর বিবর্থন হয়ে চাপ-তাপ-লাফ-ঠাডা-ভূকম্পন সহ্য করে আজ আমাদের "হোমো সোফিয়েন্স" সোফিয়াবু।

হাসিয়েন না। আসল সত্যটা শুনার জন্য প্রস্তুত হন। সোফিয়া বানাতে অভশ্যই ইন্জিনিয়ার নাগে। কিন্তু সোফিয়াবুর চেয়ে লক্ষকোটিগুণ জটিল 'মানুষ' বানাতে কাউকে লাগেনি। এটাই সত্য। যত যুক্তিই বানান, এটাই সত্য।

৩৪.

সেল্ফ _ মোটিভেশন ৩:

রেভারেন্ড পল মুনশির গ্রেভের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কানে আজান-ইকামত ছিল। শেষটা হয়েছে পাদ্রীর হাতে। বাইরে প্রতিদিন নতুন সুযোগ নতুন আশা নিয়ে ওঠে কুসুম কুসুম সূর্যটা। গ্রেভের ভিতরটা রয়ে যায় ঘুটঘুটে আঁধার, আশাহীন, সুযোগশূন্য।

ওনার গ্রামে গিয়েছিলাম ৪ বছর আগে। রেভারেণ্ড আবদুল ওয়াদুদ মেমোরিয়াল হাসপাতাল। প্রাঙ্গনে শুয়ে আবদুল ওয়াদুদ, ইবনে পল মুনশি। কিন্তু নামের আগে রেভারেন্ড কেন? ওওও, আচ্ছা।

কিসের অহংকার আমার? ঈমানের? আমলের? ইলমের? কালেমাসহই যেতে পারব, আমাকে গ্যারান্টি কে দিল? মাফহুম শুনেছি, একজন আরেকজনকে কাফির বলল, তো দুজনের একজন নিশ্চিত কাফির। যাকে বললাম সে আসলেই কাফির হল

তো আমি বেঁচে গেলাম। কিন্তু যদি ও না হয়ে থাকে, তাহলে আরেকজনটা রইলাম আমি। আর ভাবতে পারিনা।

আরেকজনকে মুনাফিক ভাবছি? কঠোর খলিফা উমার বিন খাত্তাব রা. এর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ মনে পড়েনা আমার? "প্রাণের হুযাইফা, কমসে কম এটুকু তো বলে দাও, মুনাফিকের লিস্টে কি আমি আছি?" হবার কথা ছিল নিজ ঈমানের ব্যাপারে সন্দিহান, ভীত। অন্যের ঈমান মাপতে আজ গড়ায় বেলা।

ইবলিস- বালাম বাউর- বারসীসা- মুরতাদ কাতেবে ওহী- আম্মাজান উম্মে হাবীবা রা. এর আগের স্বামী। অভাগা, হতভাগ্য। নাউযুবিল্লাহ।

ভাগ্যবান কাতেবে ওহী ইবনে আবী সারহ রা.। মুরতাদ হয়ে আবার ফিরে এসেছেন। ভাগ্যবান শায়খ উন্দুলুসী রহঃ, খ্রিস্টান হয়ে নারীর প্রেমে মজে ১০ বছর শুকর চরানোর পর ফিরে এসেছেন। স্রেফ খ্রিস্টানদের তাচ্ছিল্য করার জন্য। আর মুমিন মুসলমানকে তাচ্ছিল্য করতে আমি সচেতন হবো না? এতো নির্ভীক, এতো দুঃসাহসী আমি নিজ ঈমানের ব্যাপারে।আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

রব্বানা লাা তুঝিগ্ ক্বুলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাহ, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব।

৩৫.

আপনাদের ঐ গল্পটা মনে আছে না?

ঐ যে এক রাজার কাছে ৩ ফ্রড দর্জি আসে। প্রচুর টাকা নিয়ে, আড়ম্বর দেখিয়ে, হাঁকডাক করে একটা 'নি-পোশাক' বানিয়ে দেয়। এত মিহি যে দেখা যায়না। আসলে কিছুই বানায়নি। রাজা ঐ পোশাক পরে শোভাযাত্রায় বেরোয়।

মণ্ত্রী টু আম পাব্লিক সবাই রাজার নি-পোশাকের প্রশংসায় অভিভূত। হঠাৎ এক নাদান বেরসিক বেসমঝদার বাচ্চা বলে উঠল-- দেখ, দেখ, রাজা ন্যাংটা। তখন সবার সম্বিৎ ফিরল, তাই তো, রাজা তো নেংটা।

বিবর্তনবাদ, হকিংবাদ, নারীবাদ, সমাজতন্ত্র, দর্শনের নামে ভাবনাবিলাস এসব নানান নি-পোশাক পরে হাঁটছে সভ্যতা।সবাই পঞ্চমুখ-- আহা, বেশ বেশ। আমার মত নাদান বাচ্চালোগ, হাত তোলো।

নি-পোশাক বুঝতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হবার দরকার সবার নেই। ইঞ্জিনিয়াররা তাত্ত্বিক গবেষণা করবেন, আমরা খোরাক নিবানে।আর আমরা বেসিক থেকে ভাববো। সবাই ভাবনার লাগাম ছেড়ে দিন। অর্থনীতির বেসিক, বায়োলজির বেসিক, কেমিস্ট্রির বেসিক, নৃতত্ত্বের বেসিক, পদার্থবিদ্যার বেসিক দিয়ে ভাবুন।ধরে ফেলা যাবে ইনশাআল্লাহ।কারণ নি-পোশাকে কারুকার্য দাবি করা হচ্ছে, অথচ সুতাই নেই। সামনে রাজার পা-চাটা মোসাহেবদের (এসব হাবিজাবি মতবাদে ঈমান এনেছে যারা)কঠিন দিন আইতাছে গো।

৩৬.

সেল্ফ _ মোটিভেশন ১

ক.

এখানে আমাদের সাথে উপর তলায় ডাচ প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টানদের একটা দল আছে।ওরা প্রতিসন্ধ্যায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে প্রার্থনাসঙ্গীত গায় সিঁড়ির উপর। এশার নামায পরে ঢুকার মুখে রোজ হাইহ্যালো হচ্ছে। প্রত্যেকের হাতে পার্সোনাল ডাচ বাইবেল।কিন্তু আমার সাথে সফরে আমার ব্যক্তিগত কুরআন নেই কেন? হোয়াই?

খ.

যদিও শব্দটা এখন পারিভাষিক বলে ব্যবহার করা ঠিক না। তবে আক্ষরিক অর্থে নিলে প্রত্যেক মুসলিমই একজন 'মিশনারী'। পৃথিবীতে আল্লাহ নবীর ধারা শেষ করে দিয়েছেন, শরীয়ত চূড়ান্ত করে দিয়েছেন এবং শেষ নবীর উম্মতকে মিশনারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমাদের সবার ফ্যামিলি লাইফ, জব লাইফের সাথে একটা মিশনারী লাইফ থাকার কথা (উইদআউট সন্ন্যাস)। সেটা কই? আজ কতজনকে ফরজের দাওয়াত দিয়েছি? (ফরজের দাওয়াত ফরজ, মাআরিফুল কুরআন)

গ.

প্রত্যেক হিন্দুর বাসায় আমি গেছি, প্রেয়ার রুম না হলেও প্রেয়ার কর্ণার পেয়েছি যেখানে মূর্তি না থাকলেও ছবি আছে। আমাদের কতজনের বাসায় নামাযের ঘর/ নির্দিষ্ট নামাযের জায়গা আছে? (নবীজীর সরাসরি আদেশ আছে ঘরে মসজিদ প্রতিষ্ঠার)

ঘ.

চে-কে যারা বেশি ভালোবাসে তারা চে'র টুপি পরে জানান দেয়, মেসি- রোনালদোর ফ্যানরা জার্সি পরে জানান দেয়, নায়কদের ভক্তরা চুলের কাট থেকে জুতো পর্যন্ত নকল করে। শুধু আমরা অধম 'আশেক', নবীর প্রেম ক্বলবের অতলতলে লুকিয়ে বেড়াই। নবীর পোশাকটা, টুপিটা কীভাবে ছাড়া যায়, নবীর দাড়ির স্টাইলটা কীভাবে বাইপাস করে নতুন স্টাইল নেয়া যায়, সেই ফতোয়া খুঁজে ফিরি। আমাদের মধ্যেই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে লিখলে ৫টা সিরিজ লেখা যাবে।আয়নার দিকে তাকাই না একটু? (কষ্টিপাথর থেকে)

কষ্টের কথাগুলো বিফলে যেতে না দিই। আজকেই এখনই নিয়ত করেছেন তো?

ক. সবসময় নিজের কুরআন সাথে রাখবো ইজ্জতের সাথে

খ. প্রতিদিন কয়েকজনকে ফরজ হুকুমের দাওয়াত দিব লাভ বলে বলে।

গ. বাসায় একটা কর্ণারে ২টো জায়নামায রেখে মসজিদের মত আদব করব।
ফেলে রাখা জায়নামাযে শয়তান নামায পড়ে না।

ঘ. প্যাকেট সত্যি ইম্পর্টেন্ট। দাড়ি-টুপি-লম্বা জামা আপনাকে অনেএএএক গুনাহ থেকে বাঁচাবে। কীসে আমাকে আটকাচ্ছে এখনো? মতভিন্নতা থাকলে ইগনোর করুন।

৩৭.

খ্রিস্টানদের একটা রেস্টহাউসে আছি। আখলাকের সুন্নাহগুলো ওরা কঠোরভাবে মানছে। হাসি দিয়ে কথা বলা, মর্যাদা দিয়ে কথা বলা, কৃতজ্ঞতা, খিদমত। খ্রিস্টানদের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে, হাসপাতাল বা কলেজ সবখানে যে কেউ ঢুকবে, সে পজিটিভ ধারণা নিয়ে বের হবে। আমার ধারণা ওদের মাইক্রোফিনান্স টাইপ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও শোষণমূলক নয়, ছাড়মূলক। ফলাফলও দেখে নিলাম স্বচক্ষে। "রেভারেন্ড আবদুল ওয়াদুদ মেমোরিয়াল হাসপাতাল"। না জানি তৈরি হয়েছে আরো কত আরবি নামের রেভারেন্ড।

নামধারী মুসলিমদের কথা বাদই দিলাম। ঢাকায় প্র্যাক্টিসিংমুসলিমদের একটা হাসপাতালে আমি নিজে চাকরি করেছি একসময়। এরকম "ইসলাম প্র্যাক্টিসিং প্রতিষ্ঠান" আরও হওয়া দরকার। এভরিথিং ইজ ফাইন। কিন্তু ২ বছর পর নিজে রুগী হিসেবে সেবা নিতে গিয়ে সব স্টাফের মুখে হাসি নামক বস্তুর অভাব পেলাম। রিসিপশন থেকে বয়, চেহারা দেখে কোন প্রশ্ন করতেই ভয় লাগে। সার্ভিস অবশ্যই ভাল,

জাস্ট একটা সুন্নাহর অভাব--হাসি। নিজেই বেরোতে পারলামনা ভাল ধারণা নিয়ে, হাতে রইল এক তেতো মন।

লেনদেন, সামাজিকতা, ব্যবহার-- দ্বীনের এই তিন শাখায় আমরা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছি বহু আগে। আমাদের যা করার কথা ছিল তা ওরা করছে।
আরিফ আজাদ ভাই দুদিন আগে এ টাইপ একটা পোস্ট দিয়েছিলেন। গুরুর কদমে কদম দিলাম আর কি।

তবে এই সুন্নাহটা জিন্দা করার প্রতিজ্ঞা করা কি খুব কঠিন? শুরু হোক আজ থেকেই। সবখানে। মানুষ একটুকু হাসির কাঙাল।অল্প একটু।
প্রয়োজন অপ্রয়োজনে হাসি দিন। সিরিয়াসলি, আপনার দুনিয়া-আখিরাত সব বদলে যাবে।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

সমাপ্ত

আলহামদুলিল্লাহ।

আঁতুড়ঘরঃ ভিতরে ও বাইরে
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·THURSDAY, JULY 19, 2018

সাধারণত আমার ‘ছাইপাশ’ যারা পড়ে সময় নষ্ট করে থাকেন, তাদের অনেকেই আমাকে দোষারোপ করেন। আমি খালি তাবলীগের কথা টেনে আনি সব বিষয়ে। আমার আজকের যতটুকু না ইলম, তার চেয়ে বেশি ভাবনা আর সমন্বয়। এগুলোর বুনিয়াদ ‘দাওয়াত ও তাবলীগ’ এর প্রচলিত মেহনত-ই। এটা আমাকেও

স্বীকার করেই লিখতে হবে, আর আমার বন্ধুদেরও এটা স্বীকার করেই পড়তে হবে। তাবলীগে মহিলাদের জামাআতে পুরুষরা মাইকে আলাদা ঘর থেকে নানান টপিকে আলোচনা করে। সকালে যা পুরুষরা আলোচনা করে দিয়ে যায়, সন্ধ্যায় সেটাই মহিলারা নিজেদের মাঝে আলোচনা করে আরেকটু ডিটেইলস, সবকিছু পুরুষদের উচ্চারণ করাও নিষেধ। একটা টপিক থাকে ‘সন্তানের তরবিয়ত (তারবিয়াহ) বা দীক্ষা’। সেখানে পুরুষরা কিছু কথা বলে, যা মহিলারা নিজেদের মধ্যে বিস্তারিত করে নেয়। আজ এই টপিকে ‘গর্ভাবস্থায় কী কী করণীয়’ আলোচিত হয় তা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি। সাথে একটু কবিরাজিবিদ্যা যুক্ত করে দিয়েসি। আল্লাহ তাওফীকদাতা।

সন্তানের তারবিয়াহ জন্মের পরে না, বরং শুরু হয় জন্মের আগ থেকেই। গর্ভধারণেরও আগে থেকে। সন্তান কেমন হবে তা আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীর, গায়েবের চাবি। তবে আমরা চেষ্টার জন্য জবাবদিহি করব, তাকদীরের জন্য না। তাই আমাদের চেষ্টা ও দুআর দ্বারা নেক সন্তান আসার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তাই—

১. প্রথমে নিয়ত করুনঃ

আমি নেক সন্তান চাই। এই সন্তান আমার চোখের প্রশান্তি শুধু না, এই সন্তান আমার আমল। আমার নেক আমলে জারিয়া। আমি দুনিয়ায় থাকব না, আমল করতে পারব না। কিন্তু আমার সন্তানের আমল আমার আমলনামায় যাবে। তাই বদকার সন্তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। আল্লাহওয়ালা, পরহেজগার, দীনের মুজাহিদ সন্তান চাইতে হবে। আয় আল্লাহ, আমি দীনের খিদমতের জন্য আপনার কাছে একটা সন্তান চাই, নিজের জন্য না। সন্তানকে জন্মের আগেই দীনের জন্য ওয়াকফ করে দিন। সন্তানকে আল্লাহর জিম্মায় দিয়ে দেন। আল্লাহ, নিজের জন্য চাইনি, আপনার দীনের জন্য চেয়েছি। অতএব

আপনি সুস্থ-সবল-নিখুঁত-মেধাবী সন্তান দেন যে দীনের সাহায্যকারী হবে। আর জীবনভর তাকে সুস্থ-সবল রাখেন যেন সে দীনের খিদমত করতে পারে।

এক নিয়তেই কতকিছু ফয়সালা করিয়ে নিলেন, দেখেন। মুমিন হবে আখিরাতের ব্যাপারে চালাক। হি হি। এক দুআয় অনেক পাখি মেরে ফেলতে হবে। ইমরানের স্ত্রী দুআ করছেনঃ আল্লাহ আমার গর্ভে যা আছে তা আপনার জন্য দিয়ে দিলাম। গর্ভে থাকা অবস্থায়ই নিয়ত করে ফেলেছেন।

অনেকে নিয়ত করার আগেই আল্লাহ দিয়ে দেন। এটা আল্লাহ দিয়েছেন আপনাকে, কত মানুষ চেয়ে চেয়ে পায় না। কোল সারাজীবন খালি থাকে। আর আপনাকে আল্লাহ না চাইতেই দিচ্ছেন। অসন্তুষ্ট হবেন না, নিয়ামতের না-শোকরি, না-কদরি করবেন না। সে তার রিযিক নিয়েই দুনিয়াতে আসছে, ও নিয়ে আপনার টেনশান করতে হবে না। আর্লি বিয়ের আন্দোলনে দেখা যায় ছাত্র থাকা অবস্থায়ই অনেকের কবুলিয়ত হয়ে যায়। ভুলেও এবোরশানের চিন্তা করবেন না। নিয়ামতের কদর না করলে নিয়ামত উঠিয়ে নিতে পারেন রাব্বি। আর নিয়ামতের অনুপস্থিতিকেই তো আযাব বলে, রাইট?

২. জীবনযাত্রা পরিবর্তন করুনঃ

শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর কোয়ালিটি বাড়াতে আপনাদের দুজনের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে।

- ধূমপান ও অন্যান্য গুনাহ ত্যাগ করুন

- রাত জাগার অভ্যাস ত্যাগ করুন দুজনাই

- প্রচুর পানি ও ফলমূল খান দুজনাই

- পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমান, গর্ভাবস্থায় দিনেও ২ ঘন্টা ঘুমান।

- টেনশন দূর করেন, এত টেনশন কীসির জন্যি। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। আপনার টেনশনের কারণটা তো আরো ক্ষণস্থায়ী।

৩. আদব-সুন্নাত বজায় রেখে ‘একসাথে’ থাকুনঃ

ওপেন নোটে সব কথা লেখা যাচ্ছে না। ‘দাম্পত্যঃ পার্ট ২’- তে বিস্তারিত লেখা আছে। ‘একসাথে’ থাকার দুআ থেকে নিয়ে আদবগুলো খেয়াল রাখুন।

৪. গুনাহ থেকে বাঁচুনঃ

আমাদের সব কর্মকাণ্ডের প্রভাব আছে আমাদের শরীরে। মানসিক চিন্তাপ্রবাহের সামষ্টিক (Cumulative) বা তাৎক্ষণিক (Immediate) ইফেক্ট পড়ে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর, হরমোনের উপর, রক্তচাপের উপর। বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে যদি খেয়াল করেন হঠাৎ উত্তেজনায় রক্তচাপ বাড়ে। অধিক টেনশনে পাকস্থলীর এসিড তৈরি বাড়ে। আর ভয়ে- তাড়াহুড়োয় ‘এড্রেনালিন রাশ’ এর কথা তো সবাই জানেন, এই এড্রেনালিন আবার কোন কোন অঙ্গে কী কী করে, সেগুলো বলতে গেলেই কাম সেরেচে। এজন্য—

· টিভি দেখা বাদ দিন। টিভি থেকে নির্গত রশ্মি, বার বার দৃশ্য/ফ্রেম পরিবর্তন, রশ্মির তীব্রতার দ্রুত পরিবর্তন এগুলোর স্পষ্ট প্রভাব আছে মস্তিষ্ক-চোখ-রক্তচাপের উপর। এবং ইভেনচুয়ালি পেটের সন্তানের উপর। একই কথা মোবাইল ব্রাউজিং-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

· দুর্ব্যবহার, রাগ, উত্তেজনা পরিহার করুন। গর্ভে ৫ মাসে সন্তান শ্রবণ ক্ষমতা পায়। তখন গান-মিউজিক-রাগারাগি-কটূবাক্য-গালিগালাজ সেও শুনতে পায়, এগুলোর প্রভাব পড়ে।

· নজর সত্য। বিস্তারিত ‘কষ্টিপাথর’ বইয়ে আছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখন স্বীকারের পথে। কোষের ভিতরে যে ‘৪র্থ দশার পানি’ আছে, তার ধর্ম পরিবর্তন হয় দৃষ্টি, আবেগ, শ্রবণ, চিন্তার দ্বারা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বার বার ঘুরে ফিরে পেট দেখার কি দরকার? গর্ভাবস্থা দৃশ্যমান (পেট বড় হলে) হলে জনসমক্ষে কম যাওয়া চাই। নজর থেকে বাঁচার যে আমলগুলো আছে সেগুলো করুন।

- সকাল সন্ধ্যা মনজিলের আয়াতগুলো

- প্রতি নামাযের শেষে তিন কুল, ফজর ও মাগরিবের শেষে ৩ বার তিন কুল।

- প্রশংসা করলে বা শুনলে মাশা-আল্লাহ বলা, বারাকাল্লাহ বলা।

- নজরের গোসল আছে। শিখে নিন।

· পেটে বাচ্চা আসলে ঘরে কিউট কিউট ইংরেজ বেবীদের ছবি টাঙ্গায়ে রাখা, পুতুলটুতুল কিনে শুয়ে থাকা। এগুলা কি? ইংরেজদের মত বেহায়া আর পুতুলের মত নিষ্ক্রিয় নিস্তেজ সন্তান চাচ্ছেন নাকি? রহমতের ফেরেশতাই তো চান না ঘরে,মানে রহমতেরই দরকার নেই। রহমতের বিপরীত শব্দ আজাব। সন্তানও পরে আজাবই টেনে আনবে, দুনিয়াতেও। আল্লাহ যেন সন্তানের কারণে বেইজ্জত হওয়া থেকে আমাদের হেফাজত করেন।

৫. নেক আমল করুনঃ

ভালো কাজেরও প্রভাব আছে নিজ শরীরে এবং বাচ্চার উপর। নামাযের পর, দুআয় কান্নাকাটির পর যে ফ্রেশ ভাব, এটাও দৈহিক নিউরোহরমোনগত বিষয়। তাই—

· বেশি বেশি নফল পড়ুন। অনেক বাচ্চা উলটা থাকে। বেশি বেশি সিজদা করার দ্বারা পজিশন ঠিক হয়। রেফারেন্স- শাশুড়ি আম্মা।

● কুরআন তিলওয়াত করুনঃ

শরীরের উপর কুরআনের কী প্রভাব জানতে ‘কষ্টিপাথর’ দেখুন। কুরআন মনে মনে না পড়ে একটু আওয়াজে বাবুকে শুনিয়ে পড়ার চেষ্টা করুন। আগেকার মাশায়েখগণ মায়ের পেট থেকেই দু’-দশ পারা হিফজ করে বের হতেন শোনা যায়। আমাদের অত না হলেও চলবে, নেককার হলেই হবে আপাতত। মায়ের আমল যেমন হবে, সন্তান তেমন হবারই আশা করা যায়।

- ছেলের ক্ষেত্রে সূরা ইউসুফ, আর মেয়ের ক্ষেত্রে সূরা মারইয়াম, সুন্দর আখলাকে র জন্য সুরা মুহাম্মদ পড়ার প্রচলন আছে। দলিল নাই, তবে ইফেক্ট তো অবশ্যই আছে। বাকি আল্লাহ জানেন।

- রোজানা ওজীফার সূরাগুলো (ইয়াসীন, মুলক, সাজদাহ, রাহমান) আদায়ের অভ্যাস করুন। বলা হয়, সূরা মুদ্দাসসির পড়লে প্রসবযন্ত্রণা কমে। আর প্রসব চলাকালীন সূরা ইয়াসীন (হাদিসে এসেছে মৃত্যুযন্ত্রণার কথা, যন্ত্রণাই তো)।

- সকাল সন্ধ্যা মনজিলের আয়াতগুলোর আমল চলুক।

● দুআঃ

- সূরা ফুরকানের ৭৪ নং আয়াত

- সূরা আহকাফের ১৫ নং আয়াত

- সূরা ইবরাহীমের ৪০ নং আয়াত

- সদকা করে করে দুয়া করা চাই।

● ভালো চিন্তা করুনঃ

আমার স্পষ্ট মনে আছে। ছোটখালার বড় মেয়েটা যখন আড়াই বছর বয়সে মারা যায়, তখন খালার গর্ভে আরেকটা মেয়ে। তো খালামণি পুরো চিন্তাচেতনা জুড়ে সদ্যমৃতা বাচ্চাটার স্মৃতি। পরের মেয়েটা যখন হল, হুবহু আগের মেয়েটার চেহারা, আপেলের কাটা আধখানা। মায়ের চিন্তাপ্রবাহের প্রভাব অবশ্যই গর্ভের শিশুর উপর পরে। এজন্য—

- ভালো চিন্তা করুন। জি বাংলা/স্টার জলসা জাতীয় চিন্তাভাবনা একদম নিষেধ।

- ভালো অডিও লেকচার শুনুন।

- কুরআন তিলওয়াত শুনুন।

- হায়াতুস সাহাবাহ পড়ুন ও সাহাবাদের জীবন নিয়ে ভাবুন।

- দীনী কিতাবপত্র পড়ুন।

- আল্লাহর সৃষ্টি ও সিফাত নিয়ে ভাবুন ও দাওয়াত দিন। এগুলো বলুন, আশপাশের লোকেদের সাথে এগুলো আলোচনা করুন। আপনার বাবু কিন্তু শুনছে আপনি যা বলছেন। মাইন্ড ইট।

- গীবত গাইলে তাও শুনছে। তেমনই গড়ে উঠছে।

● সুন্নাহ মেনে চলুনঃ

প্রয়োজনীয় কাজে সুন্নাহ খেয়াল করুন।

- ঘুম-খাওয়া-ইস্তিঞ্জা-গোসল সব কাজে সুন্নাতের গুরুত্ব দিন।

- সব কাজের সাথে সুন্নাত দুআ পড়ুন। একদম সহজ ছোট ছোট দুআ।

- ওজুর সাথে থাকার অভ্যাস করুন। অজুর সাথে থাকার মজা হল, চট করে যখন তখন দু’রাকাত নামায পড়ে ফেলা যায়, দু’পাতা কুরআন পড়ে ফেলা যায়। তবে কষ্ট করে জোর করে ওজু ধরে রাখবেন না। হাদিসেও নিষেধ আছে, জোর করে ওযু ধরে রাখার চেষ্টা করার, শরীরের জন্যও খারাপ।

৬. খাবারদাবারঃ

· খাবার বলতে আমরা যা যা বুঝি সব খাবেন। কোন নিষেধ নাই। যে খাবারে আপনার নিজের এলার্জি, সেটা কম খাবেন। মনে রাখবেন, যে খাবারের সাথে আপনি বাচ্চাকে অপরিচিত রাখবেন, সেটার প্রতি বাচ্চার এলার্জি থাকার সম্ভাবনা আছে। বাচ্চাকে সব ধরনের খাবারের সাথে পরিচয় করাতে হবে। জন্মের আগেও, পরেও।

· প্রতি বেলায় দেড়জনের খাবার খেতে হবে। জোর করে একটু বেশি খাবেন।
এই একটু বেশিটুকু ছোটমিঞার জন্য। এটা দুধপানের সময়েও চলবে।

· ৮-১০ গেলাস পানি, একগ্লাস দুধ, ১/২ টা ডিম যেন পেত্তেকদিন থাকে। যদি খেতে না পারেন তবে ভাত কম খান। ভাত কম খেয়ে থালা ভরে শাকসবজি, ডিম, দুধ, মাছ, গোশত, চুমুক দিয়ে গ্লাসে ভরে ডাল খান।

· এসময় মেয়েদের ভয়ংকর সব জিনিস খেতে ইচ্ছে করে। ছাই-মাটি খাওয়ার ঘটনাও শোনা যায়। যা মনে চায় বড়মিঞাকে দিয়ে আনিয়ে খাবেন। তবে আচার-চটপটি-ফুচকা এগুলা বাসায় বানিয়ে খেলে ভালো হয়। বাইরেরটা খেলে পেট খারাপ করবে। তবে মাটি খাওয়ার দরকার নেই। অখাদ্য কুখাদ্য খাবার ইচ্ছাকে দমন করুন।

· প্রথম এক-দুই মাস খুব বমি বমি লাগে, খাওয়ার রুচি থাকে না। ডাক্তারের পরামর্শ মত ওষুধ খাবেন। দোকান থেকে পরামর্শ নিয়ে খাবেন না। এসময় ভাত কম খেয়ে আমিষ জাতীয় খাবার বেশি খাবেন। প্রথম তিনমাসেই বাচ্চার যা গঠন হবার, হয়ে যায়। এরপর শুধু সাইজে বাড়ে। তাই এসময়ে যেন প্রোটিন সাপ্লাই কম না পড়ে।

· বাসায় মিষ্টি জাতীয় খাবার বানিয়ে রাখবেন। বাচ্চা যখন আকারে বড় হবে তখন আপনার রক্ত থেকে গ্লুকোজ টেনে নিবে। ফলে আপনার গ্লুকোজ শর্ট পড়বে। তাই মাথা হালকা হয়ে যাওয়া, ঘুরানো, ব্যথা করা এমন হতে পারে। বুঝবেন গ্লুকোজে টান পড়েছে। সাথে সাথে ফ্রিজ থেকে বের করে খেয়ে নিবেন মিষ্টি/সেমাই/পায়েস/বিস্কুট/শরবত। হয়ে গেলো।

· ৪র্থ মাস থেকে ১টা আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট, আর ১টা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খাওয়া শুরু করতে হবে। দুধ খেতে না পারলে দিনে ২টা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট। ভরাপেটে এবং আয়রন একবেলায়, ক্যালসিয়াম আরেকবেলায়। দুটো কখনোই একবেলায় খাবেন না।

· আর গর্ভাবস্থায় সব ওষুধ খাওয়াও যায় না। তাই সামান্য সামান্য অসুখে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান ছাড়াই দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে খেয়ে

নিলাম, এটা করা যাবে না। অনেক ওষুধ আছে, জন্মগত ত্রুটি হতে পারে, এটাও তাকদীর। তবে আমরা সতর্ক থাকব। তাই সামান্য জ্বর-ঠান্ডা- সামান্য কাশি এসব যতটুকু পারা যায় সহ্য করতে আমি উৎসাহ দিই। একেবারেই না পারলে তখন ওষুধ খাবেন, এবং অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শে।

৭. অন্যান্য সতর্কতাঃ

· নর্মালি ৪ মাস, ৭ মাস, ৮ মাস ও ৯ মাস— এই ৪ বার ডাক্তারের কাছে যাবার কথা। কোন সমস্যা মনে না হলে ৪ মাস আর ৯ মাসে গেলেও সই। সমস্যার মধ্যে রক্ত কম আছে কি না, প্রেসার বেশি আছে কি না। গর্ভকালীন একটা টেম্পোরারি ডায়বেটিস হয়, সেটা আছে কি না। এসব সমস্যা থাকলে ৪ বারই যেতে হবে।

· ভারী কাজ করবেন না/ করতে দিবেন না। পেটের উপর চাপ দিয়ে করতে হয় এমন কাজ করবেন না। টিউবওয়েল চাপা, ভারী কিছু উঠানো বালতি টালতি, ভারী কাপড় ধোয়া। আমি ভুক্তভোগী, এত সতর্ক থাকার পরও কী জানি উঠিয়েছে, আর অমনি বাচ্চার পানি সব বেরিয়ে গেছে... সিজার।

· টিটেনাস টিকার ডোজ ৫ টা। ১৫ বছর বয়েস, তার ২৮ দিন পর, তার ৬ মাস পর, তার ১ বছর পর, তার আরেক বছর পর। আগেই নেয়া থাকলে গর্ভাবস্থায় আর নেয়ার দরকার নেই।

· ডেলিভারির সময় এগিয়ে এলে ৫টা বিপদ চিহ্ন আছে। সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে দৌড়—

- রক্তস্রাব ডেলিভারির রাস্তা দিয়ে

- মাথাব্যথা ও ঝাপসা দেখা

- ভীষণ জ্বর ও দুর্গন্ধ স্রাব

- খিঁচুনি

- প্রসব ব্যথা বেশি সময় ধরে থাকা।

· বাথরুম। পিছলা বাথরুমে আছাড় খাওয়ার পোচুর সম্ভাবনা। উড়ে উড়ে বাথরুমে ঢুকবেন না। পা টিপে টিপে ঢুকবেন। আর স্বামী বাবুরা বাথরুমের স্যান্ডেল চেঞ্জ করে নতুন স্যান্ডেল দেন। তলা খুব খসখসে দেখে স্যান্ডেল কিনে দেন বাথরুমের জন্য। আম-ছালা দুটোই আমাদের লাগবে, কোনোটাই হারানো যাবেনা।

· গর্ভাবস্থায় ‘একসাথে’ থাকা যাবে, তবে নিয়ম দেখে নিন ‘দাম্পত্য ২’- তে।

· এসময় মেয়েদের ইমোশন বদলে যায়, হরমোনের কারণে। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, কারণ ছাড়াই স্বামীকে সহ্য হয় না, এধরনের নানান আজিব আজিব ফিলিংস হতে পারে। এটা আপনাকে বুঝতে হবে, স্বামী সাহেব। এগুলো সে ইচ্ছে করে করছে না। হরমোনগত পরিবর্তনের ফলে এটা হচ্ছে, আবার ঠিক হয়ে যাবে। আপনি রেগে গিয়ে চোটপাট করেন না। বিশেষ করে প্রথমবার গর্ভধারণে এটা বেশি দেখা যায়। শাশুড়ি-ননদদেরও বুঝাবেন স্বামীসাহেব। এই মেজাজ চড়া এটা ঠিক হয়ে যাবে, কেউ যেন রিএক্ট না করে তার আচরণে।

· এটা মেয়েদের জন্য একটা নতুন অভিজ্ঞতা। আপনি নিজেই চিন্তা করেন, আপনার পেটের ভিতর আরেকটা জীব নড়েচড়ে, বড় হচ্ছে। কেমন লাগবে? তারপর শরীরে এতো পরিবর্তন নড়াচড়ায় কষ্ট, শুলে দম নিতে কষ্ট, পেট এতো বড়, খেতে ভালো লাগে না, বমি আসে, মেজাজ ভালো না, ঘুম হয় না। কত সমস্যা।

যে মেয়েটা দু’দিন আগেও বান্ধবীদের সাথে উড়ে বেড়াতো, বিয়ের পর আপনার সাথেও উড়ে বেড়িয়েছে, আজ সে নড়তেই পারে না। এমন সময়ে তার আপনাকে দরকার। আপনি একটু মাথায় হাত বুলিয়ে বুকে টেনে নিলেই তার কলিজাটা এত বড় হয়ে যায়, সাহস বেড়ে যায়, টেনশান দূর হয়ে যায়। তার জন্য এটা ওটা এনে দিলে কত খুশি হয়। তাকে হাসিখুশি রাখুন। আগের চেয়ে একঘণ্টা বেশি সময় দিন। বাচ্চার জন্য ছোট ছোট কাপড়-মশারি হাবিজাবি কিনুন। সে যেন এই বিপদে নিজেকে একা না ভাবে।

· যদিও আমাদের দেশে মেয়েরা এসময় নাইওর যায়। আমার সেটা হয়নি। আমার স্ত্রীকে আমার বাসাতেই থাকতে হয়েছে। আমার আম্মাকে আল্লাহ তাঁর নিকটে আসিয়া রা. এর পাশে একটা ঘর দান করুন। নাইওর পাঠালেও আপনার অভাব তার কাছে সারা দুনিয়াও পূরণ করতে পারবে না। আপনি নিজে যেয়ে যেয়ে সময় দেন যতটুকু সম্ভব।

৮. প্রসবকালঃ

· প্রসবযন্ত্রণা বুঝানোর জন্য বলা হয়, কারো শরীরের সবগুলো হাড় একসাথে ভেঙে গেলে যেমন ব্যথা হয় এটা তেমন ব্যথা। আমাদের এক স্যার বলতেন ছেলেদের বুঝাতে, পুরুষের অণ্ডখলি যদি টেনে মাথার উপর নেয়া হয়, তাহলে যে কষ্ট, তা প্রসবব্যথার সাথে তুলনীয় কিছুটা। এতো অশ্লীল কথা বলতাম না, বুঝানোর জন্য বললাম। নিজ স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ হোন। আপনার সামনে দু’দিন পর যে খরগোশের বাচ্চাটা খেলে বেড়াবে, আপনার চক্ষু শীতল করবে, সে আপনার স্ত্রীর অমানুষিক কুরবানির ভিতর দিয়ে এসেছে। আপনার এই আনন্দের পিছনে তার অবর্ণনীয় যন্ত্রণা আছে। এই কষ্টের কারণে আল্লাহ তার মাকাম কোন পর্যায়ে নিয়েছেন, আমাদের ধারণার বাইরে।

· বোনেরা, গর্ভধারণ একটা আমল। ভিতরের মানুষটাও একটা আমল। গর্ভধারণ ও প্রসবে যত কষ্ট সব আপনি মিযানের পাল্লায় পাবেন ইনশাআল্লাহ যদি আল্লাহর জন্য হয়। মুমিনের কষ্টের বদলে তার পদমর্যাদা বাড়ে। হাদিসে এসেছে, মুমিনের যদি মাথাব্যথা-জ্বর বা পায়ে কাঁটাও ফুটে তার গুনাহ মাফ হয়। আর সুস্থ হলে যেন সে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হল নিষ্পাপ হয়ে। তাই এই সব কষ্টকে আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করা চাই। এমনও পেয়েছি, তাহকীক জানি না। প্রসবকালে মৃত্যু হলে ঐ নারী শহীদের মর্যাদা পান। এতবড় একটা বিষয়কে আমরা কত হালকা মনে করি। আল্লাহর দিকে রুজু থাকুন, যিকিরে জিহবাকে সিক্ত রাখুন। সূরা ইয়াসীন মুখস্ত থাকলে পড়তে থাকুন। কালিমা আর ইস্তিগফার পড়তে থাকুন।

· সব সরকারি হাসপাতালে নর্মাল ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। তাই ক্লিনিকে না গিয়ে সরকারি হাসপাতালে নার্সদের দ্বারা ডেলিভারির চেষ্টা করবেন। আর বাচ্চার পজিশন ঠিক থাকলে, বিপদ চিহ্নগুলো না থাকলে প্রশিক্ষিত দাঈমা পাওয়া যায়, তাকে দিয়েও করাতে পারেন বাসার সেটআপে। নর্মাল ডেলিভারির জন্য দুআ করতে হবে। তবে প্রয়োজনে সিজার করানো দোষের না, এটাও তাকদীর। আর সিজার করলেই বাচ্চা কম নিতে (?) হবে তা কে বলেছে? আমার এক ডাক্তার বড়ভাই মাশা-আল্লাহ সিজার করেই ৪ টা। আমিও নিয়ত করেছি। পয়লাটা সিজার তো কি হয়েছে, পরেরটা নর্মালও হতে পারে। এটাও ভুল ধারণা যে একটা সিজার করলে মনে হয় পরেরটাও সিজার করাতে হয়। তবে সতর্ক থাকতে হবে। আমরা নর্মালেরই চেষ্টা করব, তবে এমন সেটআপে নর্মাল করাবো, যাতে প্রয়োজন হলে চট করে সিজারও করানো যায়।

৯. প্রসব পরবর্তী করনীয়ঃ

· ডান কানে আজান, বাম কানে ইকামাত দিন। চিৎকার করে দেবেন না, আস্তে আস্তে ফিস ফিস করে দিন। বাচ্চাকে শোনানো উদ্দেশ্য, সবাইকে না।

· সেলফি তুলবেন না, নজর লাগানোর সুযোগ রাখবেন না। কেউ তুলতে চাইলে বারণ করুন, কঠোর হোন।

· বাচ্চাকে মায়ের কাছে রাখুন। পেটের ভিতরে ৩৬° সেলসিয়াসে আরামে ছিল। বাইরে ধরেন ৩০°। এটাই ওর জন্য ঠাণ্ডা। বাইরে সবাই ওকে লোফালুফি না করে ভিতরে মায়ের কাছে দিন। মায়ের শরীরে লেপ্টে রাখুন। বেশি করে কাপড়চোপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখুন।

· যত বেশি কোলে নেয়া হবে ততই ইনফেকশান হবার চান্স বেড়ে যাবে। না আর দাদী-নানী ছাড়া বাকিদের আপাতত নেবার দরকার নেই। আর এখন কোলে টোলে নিয়ে মজাও নেই, এইটুকু একটা মানুষ, তার কি কোলে নেবেন। বড় হোক, গোশতটোশত লাগুক, তখন খুব নেয়া যাবে। এখন সবাই যেন কম কম নেয়।

· আর কোলে নেবার আগে হ্যান্ডওয়াশের ব্যবস্থা রাখবেন। হাত ধুয়ে কোলে নেবে। পায়খানা পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে কোলে নেবে।

· খেজুর ধুয়ে দুএকটা হালকা চিবান দিয়ে বাচ্চার মুখে ধরেন। ও নিজেই চুষবে। পুরাটা বা কোন অংশ মুখের ভেতর যেন না যায়, জাস্ট চুষবে। বা একটু মধুপানি ৪/৫ চামচ দিয়ে তাহনীক করাতে পারেন। ডাক্তাররা যেন না দেখে। এটা আধুনিক রিসার্চ, সবাই জানেও না। ‘কষ্টিপাথর’ বইয়ে বিস্তারিত আছে, চান্সে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিলেম।

· যত দ্রুত সম্ভব শালদুধ খাওয়াতে হবে। তাহনীক হয়ে গেলে আর কিছু দেবার দরকার নেই। ওর পেটে যত ক্ষুধা থাকবে, তত ও টানবে, তত দুধ নামবে। আজেবাজে কৌটার দুধ বা বেশি মধুপানি খাওয়ায়ে ক্ষুধা নষ্ট করবেন না। ওর পেট ভরা থাকলে ও কিন্তু টানবে না, দুধও নামবে না।

সিজারের ক্ষেত্রে স্ট্রেসের কারণে/ এনেস্থেশিয়ার কারণে দুধ নামতে দেরি হতে পারে। হায়, হায় আমার বাচ্চা এতক্ষণ না খেয়ে আছে, এত মায়া করার দরকার নেই। বেশি দেরি হলে ডাক্তারের পরামর্শে গ্লুকোজ দিতে পারেন, তবে পেট ভরে না। মাইন্ড ইট, ক্ষুধা রাখতে হবে।

· নাভিটার যত্ন নিতে হবে।

· মাকে দিনে খেতে হবে পাঁচ বেলা। যে খাবারগুলো খেলে বাচ্চার খাবার উৎপাদন বেশি হয়—

- ভাত

- প্লেট ভরে ভরে নিরামিষ খাবেন। কয়েকপদের সবজি দিয়ে নিরামিষ রান্না করবেন।

- তরমুজ

- আম ও অন্যান্য ফলমূল

- নিজেও এক গেলাস করে দুধ খাবেন

- প্রচুর পানি। বাচ্চাকে খাওয়ানোর আগে দুই গেলাস পানি খেয়ে নেবেন ১০ মিনিট আগে।
বাচ্চা খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

- শুধু ডাল খাবেন চুমুক দিয়ে।

· দিনে ৮-১০ বার পেশাব করলে ধরে নেবেন বাচ্চার খাওয়া ঠিক আছে।
যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছে। দুধপান করানোর নিয়ম আছে। শেষে একটা ছবি দিয়েছি। বুঝে নিন। ওযুর সাথে দুধপান করানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। ডান পাশ থেকে শুরু করার অভ্যাস করা ভালো। বাম পাশ খাওয়াতে চাইলেও শুরু হোক ডান থেকেই। একটু মুখে ধরেই অন্যপাশে নিয়ে গেলেন।
নেককার বানানোর কোন চেষ্টাই বাদ রাখা যাবে না।

· টেনে খাওয়া কিন্তু কষ্ট, আর ফিডার খাওয়া আরাম। ফিডারে বাইরের দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস করলে কিন্তু ও আর টেনে বুকের দুধ খাওয়ার কষ্টটা করতে চাইবে না। আর ও না খেতে খেতে দুধের পরিমাণও কমতে থাকবে। একটা সময় আর থাকবেই না। তাই ফিডার শুরু করুন ৬ মাস পর। বুকের দুধ না খাওয়ালে পরিণত বয়সে সন্তানটা নানা আধিব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে পড়বে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকে বুকের দুধ খাওয়াতে কোন অজুহাতকে প্রশ্রয় দেবেন না।

· বাচ্চাদের শরীর আমাদের চেয়ে একটু গরমই থাকে। কোষগুলো দ্রুত বিভাজন হয়। কোষে মেটাবলিজম মানে কর্মকাণ্ড বেশি হয়, তাপ বেশি উৎপাদন হয়। এটাকে জ্বর ভেবে ডাক্তারের কাছে দৌড়াদৌড়ি করবেন না। দোকানীরা তো আরও খারাপ, ওষুধ বেচলেই লাভ। এন্টিবায়োটিক বেহুদা দিয়ে দেবে। আপনার সোনামনির নিজের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হবার সুযোগ দিন। জ্বর মনে হলে মাপান। ১০০ এর উপরে থাকলে নাপা ড্রপ ছাড়া আর কিছু দেয়ার দরকার নেই। ১০২ এর বেশি হলে ডুশ দিবেন ডাক্তারের পরামর্শ মত। যদি এরপরও না কমে তাহলে এন্টিবায়োটিকের কথা ভাববেন। হ্যাঁ, ডাক্তার লিখে দেবে, কিন্তু আপনি খাওয়াবেন যেদিন জ্বরের বয়স হবে ৩ দিন। এই তিন দিন আপনার কাজ শুধু জ্বর কমিয়ে রাখা। আর ও নিজে নিজে ফাইট করবে, ফাইট করা শিখবে। তবে যদি জ্বর কমার কোন লক্ষণই নেই মনে হয়, তাহলে এন্টিবায়োটিক শুরু করা যেতে পারে। আর ৩ দিন পরেও যদি জ্বর আসে, তাহলে শুরু করে দিন।

· সামান্য সর্দি-কাশিতে সরিষার তেল মাখিয়ে ভোরের নরম রোদে ফেলে রাখুন। এতো মায়ার কিছু নেই। আমাদের বাপদাদাদের এতো ওষুধ খেতে হয়নি। বেশির থেকে বেশি এন্টি হিস্টামিন (হিস্টাসিন সিরাপ)জাতীয় ওষুধ দেয়া যেতে পারে। তবে কয়েকদিনেও সারার লক্ষণ না পেলে বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে (ঘড় ঘড় শব্দ) মনে হলে দ্রুত হাসপাতালে আনুন।

· জন্মের পর পরই একটা জন্ডিস হয়। স্বাভাবিক বিষয়, আতংকে চিৎকার করবেন না। রোদে ফেলে রাখলে এমনিতেই ঠিক হয়ে যায়।

· ৭ম দিনেই আকীকা করুন। নিজে জবাই করুন। আর নিয়ত করুন, আল্লাহ আমার সন্তানেরর সব বালা-মুসিবতকে জবাই করে দিলাম। গরীবকে শরীক করুন, বরকত হবে। চুল মুন্ডিয়ে সমপরিমাণ রূপার দাম আন্দাজ করে সদকা করুন।

আজ এতটুকুই। যাচ্ছি কিন্তু যাচ্ছি না। আবার দেখা হবে অন্য কোথাও, অন্য কোন বিষয়ে, অন্য কোন সময় ইনশাআল্লাহ। আমার লাগি একটু দুআ কইরেন গো আপনেরা, আমার ‘রাইটার্স ব্লক’ চলছে। ‘ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২’ আগাচ্ছে না। আল্লাহ যেন এগুলার উসীলায় আমার গুনাহ মাফ করেন। আমাদের সবাইকে আল্লাহ মাফ করুন। আমরা জালেম, উনিই একমাত্র পবিত্র। লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায যোয়ালিমীন।

আমার মনে হয় না এগুলোর দলিল আছে। তবে কুরআনের আয়াতের প্রভাব তো ডেফিনিটলি আছে।
কুরআনের আয়াতের সরাসরি প্রভাব অস্বীকার করার সুযোগ নেই কিন্তু। আর এগুলো আমল করলে গুনাহ হবার সম্ভাবনা আমার মনে হয় কমই। বরং উপকার পাবার সম্ভাবনাই বেশি বলে মনে হয়।

বুকে নিতে না পারার জন্য বাচ্চা অনেকসময় দুধ পায় না। নতুন মা'দের জানার আছে।

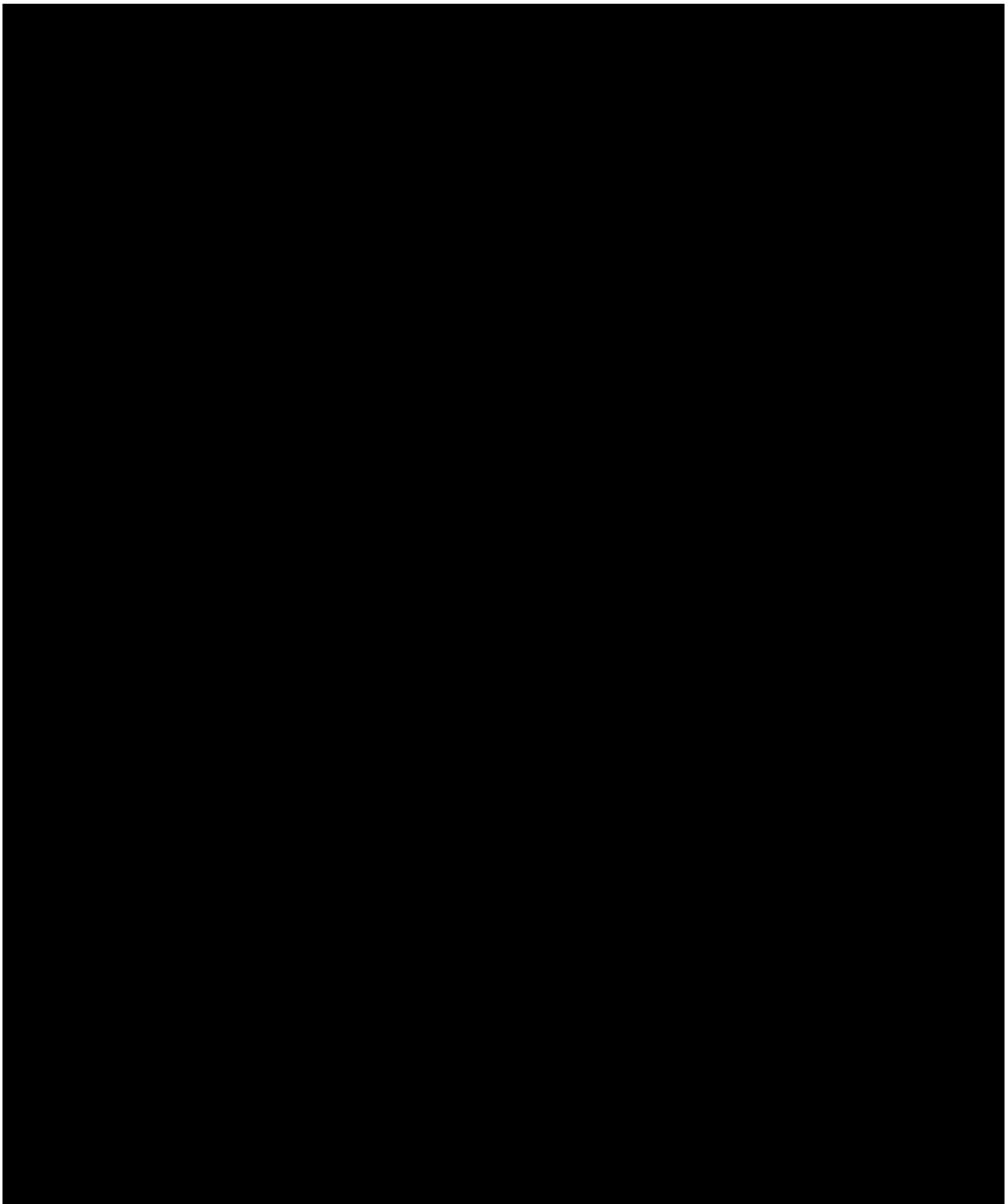

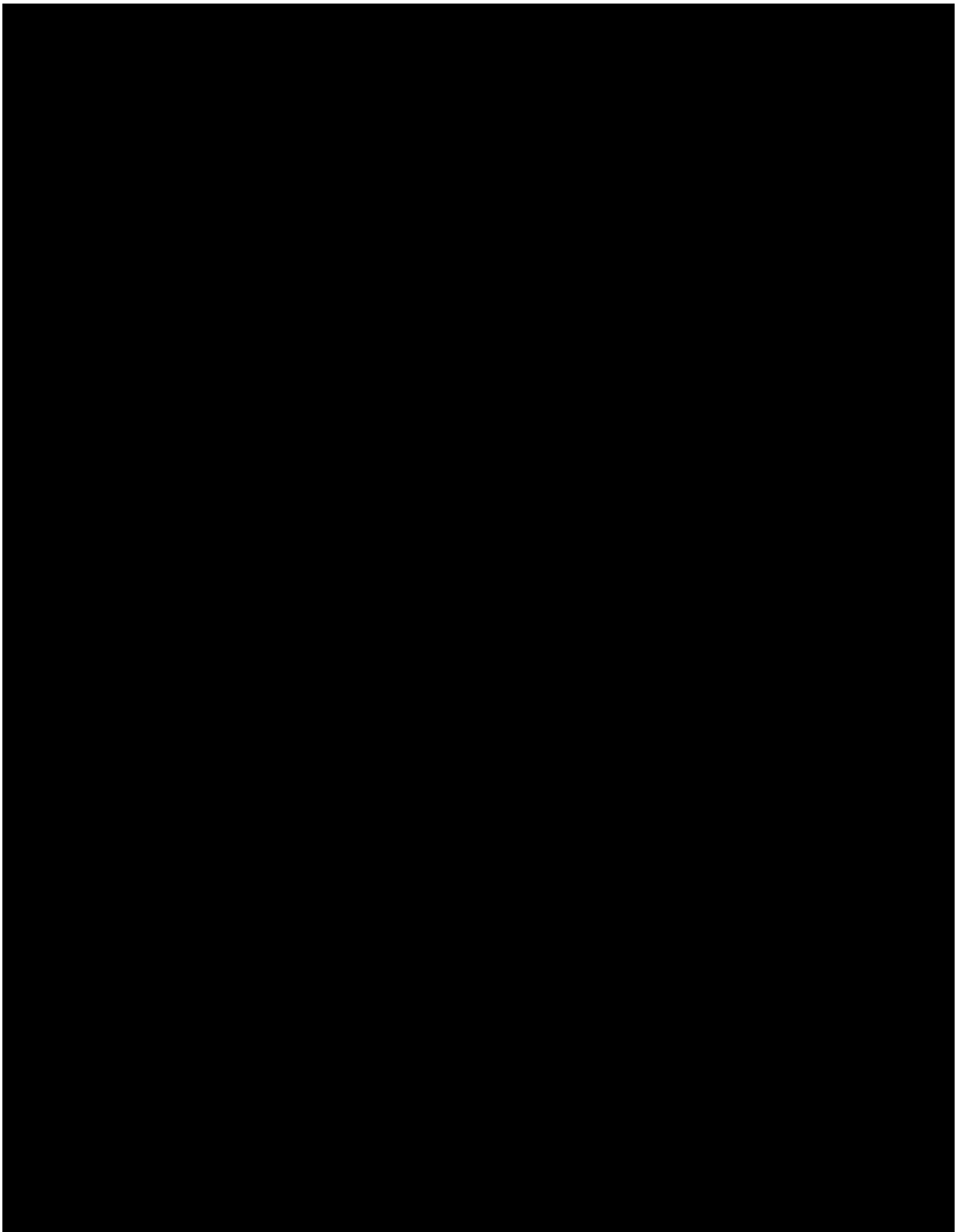

আর রিজালু বির রিজাল...
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·SATURDAY, SEPTEMBER 29, 2018

সমকামিতা। হালের আলোচিত টপিক। কারো কাছে মানবিক, স্বাভাবিক। কারো কাছে পাশবিক, বিকৃতি। কারো কাছে ‘ঘেন্নার', তবে ‘এটাও একটা ধরন', ওদেরও আছে সমাজে বসবাসের অধিকার, ইত্যাদি। নিজের পছন্দমত যৌনচর্চার অধিকার। কেউ তো আবার আগ বাড়িয়ে জিনগত-জন্মগত-প্রাকৃতিক প্রমাণ করেও ছেড়েছে। আজিব হ্যায় ইয়ে দুনিয়া। যা ইচ্ছে প্রমাণ করে ফেলা যায়। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য করে ফেলা যায়। নিজের চাহিদাকে বৈধতা দেয়া কেন ব্যাপারই না। প্রতারণার যুগ, এইজ অব দাজ্জাল (দাজ্জাল অর্থ চরম প্রতারক)। সব সম্ভবের যুগ।

ডাক্তার হওয়ার জন্য ম্যালা বইপত্র পড়তে হয়েছে। ১১ টা সাবজেক্টে প্রতিটার ২ টা মেইন বই, একটা গাইড ধরলে ৩৩ টা কেতাব খতম দিয়ে লাইসেন্স মিলেছে রোগীর গায়ে হাত দেয়ার। তাই, একটা দুটো বই পড়ে আপনি যেমন খুব সহজে ‘গে জিন' এর অস্তিত্ব বিশ্বাস করে সমকামিতা-কে ‘হাতের স্পর্শ ছাড়াই প্রাকৃতিক’ বলে বিশ্বাস করে ফেলতে পারেন। আমি পারি না। জেনেটিক্সে ‘সমকামিতা’ প্রাকৃতিকভাবে প্রোগ্রামড কি না, তা নিয়ে পক্ষ বিপক্ষ তৈরি হলেও, মেডিকেল সায়েন্সে সমকামিতার ‘অপ্রাকৃতিকতা’ নিয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

সমকামিতা যদি প্রাকৃতিকই হয়, স্বাভাবিকই হয়; তাহলে আমাদের শরীরের গঠন তা সাপোর্ট করার কথা। আমাদের এনাটমি ও শারীরতত্ত্ব তো সমকামবান্ধব হবার কথা। সমকামের জন্য যা যা প্রয়োজন, আমাদের গঠনও তেমনটাই হবার কথা। যেহেতু এটা প্রাকৃতিক দাবি করা হচ্ছে। সমকামের সাথে যায়- এমন বৈশিষ্ট্য পায়ু-লিঙ্গে পাওয়া গেলেই তো দাবিটা সঠিক হয় যে, সমকাম সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন ও সুস্থ

স্বাভাবিক যৌনক্রিয়া, তাই না? যেমন ধরেন যোনির গঠনটাই এমন যে পুরো জায়গাটা—

- ঘর্ষণ উপযোগী- প্রচুর পিচ্ছিলকারী তরল তৈরির ব্যবস্থা- এসিডিক পরিবেশ, ফলে বহিরাগত জীবাণু প্রতিরোধী- প্রসারণশীল- আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টিকারী স্নায়ুসমৃদ্ধ

এসব বৈশিষ্ট্যই প্রমাণ করে যে, যোনিপথে মিলন একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। অপরপক্ষে নাকের ছিদ্র বা কানের ছিদ্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলো নেই। যা প্রমাণ করে নাকের ছিদ্রে বা কানের ছিদ্রে মিলন, চাই সেটা যত আগে থেকেই প্র্যাকটিস করা হোক না কেন, কোনভাবেই প্রাকৃতিক নয়। এমন কোন জায়গায় মৈথুন আর যা-ই হোক প্রাকৃতিক হতে পারে না। অনুপযুক্ত স্থানে অনুপযুক্ত চর্চা অবশ্যই প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং ‘গে-জিন’ এর রূপকথা বানিয়ে দিলেই পায়ু মৈথুনের উপযুক্ত হয়ে যাবে না। মনে রাখবেন, কোন জিনেই লেখা থাকে না যে এটা ‘গে-জিন’। বরং এগুলো ধারণা করা হয় যে, হতে পারে এই জিন এই কাজের জন্য দায়ী। কিছু ভাইয়াকে এইসব ধারণাগত বিষয়কে এত বেশি বিশ্বাস করতে দেখা যায়, যদিও তারা দাবি করে তারা না দেখে কিছু বিশ্বাস করে না। যেহেতু গে-জিন আমার আলোচ্য বিষয় না, তাই আজ এখানে তা আলোচনা করছি না। চলুন দেখি, মানবদেহের গঠন আমাদের কী বলে।

ভূমিকাঃ

আগে কিছু কথা শিখে নিই যাতে পরের কথাবার্তা বুঝা যায়। আমাদের শরীর বহু কোষের সমন্বয়ে গঠিত। একই ধরনের একাধিক কোষ ভ্রূণদশায় যদি একই উৎস থেকে তৈরি হয়, আর যদি একই ধরনের কাজ করে সেই কোষের গ্রুপকে কলা/টিস্যু (Tissue) বলে। যেমন ধরেন নার্ভটিস্যু বা স্নায়ু কলা। ভ্রূণ অবস্থায় সবচেয়ে বাইরের লেয়ার থেকে এরা উৎপন্ন হয়ে সারা দেহে বিস্তার লাভ করে এবং নার্ভ তৈরি করে। সেন্স আনা-নেয়ার

ফুসফুসে আঁইশাকার কোষ

এরা আবার কয়েক ধরনের। যেখানে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অণুর আদানপ্রদান দরকার, সেখানে আছে চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা মাছের আঁইশের মত কোষওয়ালা আবরণী কলা। যেমন ফুসফুসের শেষ মাথায় (Alveolus) যেখানে অক্সিজেন-কার্বনডাইঅক্সাইড আদানপ্রদান হবে সেখানে অন্যগুলো থাকলে হবে না, সেখানে আছে এই আঁইশাকার আবরণী কলা, যাতে লেনদেন সম্ভব হয়। আবার এগুলো আছে রক্তনালীর ভিতরের লেয়ারে, কারণ সেখানে (বিশেষত কৈশিকজালিকায়) গ্লুকোজ, এমিনো এসিড, স্নেহ পদার্থ সরবরাহ করতে হবে, আবার বর্জ্য নিতে হবে রক্তে, আদানপ্রদানের জন্য সেখানেও একস্তর আঁইশাকার কোষ (Simple Squamous Epithelium)। কেন আইশাকার? যাতে অণুগুলোকে কম দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে হয়। কোষের বেধ কম, আঁইশের মত।

আবার যে আবরণকে ঘর্ষণ সহ্য করতে হবে বেশি সেখানে বহুস্তর আঁইশাকার আবরণী কলা (Stratified Squamous Epithelium)। যাতে অল্প পুরুত্বে কয়েকস্তর কোষ দেয়া যায়। উপরের লেয়ার ঘষায় উঠে গেলেও (Desquamation) তলায় আরও কয়েক লেয়ার থাকে যা জীবাণু প্রতিরোধ করবে। যেমন ধরেন মুখগহ্বরের ভিতরের লেয়ারটা। গোশত-হাড্ডি চাবায়ে, লাকড়ির মত টোস্ট কুড়মুড় করে খাচ্ছেন, এই কোষগুলো আছে বলে। অন্যকোষ থাকলে সারাবছর ঘা হয়ে থাকত। আবার অন্ননালী জুড়েও এই কোষ, কারণ আমরা একদম তরল করে গিলি না, কিছুটা চিবিয়েই গিলে ফেলি, শক্ত শক্ত ।

আবার কিছু জায়গা আছে যেখানে রস উৎপন্ন করাটাই কাজ। যেমন বিভিন্ন গ্ল্যান্ড। এখানে রস বানানোর কাঁচামাল জমানো লাগবে, রস বানানোর মেশিনপত্র রাখা লাগবে, আবার বানানো রস রাখারও জায়গা লাগবে। তাই এখানে আঁইশের মত চ্যাপ্টা হলে কাজ হচ্ছে না। এসমস্ত রসের কারখানার জন্য আছে ছক্কার গুটির মত (Cube) একস্তর কোষের আবরণী

[illegible]: [illegible],
[illegible]

[illegible] ([illegible])

[illegible] (Simple Columnar
Epithelium)[illegible], [illegible]

(Digestive/ Gastrointestinal Epithelium)বলে। পাকস্থলী- ক্ষুদ্রান্ত্র-কোলন-মলাশয়।

যেখানে যেটা দরকার সেখানে সেটা, কোন ব্যত্যয় নেই। অবশ্য একশ্রেণীর মানুষ একে দুর্ঘটনা মনে করে। এমনি এমনিই এমন ছন্দের মত, নিখুঁত নকশা তৈরি হয়েছে বলে তাঁরা দাবি করে। এনারা রোবটের কাজকাম নিখুঁত হলে এঞ্জিনিয়ারের প্রশংসা করে, কিন্তু এতো অতি- আণুবীক্ষণিক লেভেলের পারফেকশন নাকি লক্ষ লক্ষ ঠাডা পড়ে নিখুঁত হয়েছে বলে তিনারা বিশ্বাস করেন।

আচ্ছা, অন্য প্রসঙ্গে না গেলাম। যে ধরনের আবরণী কলার যেটা সহ্য করার ক্ষমতা নেই, সেখানে সেটা হলে (Stess) একটা সমস্যা হয়। যেমন ধরেন, পাকস্থলীর ভিতরের আবরণে আছে স্তম্ভাকার কোষ। এরা সেখানে এসিড, শ্লেষ্মা ও অন্যান্য রসটস তৈরি করে। এখন, অন্ননালীর আবরণ আবার আঁইশাকার।

মেটাপ্লাসিয়া (দেখেন স্তম্ভ কোষ কীভাবে আঁইশ হচ্ছে)

যদি কারও দীর্ঘদিন পেটের খাবার উপরে উঠে আসার সমস্যা থাকে (Reflux), তাহলে ঐ আঁইশাকার কোষগুলো এসিডের ছ্যাঁকায় ছ্যাঁকায় পরিবর্তন হয়ে স্তম্ভাকার হয়ে যায়, এই প্রক্রিয়াকে বলে মেটাপ্লাসিয়া (Metaplasia)। এটা ভালো জিনিস না, ক্যান্সারপূর্ব লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত। এই অসুখকে বলে ‘ব্যারেটস ইসোফ্যাগাস’।

[illegible]

[illegible]

[illegible] ‘[illegible]’ (Sqamous Cell Carcinoma, SCC)। [illegible]

‘ঘনকাকার কোষ ক্যান্সার’(Small Cell Carcinoma)। আশা করি এতটুকু ক্লিয়ার।

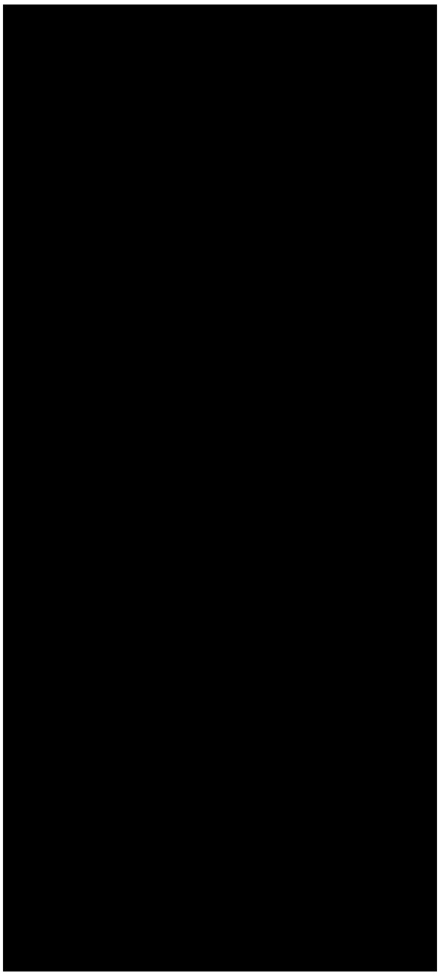

যোনির ভিতরের আবরণ (মাল্টিলেয়ার আঁইশ কোষ)

এবার মূল আলোচনা শুরু। পয়লা আমরা যোনিপথের (Vagina) গঠন দেখব। এটা একটা নালী বা টিউবের মত অঙ্গ। স্বাভাবিক অবস্থায় এর দৈর্ঘ্য থাকে ২.৭৫ ইঞ্চি থেকে ৩.২৫ ইঞ্চি। আর নারীর উত্তেজিত অবস্থায় বেড়ে দাঁড়ায় ৪.২৫-৪.৭৫ ইঞ্চি। [1] পুরো যোনিপথ তো বটেই, সেই সাথে পুরুষাঙ্গ যেখানে গিয়ে ধাক্কা দিতে পারে, মানে সারভিক্সের যে অংশ যোনিপথের দিকে বেরিয়ে থাকে (Ectocervix), সে অংশও মাল্টিলেয়ার আঁইশ

কোষে আবৃত (ঘর্ষণ উপযোগী)। যদিও মূল সারভিক্সের (Endocervix) আবরণ একস্তর স্তম্ভ কোষের [2]। বামের ছবিতে দেখুন যোনিপথ ও বহিঃসারভিক্সের মাল্টিলেয়ার আঁইশ কোষ দেখা যাচ্ছে।

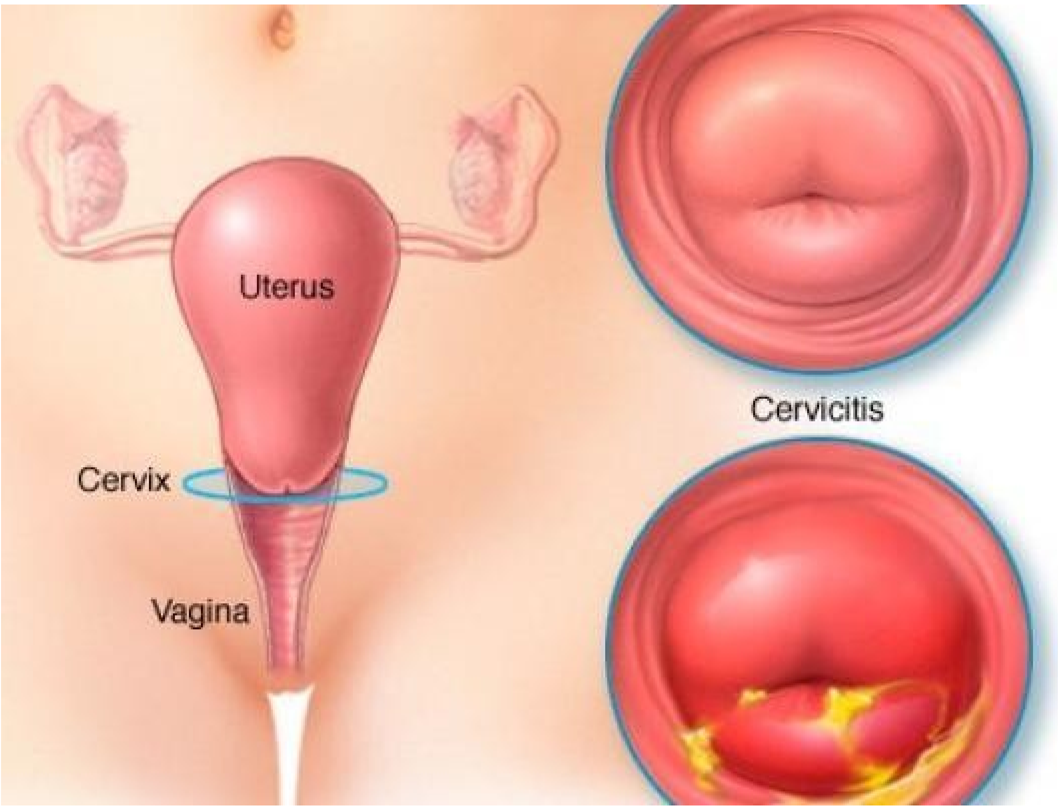

বহিঃসারভিক্স ও যোনির আবরণ মাল্টিলেয়ার আঁশ কোষ ঘর্ষণ উপযোগী

আর ডানের ছবিতে দেখুন জরায়ুর একটা অংশ যোনিপথের দিকে বেরিয়ে আছে। ঐ অংশটাও (বহিঃসারভিক্স) যোনিপথের মত একই ঘর্ষণযোগ্য মাল্টিলেয়ার আঁইশ কোষ আবরণ দিয়ে আবৃত।

পায়ুপথ ও মলদ্বার

এবার, পায়ুর গঠনটা দেখি চলেন। ছবিটা দেখতে হবে খুব ভালো করে। পায়ু একটা নালী (Tube)। মাঝখান থেকে লম্বালম্বি চিরে ফেললে এমন দেখাবে। ছোট ছোট ঢেউয়ের মত কাল দাগ দেয়া আছে দেখেছেন? ঐ বর্ডার থেকে লোমওয়ালা বর্ডার পর্যন্ত এলাকাটা হল ‘পায়ুপথ’ (Anal canal), মাত্র ৪ সে.মি. (৩-৫ সেমি) [3]। এই এলাকাটুকু মার্ক করে ‘Anoderm’ লেখা আছে, মানে হল এখানে আবরণ আমাদের চামড়ার মতই, কেবল লোম-ঘামগ্রন্থি এসব নেই। এর উপর থেকে রেক্টাম বা মলাশয় শুরু। মানে হল কালো ঢেউ ঢেউ দাগের নিচের টুকু জড় কেরাটিন যুক্ত মাল্টিলেয়ার আঁইশাকার কোষের আবরণ (ত্বকের মত), আর উপরের অংশ রেক্টামে একস্তর স্তম্ভটাইপ কোষের আবরণ (পৌষ্টিকনালীর বাকি অংশের মত)[4]।

[illegible]

[illegible] (digestive epithelium), [illegible]

[illegible].

এখানে আমরা দেখলাম, পায়ুপথের মাত্র ৪-৫ সেমি জায়গা ঘর্ষণ উপযোগী। পরের এলাকাগুলো মোটেও ঘর্ষণ উপযোগী নয়। পুরুষের গড় উত্থিত লিঙ্গের দৈর্ঘ্য ৫ ইঞ্চি, আমরা এক ইঞ্চি কমিয়ে ধরলাম। ৪ ইঞ্চি মানে ১০ সেমি। মানে লিঙ্গের বাকি ৫ সেমি গিয়ে আঘাত করবে রেক্টামের স্তম্ভাকার কোষের আবরণে, যা ঘর্ষণের জন্য অনুপযোগী। আর আমরা আগেই দেখেছি যে কাজের জন্য যা উপযোগী না, সেখানে সে কাজ হলে মেটাপ্লাসিয়া ঘটে। কোষের ধরন বদলে যায়, যা উপযুক্ত পরিবেশে ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে। সমকামীদের মলদ্বারের ক্যান্সারের ঘটনা সাধারণ মানুষের চেয়ে ২০ গুণ বেশি। [5] আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি জানাচ্ছে, পায়ুমিলন পায়ুক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ায়। আরও বেশি সম্ভাবনা বাড়ে সমকামী পায়ুমিলনে।[6]

২.

যেহেতু এমন জায়গায় গিয়ে আঘাত হচ্ছে যা একস্তরী স্তম্ভ কোষ, মাল্টিলেয়ার না। ফলে প্রতিবার সেক্সে ইনজুরি হবেই। আবরণী ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। ফলে এইডস ভাইরাস, প্যাপিলোমা ভাইরাস ইনফেকশন ছড়ায় দ্রুত। এইডস তো এইডস-ই, আর প্যাপিলোমা ভাইরাস-ই মূলত ৮০-৯০% মলদ্বারের ক্যান্সারের জন্য দায়ী [7]।

৩.

টিউমার-এর খারাপ জাতটাকেই (malignant) বলে ক্যান্সার। টিউমার বড় হতে সাহায্য করে আমাদের দেহে উৎপন্ন প্রোস্টাগ্লান্ডিন (PG) নামক কেমিক্যাল গ্রুপের PGE2 ও PGF2. আর টিউমার তৈরি শুরু হতে সাহায্য করে PGE2, PGF2, ও PGE1. এবং এই ৩ ধরনের PG-ই অত্যধিক পরিমাণে আছে

বীর্যে। দেহস্থ অন্য যেকোন রস বা টিস্যুর চেয়ে বেশি। [8] মানে বীর্য সহ্য করার ক্ষেমতাও পায়ুর নেই, যা জরায়ুর আছে।

৪.

এবার একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতামত তুলে ধরব। ডাক্তার Stephen E. Goldstone, MD সাহেব Mount Sinai School of Medicine, New York এ assistant clinical professor হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এবং তিনি gayhealth.com এর মেডিকেল ডিরেক্টর। তিনি ২০০০ সালের American Society of Colon and Rectal Surgeons এর বার্ষিক সম্মেলনে বলেন, ১৯৯৭ সালের আগে আমি আমার পুরো ক্যারিয়ারে একটা পায়ু ক্যান্সারের রোগী পেয়েছি। ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত আমি আমার চেম্বারে রেফার হয়ে আসা ২০০ পুরুষ রোগীর ডাটা সংগ্রহ করি। এদের সবাই নন-ক্যান্সার সমস্যা নিয়ে এসেছিল। এদের ৬৬% ছিল এইচআইভি পজেটিভ। বায়োপসি করে পেলাম, এদের ৬০% এর হাইগ্রেড আঁইশ কোষের টিউমার ক্যান্সার যা এখনও ছড়িয়ে পড়েনি (high-grade squamous intraepithelial lesions (HSIL) আর ৩% এর পেলাম ছড়িয়ে পড়া (invasive) ক্যান্সার। যদিও এদের কারোরই ক্যান্সারের লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। [9] ফাইনালি তিনি সিদ্ধান্ত দেন, সমকামী পুরুষেরা পায়ুপথের যেকোন সমস্যা নিয়ে এলেই তাদের গভীর পরীক্ষা (aggressive screening) করা দরকার। হতে পারে ভিতরে ক্যান্সার-পূর্ব আরও মারাত্মক কোন সমস্যা লুকিয়ে আছে।

৬.

[illegible] Adenocarcinoma [illegible], [illegible] (Sqamous Cell Carcinoma, SCC) [illegible] University of California-[illegible] professor of clinical pathology [illegible] Teresa M. Darragh, MD [illegible] associate director for gynecologic pathology [illegible] Barbara Winkler, MD.[10]

[illegible]-[illegible]-[illegible] (squamo-columnar junction with the rectal columnar mucosa)[illegible] [illegible], [illegible] (receptive anal intercourse) [illegible]-[illegible]-[illegible], [illegible] (In this area of transition, there is active changeover of columnar epithelium to squamous epithelium through the process of squamous metaplasia. This process is accelerated by trauma, healing, and repair such as might be expected to occur with receptive anal intercourse.)

আবার দিলাম ছবিটা। কালো জিগজ্যাগ দাগটা হল সেই জাংশন। এর উপরে শার্পলি স্তম্ভকোষ শুরু, নিচে শার্পলি মাল্টিলেয়ার আঁইশ কোষ শুরু। দাগের ঠিক উপরের জায়গাটাতেই মেটাপ্লাসিয়া বেশি হয় আমরা জানলাম, সমকামীদের ক্ষেত্রে। দেখেন এই জায়গাটা বাকি রেক্টামের চেয়ে উঁচু, লম্বা লম্বা ভার্টিকাল ভাঁজ আছে । মানে ঘষা এখানে লাগে বেশি, বাকি রেক্টামের চেয়ে। যা ঘষা লাগার জন্য তৈরি হয়নি, তাতে ঘষা লাগতে লাগতে একসময় তাই ঘটে যা আমরা আগে বলেছি—মেটাপ্লাসিয়া। এই মেটাপ্লাসিয়া থেকে হচ্ছে এই ক্রমবর্ধমান হারে আঁইশ কোষ ক্যান্সার।

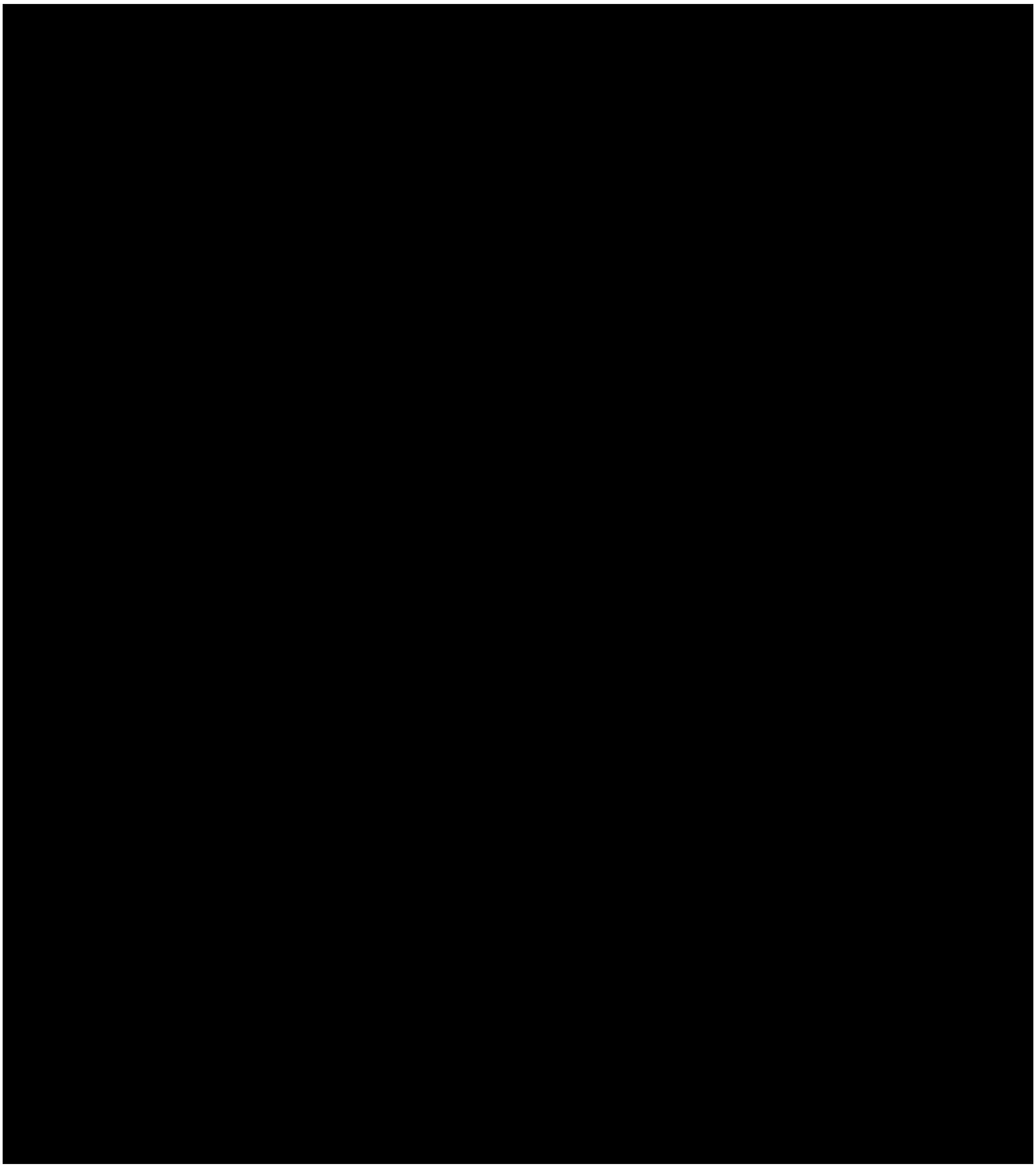

[illegible]

[illegible].

[illegible], [illegible], [illegible] ‘[illegible]’ (coushion)[illegible]

বিখ্যাত অসুখটা হয় , তার নাম আপনারা সবাই জানেন — পাইলস (haemorrhoid)। দেখুন , ঐ নীল অংশটাই বেড়ে গোটার মত হয়েছে।

দুটো ভিন্ন রক্ত পরিবহন সিস্টেমের মিলনস্থল (Porto-systemic anastomosis)

পায়ুর এই জায়গাটা অতিমাত্রায় রক্তনালীসমৃদ্ধ। দুটো ভিন্ন রক্ত পরিবহন সিস্টেমের মিলনস্থল এটা (Porto-systemic anastomosis)। আবরণীর নিচেই রয়েছে প্রচুর রক্তজালক (venous plexus)। আঘাত/ঘর্ষণের জন্য এ জায়গাটা মোটেই নিরাপদ না। আসলে এই শিরাজালিকা চওড়া হয়ে ও মোটা হয়ে ঝুলে পড়ে হয় পাইলস। পাইলসের কারণগুলো যদি আমরা দেখিঃ [11]

- শিরা থেকে কম রক্ত ব্যাক করাঃ দীর্ঘসময় টয়লেটে বসে থাকা , গর্ভাবস্থা , পায়ুপেশীর অধিক সংকোচন- কোষ্ঠকাঠিন্য - পেটে অধিক চাপ দেয়া - গর্ভাবস্থা - পারিবারিক ইতিহাস - Lack of erect posture- Familial tendency- Higher socioeconomic status- Chronic diarrhea- Colon malignancy- Hepatic disease- Obesity- Elevated anal resting pressure- Spinal cord injury- Loss of rectal muscle tone- Rectal surgery- Episiotomy-

Anal intercourse *****- Inflammatory bowel disease, including ulcerative colitis, and Crohn disease

তাহলে দেখা গেল পাইলসের একটা কারণ হল পায়ুসঙ্গম। পায়ুসঙ্গম নিজেই অনেকগুলো রোগের কারণ। এটা ন্যাচারাল বিহেভিয়ার হলে তা এতো অসুখবিসুখের কারণ হবে কেন? ন্যাচার সাপোর্ট করে না বলেই তো এত সমেস্যা। ন্যাচারের বিরুদ্ধে যায় বলেই তো ন্যাচার বিদ্রোহ করে।

৮.

রয়টার্সের রিপোর্ট। ৬১৫০ জন নরনারীর ডাটা বিশ্লেষণ করলেন গবেষকগণ। এদের ৩৭% মহিলা একবার হলেও পায়ুসঙ্গম করেছেন। আর ৫% পুরুষ পাওয়া গেল যারা একবার হলেও পায়ুসঙ্গম করেছেন। প্রধান গবেষক Dr. Alayne Markland, University of Alabama জানান, পায়ুসঙ্গমের সাথে ‘পায়খানা ধরে রাখতে না পারা’র (fecal incontinence) সম্পর্ক আছে। এবং সেটা মেয়েদের চেয়ে পুরুষের ক্ষেত্রে বেশি। এই ৩৭% মহিলার ৫০% এরই মাসে একবার হলেও fecal incontinence হয়, মানে কাপড় নষ্ট হয় আর কি। আর পুরুষের ৩ গুণ বেশি হয় এই দুর্ঘটনা, প্যান্ট ভরায়ে ফেলে। [12]

[illegible] [illegible]

[illegible].

[illegible] (Peyronie's Disease) [illegible], [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible], [illegible] [13][illegible] [illegible] CC-CS [illegible], [illegible]

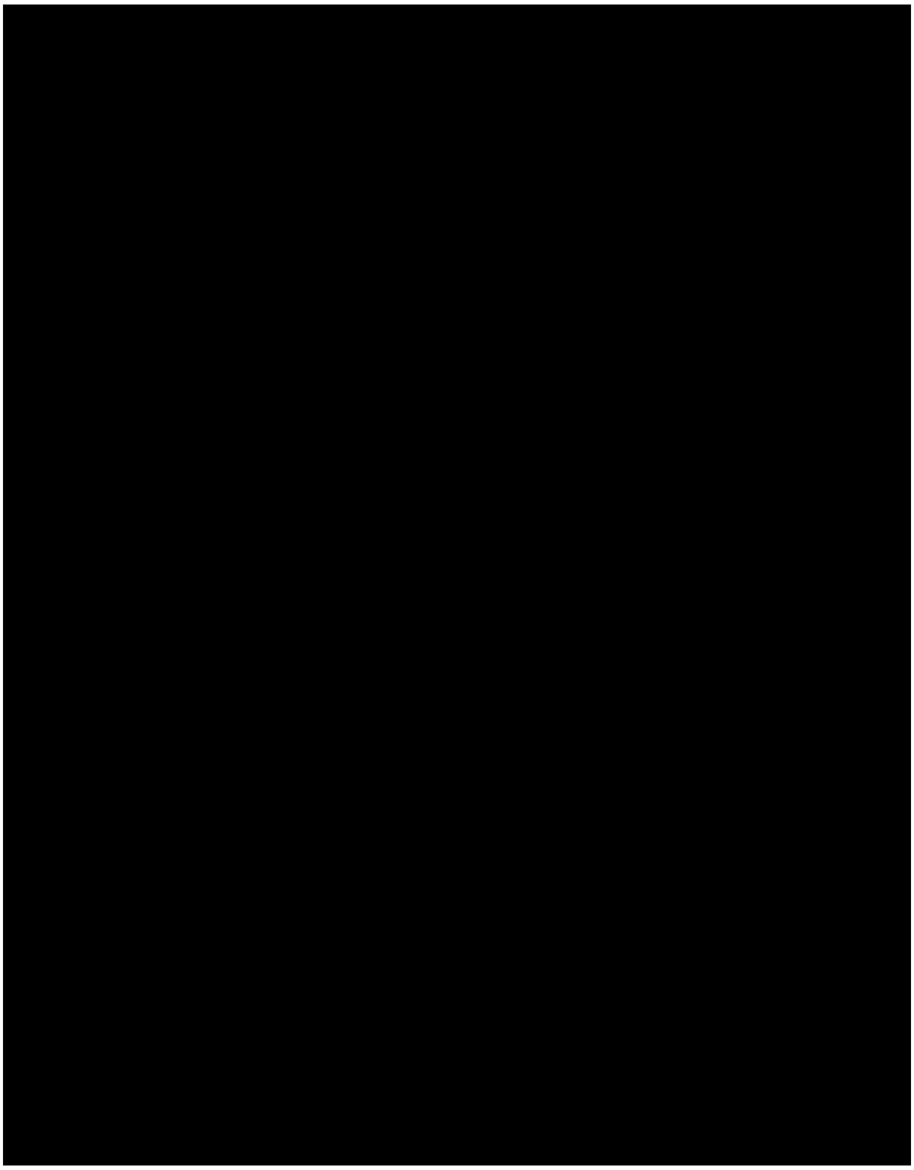

লিঙ্গের প্রস্থচ্ছেদ

অত্যধিক পরিমাণে রক্তনালী থাকার কারণে সামান্য ইনজুরি হলেও রক্তক্ষরণ হতেই পারে, আপনার অজ্ঞাতেই। ফলে সেখানে তৈরি হয় স্কার (বাংলায় ‘চল্টা’ বলা যেতে পারে), এদের বলা হয় ‘প্লাক’। ফলে লিঙ্গ বেঁকে যেতে পারে বা এবড়োখেবড়ো হয়ে যেতে পারে। কারো কারও প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে, এমনকি লিঙ্গ উত্থিত হবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলতে পারে। জানাচ্ছে American Urological Association.[14]

Southern Illinois University-র urologist Tobias Köhler, M.D. সাহেব জানাচ্ছেন ‘নিউইয়র্ক টাইমস’ পত্রিকাকে, বেশি চাপ দিয়ে হস্তমৈথুন করলে হতে পারে এই অসুখটা [15]। তার মানে সামান্য এই ‘হাতের চাপেই’ রক্তক্ষরণ হয়ে যেতে পারে লিঙ্গের ভিতরে, কেউ তো আর কিল-ঘুষি দিয়ে মাস্টারবেশান করে না। বিছানা বা বালিশে ঘষাঘষি তো আরও মারাত্মক ব্যাপার। নিচের টেবিলটা খেয়াল করুনঃ

(ছবির ১ নং রেফারেন্স [16] ছবির ২ নং রেফারেন্স [17] ছবির ৩ নং রেফারেন্স [18])

167 mm Hg মানে 22264.8 প্যাসকেল চাপ। অর্থাৎ ৩.২২ পাউন্ড ওজন এক বর্গইঞ্চিতে যে পরিমাণ চাপ দেয়। মানে ১.৪৬ অর্থাৎ প্রায় দেড় কেজি একটা বাটখারা লিঙ্গে বেঁধে দিলে যে চাপ অনুভব হবে অতখানি চাপ দেয় মলদ্বার সংকোচন (লিঙ্গের গোড়ার ক্ষেত্রফল এক বর্গইঞ্চি ধরেছি)। অনেক প্রেসার। লিঙ্গের মত সেন্সিটিভ অঙ্গের জন্য এটা অনেক প্রেসার। লিঙ্গ প্রবেশনের জন্য মলদ্বার খুবই রিস্কি জায়গা। মলদ্বারের চাপ নেবার মত ক্ষমতা নেই পুরুষাঙ্গের। আর স্কুইজ ছাড়া সারাক্ষণ প্রেসার থাকে ৭৭০ গ্রাম ওজন ঝুলিয়ে দিলে যেমন লাগবে, তেমন। হস্তমৈথুনেও এত চাপ দেয়া হয় না। নিঃসন্দেহে পেনিসে ইনজুরি হতেই হবে। পেনিস আর মলদ্বারে ইনজুরি না করে সমকাম করা অসম্ভব।

আমরা পায়ুপথে আঙুল দিয়ে একটা পরীক্ষা করি (Digital Rectal Exam, DRE)। তখন টের পাওয়া যায়, কত শক্তভাবে মলদ্বার চাপ দেয়। এছাড়া একটা স্বয়ংক্রিয় সংকোচন আছে মলদ্বারের যাকে বলে Anal Reflex/Anal wink. অর্থাৎ পায়ুর আশেপাশের ত্বকে কোন খোঁচা/ চিমটি দিলে পায়ু

সংকোচন হয়। [19] পায়ুমৈথুনে এই চাপ অতিক্রম করে চাপের বিরুদ্ধে লিঙ্গ প্রবেশ ও চালনা করাতে হয়। আবার ভিতরেও রেস্টিং প্রেসারের বিপরীতে লিঙ্গচালনা করতে হয়। সেখানে প্রচুর শিরাজালকের উপস্থিতিও আমরা দেখলাম। মোদ্দাকথা লিঙ্গ ও পায়ুর দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্যমান ইনজুরি না করে পায়ুমৈথুনের কোন সুযোগই নেই।

এজন্যই পায়ুমৈথুনে ২০ গুণ বেশি এইডসের সম্ভাবনা । আর এই রিস্ক আরও বাড়ে যদি আগে থেকেই রেক্টামে কোন ইনফেকশন থাকে [20]। আর আমরা দেখলাম, ইনজুরি ছাড়া পায়ুমৈথুন অসম্ভব। এক তো আবরণ ঘর্ষোণোপযোগী না, সিঙ্গেল লেয়ার, তার উপর আবার প্রেসার বেশি, ইনপুট প্রেসারও দিতে হবে বেশি, আবার রক্তজালিকা বেশি। তার উপর এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জীবাণু প্রজাতি E. coli যারা রক্তে এন্ট্রি পেলেই ইনফেকশন করে।

১০.

যোনিপথের Skene's ও Bartholin's গ্রন্থি থেকে প্রচুর পিচ্ছিল তরল নির্গত হয়। একজন মহিলার কোন উত্তেজনা ছাড়াই প্রতিদিন ১.৫ গ্রাম তরল বের হয়। আর উত্তেজিত হলে তা বহুগুণে বেড়ে যায় (arousal fluid)। আর অর্গাজমের সময় তা আরও বৃদ্ধি পায় [21]।

যোনিপথের মত পায়ুতে যথেষ্ট পিচ্ছিলকারকের উৎপাদনও নেই, ফলে প্রচুর লুব্রিকেন্ট ব্যবহার করতে হয়। অনেক বিজ্ঞ সমকামী ভাইয়া বলতে পারেন, জেলী ব্যবহার করলেই তো আর আঘাত-ঘর্ষণের ফলে ইনজুরি আর হলো না। আচ্ছা, ২০১০ সালে International Conference on Microbicides এ ২ টা গবেষণা উপস্থাপন করা হয়। ৪৭ টি দেশের সহস্রাধিক মাইক্রোবায়োলজিস্ট অংশ নেন। এই দুটি রিপোর্টের সারমর্ম হল, পায়ুকামে জেলী (lubricants) ব্যবহারে এইডসের রিস্ক আরও বাড়ে [22]। একটিতে বাল্টিমোর ও লস এঞ্জেলসের ৯০০ পুরুষ ও মহিলার ডেটা নেয়া

হয়। গবেষকগণ দেখেন, যারা জেলী ব্যবহার করে তারা ৩ গুণ বেশি যৌনবাহিত রোগের (rectal sexually transmitted infections) ঝুঁকিতে আছে। আরেকটা স্টাডি বলছে, জনপ্রিয় জেলীগুলোকে ল্যাবে নিয়ে দেখা গেছে, সেগুলোর অনেকগুলো রেক্টাল কোষের জন্য মরণঘাতী (toxic)। যার ফলে এগুলো ব্যবহারে এইডসের ভাইরাসের প্রবেশ হয় আরও সহজ। এমনকি পুরুষ না কি নারী, এইডস আছে না কি নেই, কোন শহরে থাকে, কনডম ইউজ করে কি না, গত মাসে কতজন যৌনসঙ্গীর সাথে মিলিত হয়েছে— এই সবগুলো ফ্যাক্টরকে সমান সমান নিয়েও দেখা গেছে, পায়ুমৈথুনের (receptive rectal intercourse) আগে জেলী (lubricant) ব্যবহার করার সাথে পায়ুর যৌনবাহিত রোগের সম্পর্ক জোরালোই রয়ে গেছে। (Even after controlling for gender, HIV status, city, condom use, and number of sex partners in the past month, the association between use lubricant before receptive rectal intercourse and rectal STIs remained strong) জানাচ্ছেন গবেষকদলের প্রধান Dr Pamina Gorbach যিনি School of Public Health এবং University of California, Los Angeles-এর David Geffen School of Medicine-এর একজন চিকিৎসক।

University of Pittsburgh ও Magee-Womens Research Institute এর Charlene Dezzutti, Ph.D এর নেতৃত্বে পরিচালিত আরেকটা গবেষণার রিপোর্টে বহুল প্রচলিত ৬ টা জেলী নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে,

- এতে অনেক বেশি পরিমাণে লবণ ও শুগার থাকে যা কোষের পানি টেনে নেয়। ডিহাইড্রেশান হয়ে মারা যায় আবরণী কোষ। ইনফেকশনের জায়গা করে দেয়।- আবার কোনটা পায়ুর ভালো ব্যাকটেরিয়ার পুরো বসতিই জ্বালিয়ে দেয়। ফলে খারাপ ব্যাকটেরিয়া আসার সুযোগ পায়।

মোটকথা, যোনিতে যেখানে প্রচুর লুব্রিক্যান্ট ক্ষরণের ব্যবস্থা আছে, সে তুলনায় পায়ুতে প্রায় জিরো। লুব্রিক্যান্ট নিয়েও শেষরক্ষা নেই, ইনফেকশান হবেই। কেননা আগেই দেখেছি, কেমিক্যাল সহ্য করার জন্য

চাই মাল্টিলেয়ার আঁইশ কোষের আবরণ। রেক্টামের একস্তর স্তম্ভকোষ মারা যাবে অহেতুক কেমিক্যাল টর্চারে।

সামারিঃ

মেয়েদের সমকামিতায় প্রবেশন (penetration) নেই বলে একে প্রকৃত মিলন বলা হয় না, তাই আজকের আলোচনায় জায়গা পায়নি। আর পুং সমকামিতা ছাড়াও নারীর সাথে পায়ুমৈথুনও আমাদের আলোচনার আওতায় এসেছে। মোদ্দাকথা, মানবদেহের প্রাকৃতিক গঠন সমকামিতার বা পায়ুমিলনের সাথে যায় না, এটা স্বাভাবিক প্র্যাকটিস না। কোনভাবেই প্রাকৃতিক তো নয়ই, বরং প্রকৃতিবিরুদ্ধ, যার বহিঃপ্রকাশ প্রাণঘাতী রোগ উৎপাদন (disease process).

আমরা ফরেনসিক মেডিসিন বইয়ে ‘প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌন অপরাধ’ (Unnatural Sexual Offence) অধ্যায়ে সমকামিতা, পশুকামিতা এসব পড়েছি, ইন্ডিয়ান রাইটারের লেখা বই। আজ ইন্ডিয়া সমকামিতার মত ‘প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌন অপরাধ’-কে অপরাধের লিস্ট থেকে উঠিয়ে দিলেই এর প্রকৃতিবিরুদ্ধতা চলে যাবে, প্রকৃতিবান্ধব হয়ে যাবে, তা না। যা টের পাবে প্রতিটি সমকামী তাদের জীবনের কোন এক পর্যায়ে। ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর প্রহর গুণবে আর স্মরণ করবে সেই সব অগ্নিঝরা দিনগুলোর কথা, আর অপেক্ষা করবে সামনের অগ্নিঝরা ভবিষ্যতের।

আর তিনারাই তো বিশ্বাস করেন— সারভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট। পায়ুমিলনে তো ফিটেস্ট কোন প্র্যাকটিস না, প্রজাতির ধারা রক্ষায় এর কোন ভূমিকা নেই। সমকামীরা সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিকভাবে আনফিট। মানবসমাজ ও মানবপ্রজাতি রক্ষায় তাদের কোন ভূমিকা নেই। এখন এই আনফিট অংশ মানবপ্রজাতির জন্য অপচয়, ওয়েস্টেজ। আগে হলে হিটলার ও

স্ট্যালিন ‘সোশ্যাল ডারউইনিজম’ (আনফিট জনসংখ্যাকে সমাজ থেকে ঝেড়ে ফেলা) এপ্লাই করত। ভবিষ্যতে এরাও একা একাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তবে সমাজে যেন এদের প্রভাব না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সমকামিদের প্রতি ইসলামের বিধান এজন্যই দেয়া হয়েছে, যাতে এই ভয়ংকর আনন্যাচারাল রোগ সমাজে ছড়াতে না পারে। টপ ও বটম দুজনকেই হত্যা করার বিধান দেয়া হয়েছে, কেননা একজন বেঁচে থাকলেই সে আরেকজনকে প্ররোচিত করবে। ইসলামী শাসনব্যবস্থা না থাকায় এই ভয়াবহ অপরাধীদের থাবা থেকে সমাজ আজ নিরাপদ নয়। প্রতিকার সম্ভব নয় বলে আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে এই ঘাতক ব্যাধি। আমার আপনার সন্তান যেন এই অপরাধের শিকার না হয়, এই ব্যাধিতে আক্রান্ত না হয়। নোট বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে বলে আলোচনা এখানেই শেষ করছি। সমকামিতা প্রতিরোধ, কারণ, করণীয় সম্পর্কে একজন যুগসচেতন আলিমের লেখা আশা করছি। এ বিষয়ে আমার মনের কথাগুলো আমি চাই একজন আলিম বলুক। কিছু বিষয়ে কথা বললে নিজের গায়েই থুথু এসে পড়ে। আত্মসমালোচনার দিক দিয়ে উলামাদের লেখনী এ বিষয়ে আরও ভারসাম্যপূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ।

শেষকথাঃ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিখ্যাত হাদিসটা মনে আছে না তাবারানী শরীফের সূত্রেঃ হে ইবনে মাসঊদ, কিয়ামাতের আলামত ও শর্তগুলো হল— এরপর আল্লাহর রাসূল একের পর এক কিয়ামাতের আলামাতসমূহ উল্লেখ করতে থাকেনঃ

- শিশুরা হয়ে যাবে ক্ষিপ্ত, দুর্ব্যবহারকারী- বৃষ্টি হবে জ্বালাময় (এসিড রেইন)- মানুষ যোগাযোগ করবে থালার সাহায্যে (ডিশ এন্টেনা)- এজন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হবে- বাদ্যযন্ত্র থাকবে মানুষের মাথার উপর (হেডফোন)- তাদের হৃদয়ে ফিতনা প্রদর্শন করা হবে ‘ম্যাট’ এর মত (টিভি) - নেতৃত্ব থাকবে সমাজের নিকৃষ্ট লোকদের হাতে- চোরকে সাধু ও সাধুকে চোর মনে করা হবে- মুমিনকে ছাগলের চেয়েও বেইজ্জত করা হবে- তাদের চুল থাকবে ‘বুখতি উট’ এর মত (Bactrian Camel)- আধুনিক ঘোড়া কাট

ভাবার্থ বললাম, এরকম আরও কিছু লক্ষণ উল্লেখ করেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার মধ্যে একটা ছিল— আর রিজালু বির রিজাল, ওয়ান নিসাউ বিন নিসা। পুরুষ পুরুষের সাথে মিলিত হবে, আর নারী নারীর সাথে।

১৪০০ বছর আগেই নবীজীকে জানানো হয়েছিল, কওমে লুত (আঃ) যেমন অফিসিয়ালি সমকাম প্র্যাকটিস করত, ১৪০০ বছর পরে তেমনি অফিসিয়ালি আবার ফিরে আসবে সেই ঘৃণ্য পাপাচার। কী? টেনশন? টেনশন লেনেকা নেহি, স্রেফ দেনে কা হ্যায়। বিজয় ঈমানওয়ালাদেরই হবে নিশ্চিত। সে বিজয়ে আমার কী অবদান রইল, সেটাই টেনশনের বিষয়।

সুবহানাল্লাহ।

সাদাকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আলহামদুলিল্লাহি আলা দীনিল ইসলাম।

রেফারেন্সঃ

[1] https://www.webmd.com/women/features/vagina-size#1

[2] Junqueira's Basic Histology - Text and Atlas (13th Ed), Page 1031, 1034

[3] https://emedicine.medscape.com/article/1990236-overview

[4] Junqueira's Basic Histology - Text and Atlas (13th Ed), Page 709-710

[5] Daling, J., Weiss, N., Hislop, T., Maden, C., Coates, R., Sherman, K., et al. (1987). Sexual practices, sexually transmitted diseases, and the incidence of anal cancer. *The New England Journal of Medicine*, 317(16): 973–7.□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ (https://www.afao.org.au/article/gay-men-anal-cancer/#n17)

[6] https://www.cancer.org/cancer/anal-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html

[7] □ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ *International Journal of Cancer* □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ (1) De Vuyst, H., Clifford G., Nascimento, M., Madeleine, M., Franceschi, S. (2009). Prevalence and type distribution of human papillomavirus in carcinoma and intraepithelial neoplasia of the vulva, vagina and anus: a meta-analysis. International Journal of Cancer, 124(7), 1626–36.(2) Hoots, B., Palefsky, J., Pimenta, J., Smith, J. (2009). Human papillomavirus type distribution in anal cancer and anal intraepithelial lesions. International Journal of Cancer, 124(10), 2375–83.

[8] Journal of American Medical Association (JAMA) □□

[9] http://www.cancernetwork.com/gastrointestinal-cancer/anal-cancer-incidence-rising-homosexual-men

[10] http://www.captodayonline.com/Archives/pap_ngc/NGC_analrectalcyto.html

[11] https://emedicine.medscape.com/article/775407-overview#a6

[12] American Journal of Gastroenterology, published online January 12, 2016 □□ □□□□□ □□□□□□□□ https://www.reuters.com/article/us-health-analsex-incontinence-idUSKCN0VD2RH

[13] https://www.webmd.com/men/peyronies-disease#1

[14] https://www.urologyhealth.org/urologic-conditions/peyronies-disease

[15] https://nypost.com/2016/02/01/if-this-happens-to-you-youre-masturbating-too-much/

[16] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3968922/

[17] https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1034/j.1600-0412.2001.801003.x

[18] https://www.researchgate.net/figure/Recordings-of-vaginal-squeeze-pressure-measured-by-fiberoptic-microtup-transducer_fig1_286686766

[19] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK424/

[20] https://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100525094900.htm

[21] Lentz, Gretchen M. (2012). Comprehensive Gynecology (6th ed.). Philadelphia, PA: Elsevier. pp. 532–533.

[22] https://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100525094900.htm

[illegible]

SHAMSUL AREFIN SHAKTI·THURSDAY, OCTOBER 4, 2018

[illegible]

[illegible].

কমিউনিটি ক্লিনিক:
বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম প্রশংসনীয় উদ্যোগ এই কমিউনিটি ক্লিনিক। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর মাধ্যমে নির্মিত। গ্রামের কেউ জমি দেবে আর সরকার দুই রুমের একটা বিল্ডিং বানিয়ে দেবে। সরকার নিয়োগ দেবে একজন প্রশিক্ষিত CHCP বা Community Healthcare Provider. সে ২৮ ধরনের ওষুধ গ্রামের লোকজনকে প্রেস্ক্রাইব করতে পারবে। যেমন, জ্বরে প্যারাসিটামল, আমাশায় মেট্রো এই টাইপ। আমার নিজের স্টেশন থেকে (ইউনিয়ন) আরও দশ কিলো দূরে এক কমিউনিটি ক্লিনিকে গেসলাম আজকে কুষ্ঠরোগী খুঁজতে। ইউনিয়নেরও দশ কিলো ভিতরে। এখানকার অধিবাসীদের থেকে সাবসেন্টার ১০ কিলো দূরে, উপজেলা হাসপাতাল ২২ কিলো দূরে। জেলা হাসপাতাল ৪২ কিলো দূরে আর ঢাকা ৩৫০ কিলো দূরে।

এই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো এনাদের অনেক বড় খিদমত আনজাম দিচ্ছে মাশা আল্লাহ। খুব ভাল লাগল। ধন্যবাদ সরকার বাহাদুরকে। সাধারণ মানুষকে উপকৃত হতে দেখলে ভালো লাগে। নতুন ৫ জন কুষ্ঠরোগী পাওয়া গেল, ফ্রী ওষুধ পাবে। এমনও রোগী আছে যাদের এক জীবন পার হয়ে যাবে, কখনও ঢাকা শহর দেখাও হবে না। এনাদের কাছে গিয়ে সেবা দিতে দেখলেও ভাল লাগে।

বিপরীত চিত্রও আছে। গ্যাসের ওষুধ চাইতে এসেছে। জিগেস করা হল, কী সমস্যা বলেন। আমি ডাক্তার, আমি যদি মনে করি আপনার গ্যাসের সমস্যা তাহলে দেয়া হবে ফ্রী ওষুধ। যার সমস্যা নেই তাকে দিয়ে দিলে, পরে অসুস্থ লোককে কী দেব। গরীব দেশ, সীমিত সম্পদ। মার খাওয়া বাকি থাকল সেদিন। জানা ছিল না তিনি এলাকার নেতা গোছের। সরকারের সেবাদান কার্যক্রম অনেক। দুর্নীতি যদি না থাকত, সেবাটুকু পুরোটা যদি শেষ অব্দি নামত তাহলে পুরো না হলেও দুর্দশা অনেকটাই কমে যেত মনে হয়।

এখন আমি যে ওষুধ চায়, তাকেই দিয়ে দিই। ওষুধও তোমাদের, সরকারও তোমাদের, পিঠটা কিন্তু আমার। মানসম্মান দুএকটা চড়থাপ্পড় খেলে

যাবে এত কম না, তবে কী দর্কার। আর এই কমিউনিটি ক্লিনিক যার ব্রেইনচাইল্ড, নোবেল শান্তি পুরস্কার মালালা যদি পায়, সে তো আরও যোগ্য।

২.

পুঁজিবাদের একটা বড় কৌশল হল, যৌনতাকে মানবীয় প্রয়োজন হিসেবে স্বীকার না করা। তাহলে পুঁজিবাদের সুবিধা হল, ব্যাপারটাকে ট্যাবু বানিয়ে ভিতরে ভিতরে ঘুণ ধরানো যায়ঃ
১. বিয়ে পিছিয়ে দেয়া যায়
২. মেয়েদেরকে একটা বয়স পর্যন্ত জব মার্কেটে ধরে রাখা যায়
৩. বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের পর্নব্যবসা করা যায়
৪. পতিতালয় ও এসকর্ট ব্যবসার সুযোগ তৈরি হয়
৫. যৌনবাহিত রোগকেন্দ্রিক একটা ব্যবসাও আছে
৬. পুঁজিবাদের ফলে সমাজের ভগ্নদশাকে অস্বীকার করা যায়।
৭. ফ্রীমিক্সিং মানবিক ও জায়েজ করা যায়
৮. নারী শ্রমিক বাড়ানোর ও জব মার্কেটে শ্রমের যোগান বাড়িয়ে পারিশ্রমিক কমাতে মেয়েদের যে টোপগুলো দেয়া হয় সেগুলো সফলভাবে দেয়া যায়, যেমন-- নারীমুক্তি, নারীশিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন।

৩.

আমার একান্ত ব্যক্তিগত মত। ইগনোর করুন সহ্য না হলে।

১৬-২০ এই বয়সে দুনিয়ার সব মেয়েকে সুন্দর লাগে, সে দেখতে যেমনই হোক (আল্লাহর সৃষ্টি সবাই সুন্দর)। এসময় হরমোনগত কারণে মেয়েদের

ত্বকীয়মসৃণতা, টারগার প্রেসারের কারণে একটা এক্স-ফ্যাকটর থাকে যা কমনীয়তা ও ইনোসেন্স বাড়িয়ে তোলে। এই বয়সী প্রত্যেকটা মেয়েকেই এঙ্গেল-সময়-পরিস্থিতিভেদে ব্যাপক রূপবতী ও আকর্ষণীয়া লাগে। যেটা ২২ এর পর কমতে থাকে (সবার না, বেশির ভাগ। কমতে কমতে ২৮-৩০ এ গিয়ে সেই জেল্লা হারিয়ে যায় পুরোটাই। (একটা সময় গবেষণা করতেম এসব নিয়ে, অহন ভালা হয়ে গেসি, বাসায় জানে না)

বর্তমানে চোখের সামনে চারটা কেস নিকটাত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে আছে এমন। মাস্টার্স পাশ-ভাল চাকরিওয়ালা মেয়ে। অনেকে হয়ত সমাজের মানসিকতা, নারী প্রগতির অন্তরায়, হ্যানত্যান বলবেন। কিন্তু অলরেডি এস্টাবলিশড কিছু পরিবর্তনের চেয়ে নন-এস্টাবলিশড কিছু পরিবর্তন করা সহজ।

একজন যুগ্মসচিব আমাদের জেন্ডার ভূমিকার ক্লাস নিয়েছিলেন। প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকার ফেমিনিস্ট সংজ্ঞার বাইরে উনি কিছু কথা বলেছিলেন। আমার ভালো লেগেছিল। উনি বলেন: জেন্ডার সমতা, নারী অধিকার, নারী ক্ষমতায়ন, নারীশিক্ষা এসবের ইউরোপীয় ফরমেটই কেন আমাদের নিতে হবে? সুইডেন-আমেরিকার ফরমেট তো আমাদের কালচার-মূল্যবোধ-আবহাওয়া-নৃতত্ত্ব- সমাজমানসের সাথে না-ও মিলতে পারে। সব বিসর্জন দিয়ে যা নেব, তা আমাদের প্রেক্ষিতে বেনিফিট না-ও দিতে পারে। বরং আমরা আমাদের মত করে এগুলো ডিফাইন করব। আমাদের মত করে এগুলো প্রয়োগ করব।

স্যারকে সেদিন বলার সুযোগ পাইনি যে স্যার, ইসলাম ১৪০০ বছর আগে নারী স্বাধীনতা, নারী ক্ষমতায়ন, নারী উন্নয়ন, নারীশিক্ষার যে ফরমেট দিয়ে গেছে, ইউরোপ এখনও নারীকে সেই জমিদারের জীবন দিতে পারেনি। এসবের গল্প নিয়েই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২ আসছে ইনশাআল্লাহ। গতি স্লো। একটু দুআ চাই আপনাদের যাতে আল্লাহ কাজের গতি বাড়িয়ে দেন, সময়ে বারাকাহ দেন। ফেবুতে না, জায়নামাযে।

৪.

যখন ছাত্ররাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম, তখন নিজের মধ্যে ও অন্যান্য নেতাকর্মীর মাঝে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করতাম। তখন বুঝতাম না, হয়ত যারা এখনও করে তারাও বুঝে করে না। কিন্তু বিষয়টা সিরিয়াস, কতটা সিরিয়াস এখন বুঝি। আল্লাহ মাফ করুন। আমার এই পোস্ট হয়ত আমার সেই বড়ভাই, সহপাঠী ও ছোটভাইদের নজরে পড়বে। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দিন।

এমনিতেই সেকুলার ছাত্ররাজনীতির সংশ্লিষ্টদের ভিতর ৫ ওয়াক্ত নামাযী খুঁজে পাওয়া দশমিকের পর ষাটটা শূন্যের সম্ভাবনা। তার ওপর সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হল ‘আল্লাহ' শব্দটা উচ্চারণ নিয়ে একধরনের সংকোচ। সভা সেমিনারে বক্তব্য, উৎসবে শুভেচ্ছা, কিংবা লেখনীতে ‘আল্লাহ’ শব্দটা যতটা এড়ানো যায়। অমুসলিম নেতাকর্মীরা যাতে মন খারাপ বা ছোট না করে। ‘আল্লাহ’ শব্দটা নিজেকে আবার সাম্প্রদায়িক করে ফেলে কি না, অমুসলিমরা আবার মন খারাপ করে কি না। এজন্য ‘আল্লাহ' শব্দের চেয়ে স্রষ্টা/সৃষ্টিকর্তা/ সর্বশক্তিমান/God শব্দটা সেফ। স্রষ্টা আমাদের সহায় হোন। সৃষ্টিকর্তা আমাদের কবুল করুন। সর্বশক্তিমানের কৃপায় আমরা সফলভাবে সুসম্পন্ন করেছি। May God accept our good deeds.ইত্যাদি। আমি ‘আল্লাহ’ ভেবেই বললাম, হিন্দুরা ত্রিমুখী ‘ব্রহ্মা’ ভেবে নিক, খ্রিস্টান কেউ থাকলে মরণশীল মানব ‘যীশু’কে ভেবে নিক। আমার দুনিয়াও কামিয়াব, আখিরাতও কামিয়াব। অথচ আপনি কালিমা শাহাদাতের সাক্ষ্য দেয়ার দাবি করেন। আপনি একথা স্বীকার করার দাবি করেন যে, যীশু-কৃষ্ণ-ব্রহ্মা এরা কেউ সৃষ্টিকর্তা নয়, স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)। তাহলে আপনি এটা কী বললেন? আল্লাহকে স্রষ্টা সাক্ষ্য না দিয়ে আপনি

অস্পষ্ট করে দিলেন 'আল্লাহ' শব্দটা লুকিয়ে? নিজের ঈমানকেই, কালিমাকেই লুকিয়ে ফেললেন শব্দের প্যাঁচে?

কুফর আর ঈমানের মাঝে কোন ধোঁয়াশা নেই, ভাই। এমন ধোঁয়াশা সৃষ্টিকারী শব্দ থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। যে শব্দ ব্যবহার করে আপনি শব্দটির মধ্যে গুণটির মধ্যে (স্রষ্টা গুণ) আরও কিছু শরীক করে দিলেন, শব্দটির শরীকানা সাব্যস্ত করে দিলেন, শরীক ভাবার সুযোগ করে দিলেন, আল্লাহ অবশ্যই সেসব মিথ্যা স্রষ্টার থেকে মহাপবিত্র। অবিশ্বাসীরা কী ভাববে এজন্য ‘আল্লাহ’ শব্দ ব্যবহারে আপনি লজ্জা পেলেন, সংকোচ অনুভব করলেন। ভাবা যায়? একই সাথে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দাবিও করলাম, আবার মুখে ‘স্রষ্টা’ শব্দে শরীকানার সুযোগ দিলাম এবং ‘আল্লাহ’কে স্বীকৃতি দিতে সংকোচ বোধ করলাম। যত সহজে ‘সৃষ্টিকর্তা' বলে জেনারেলাইজ করে কাফিরদের মন জয় করে ফেললাম, বিষয়টা কিন্তু অত সহজ না। ঈমান-কুফরের বিষয়, কোন ধোঁয়াশা মনে কিংবা মুখে রাখা যাবে না। কোন কনফিউশন রাখা বা বলা যাবে না। সুষ্পষ্ট শব্দে কালিমা ঘোষণা করার নামই ঈমান, বিপরীতের নাম কুফর। দুয়ের মাঝে কিছু নেই। ঈমানের সাথে জীবনভর আমলের সাথে এক বুঁদ কুফর ‘আখসারীনা আ'মালা', জীবনের সব আমল নষ্ট করে দেয়, সব। আমি ভাবছি আমি মুসলিম, অথচ আল্লাহর খাতায় আমি কাফির না তো?

সব প্রশ্নে আপোষ চলে, এই ঈমানের প্রশ্নে আপোষের নামও কুফর। বরং আরও খারাপ, মুনাফিক বলা হয় তাকে। কাফিরের চেয়েও শাস্তি বেশি। সুতরাং কোন সংকোচ নয়, স্পষ্ট শব্দে সব জায়গায় বলুন, আমার রব ‘আল্লাহ’। বলুন, সৃষ্টিকর্তা ‘আল্লাহ’। স্পষ্ট করে বলুন। ব্রহ্মা- যীশুর সুযোগই নেই ভাবার, স্রষ্টা একমাত্র ‘আল্লাহ’। সর্বশক্তিমান ‘আল্লাহ’। বলুন, May Allah bless you. কাফির তো এমনিই ধ্বংস, তাদের মন যুগাতে গিয়ে নিজে বরবাদ হবেন না। এমনিতেই নামায পড়ছেন না, মাফ হতেও পারে, সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ‘আল্লাহ’ বলতে লজ্জা পেলে হপে বাইয়া? কবরে প্রশ্ন হবে: মান রব্বুকা? তোমার রব কে? তখন স্রষ্টা,

সৃষ্টিকর্তা, God এসব পলিটিক্যাল টার্ম ইউজ করলে খবর আছে। স্পষ্ট বলতে হবে, রাব্বী আল্লাহ। মোচড়ামোচড়ি করলে কী হবে আর ভাবা যায় না। বেঁচে থাকতে ‘আল্লাহ’ বলা অভ্যাস না হলে ঐ ভয়াবহ কন্ডিশনে মুখে আসা টাফ। যেমন মেডিকেলের ভাইভা দিয়েই বুঝে আসে। বলে বলে প্র্যাক্টিস না হলে শাহনাজ ম্যাম, শিবলী স্যারের সামনেই জবানে আসে না। আর মুনকার-নাকীরকে দেখাটাই একটা আযাব। সেখানে জবানে আসার কথা চিন্তাই করা যায় না। সুতরাং সাবধান ভায়েরা আমার।

লাস্টলি, ৫ ওয়াক্ত নামায ছাড়বেন না। রাজনীতি করছেন করেন। নামায হল ঈমানের হেফাজত। আলিমরা বলেন, নামায ত্যাগকারীর কাফির হয়ে মরার সম্ভাবনা আছে। উপরের আলোচনায় তো দেখলেনই কীভাবে ধাপে ধাপে কাফির হবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহর নাম নিতেই লজ্জা লাগছিল। এজন্য ৫ ওয়াক্ত নামায ছাড়বেন না। তাহলেই ঈমান নিয়ে কবরে যাবার একমাত্র সম্ভাবনা।

সংগঠনের সাবেক সদস্য হিসেবে কিছু কথা পেশ করলাম। এ কথাও কারো খারাপ লাগলে নিশ্চিতভাবে নিজের ঈমান নিয়ে সন্দিহান হতে পারেন। আমি কোন বিতর্কিত বিষয়ে কথা বলিনি। ইসলামের পয়লা টপিক নিয়ে বলেছি যা পার না হলে ইসলামে আসাই যায় না। নতুন করে কালিমা পড়ার প্রয়োজন হতে পারে। কোন আলিমের শরণাপণ্ন হোন। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।

৫.

আমার এক নাস্তিক বন্ধু ছিল, আরবি নামের। ইন্টার্নশিপে দুজন একসাথে নাইট ডিউটি করছিলাম। আগে কখনো এতক্ষণ কথা হয়নি, হলে থাকতো না। লাইব্রেরিতে পড়ত রাত অব্দি, এরপর বাসায় চলে যেত। ছাএলীগের পয়লা সারির নেতারা সাধারণত লাইব্রেরি কি, কেমন দেখতে, মেডিকেলের

বই না গল্পের বই থাকে, এসব খুব একটা জানে না। তাই ওর সাথে আমার পুরো ৫ বছরে হাতে গুনে দেখা হয়েছে। ইন্টার্নির শিশুবিভাগে ঐ রাতে ওর সাথে আমার অনেক কথা হয়। নতুন হুজুর বলে ওর সব জবাব আমার কাছে ছিলো না, আর ও জবাব চেয়ে প্রশ্নগুলো করেওনি। যা হোক যেটা বলার জন্য ওই রাতের কথা পাড়লাম, সেদিন ও আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিল।

- আচ্ছা পৃথিবীর রাজনীতি এখন যেভাবে এগোচ্ছে, তোর কি মনে হয়, সামনে কী কী হতে পারে?
- সামনে কি হবে তা তো বলা যায় না। তবে আমাদের নবীর কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যেগুলো আমরা বিশ্বাস করি। আমিও ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এমনটাই হবে বলে মানি।
- কেমন বল তো শুনি।
আমি ইমাম সাহেবের আগমণ সম্পর্কে যে ক'টা হাদিস জানতাম ওকে বললাম। ও চুপ করে শুনলো, কোন বাধা দেয়া ছাড়াই। তারপর ও বলল,
- আমারও তাই মনে হয়। এই একমেরু বিশ্বরাজনীতি চলবে না। দ্বিমেরু আসবে আবার। নিষ্পেষণ চরমে পৌঁছলে নিষ্পেষিতদের মধ্যে একজন নেতা দাঁড়িয়ে যান, ক্যারিশমাটিক নেতা, যার মুখের কথায় ইতিহাস বদলে যায়।। স্পার্টাকাস থেকে শুরু করে লেনিন, হিটলার, ক্যাস্ট্রো, ম্যান্ডেলা,গান্ধী কিংবা বঙ্গবন্ধু। ইতিহাস এই প্যাটার্নটাই ফলো করে। আমারও মনে হয় সামনে মুসলিমদের একজন নেতা তৈরি হবে। দ্বিমেরু বিশ্বরাজনীতি তৈরি হবে।

জানি না দুআটা করা যায় কি না। মুরতাদদের জন্য দুআ করা নিষেধ জানতাম। আমি দুআ করি আল্লাহ সকল নাস্তিক শাতিম ইসলামবিদ্বেষীকে লম্বা হায়াত দান করুন। শতায়ু হও তোমরা। দেখে যাও সেদিন। যেদিন করজোরে কাঁপতে কাঁপতে তোমাদের আশ্রয়দাতারা ফিরিয়ে দেবে তোমাদেরকে দ্বিতীয় মেরুর হাতে। আমি হয়তো দেখবো না, কিন্তু তোমরা নিজের চোখে সেইদিন নিজের বিচার দেখে যাও। আল্লাহ তোমাদের সুস্থ সবল নীরোগ লম্বা হায়াত দিন।

ক্যাডেট কলেজে আমার সবচে' প্রিয় শিক্ষক ইতিহাসের জনাব হেদায়েতুন্নবী স্যার বলেছিলেন:
ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা এই যে, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না।

৬.

কুরবানির ছবি তোলা ও ফেবুতে দেয়া একসময় নিষেধ করতাম এখন আর করিনা। বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডে এটার একটা ইফেক্ট আছে। যেমন ওরা আমাদের একটা ট্যাগ দিয়ে আমাদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়। আমাদের এই আনন্দ, আনন্দ শেয়ার করা, আনন্দ দেখানো প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে দুর্বল করে। রিয়ারও কিছু দেখি না। কমবেশ ফেবু বন্ধুরা সবাই কুরবানি আদায় করছেন। দাম বলে পার্ট না নিলেই হল। কাল ফেবু ওয়ালে আনন্দ দেখতেই চাই।

৭.

তাকাব্বাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম। আল্লাহ, রাসূল ও দীনের লাইগ্যা নিজের প্রিয়বস্তু (?) কুরবান করার জন্য পোস্তুত তো? সূরা তাওবা: আয়াত ২৪

১. জীবন
২. সন্তান
৩. মাতাপিতা
৪. ভাইবেরাদার
৫. ব্যবসা যাতে মন্দার ভয় আছে (জীবিকা)

৬. বাড়িঘর যাতে থাকা পছন্দ করি (গৃহী জীবন)
৭. স্ত্রী
৮. ধনসম্পদ

এ পর্যন্ত এই ৮ টার কোনটা কুরবান করেছি। আর কোন কোনটা করার জন্য তৈরি আছি? নাহলে অপেক্ষা কর আযাবের। কঠিন আযাব। আরাকান, সিরিয়া, ইরাক, পূর্ব তুর্কিস্তান...

৮.

খচখচঃ

এই উম্মাতের কুরআন শেখার বিকল্প নাই। শিখতেই হবে। শুধু তিলওয়াত শেখার কথা বলছি না। কুরআনের আহকামাত, এই কুরআন আমাকে কী বলে, আমার কাছে কী চায়, এটা শেখার কথা বলছি।

দীন সম্পর্কে উদাসীন বৃহত্তর অংশের কথা বাদ দিলাম। আমরা যারা নিজেদের দীনদার মনে করি/দাবি করি, আমরাও কুরআন শেখা বলতে নাজেরা পড়াকেই মনে করি। নিজে বা সন্তানকে এটুকু শিখোবার বন্দোবস্ত করেই আত্মতৃপ্তিতে ভুগি।

অনেকে যারা ব্যাপারটা উপলব্ধি করি, তারা একটা প্লেইন অনুবাদ নিয়ে বসে পড়ি। বা বড়জোর একটা টীকাসহ অনুবাদ কিংবা সংক্ষিপ্ত তাফসীর। কিন্তু এর রিস্ক আছে। নিজের মত করে বুঝার বা আংশিক বুঝার একটা প্রবণতা দেখা যায়।

যেমন, নিজের উদাহরণ দিই। প্রথম পড়ি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের তরজমাটা।
এরপর পড়ি তাফসীরে উসমানী। মাআরেফুল কুরআন সংক্ষিপ্তটা কিছু কিছু

সূরা জায়গা জায়গা থেকে। রিস্কটা বুঝানোর জন্য বলছি। চোরের হাত কেটে দাও। এই আয়াতটার অর্থ জানাটাই যথেষ্ট না। এসংক্রান্ত হাদিস ও মাসআলাগুলো না জানলে আয়াতকে ভুল বুঝা বা বেশি কঠোর মনে হবার সম্ভাবনা আছে। পরে হিদায়া অনুবাদ পড়ার পর পুরোটা বুঝে এল। দশ দিরহামের কমের জিনিসে কাটা যাবে না, দুর্ভিক্ষের সময় চুরি করলে কাটা যাবে না, অরক্ষিত জিনিস চুরি হলে কাটা যাবেনা, অনেক বস্তু আছে পরিত্যক্ত / মূল্যহীন, বা যা চুরি হয়েছে তাতে চোরের প্রাপ্য থাকলে কাটা হবে না। কিন্তু ঐ সময় দিলে খচ করে উঠেছে, তা করত না যদি কেন আলিমের কাছে তাফসীর বা তরজমা পড়তাম। উনি তরজমার সাথে প্রাসঙ্গিক মাসআলা-হাদিস বলে আয়াতের উদ্দেশ্য-অর্থ ক্লিয়ার করে দিতেন। এতো গেল একটা, এমন আরও আয়াত আছে যা আংশিক বুঝলে বড় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। এজন্য আলিমগণ একা একা তাফসীর পড়াকে নিরুৎসাহিত করেন। শুধু তরজমা পড়ার বিপদ আরও বেশি। একা একা না পড়াই উচিত, আমি একমত। নিজেকে দিয়ে বুঝেছি।

কিন্তু কুরআন না শিখেও তো উপায় নেই। আল্লাহর অনেক হুকুম আছে, তাওহীদের অনেক ঐক্যমত বেসিক বিষয় আছে যা এখন সুরেলা ওয়াজ তো দূরে, আম খুতবা বা মজলিসে বয়ানের সুযোগ নেই। অনেক ফরজে আইন- ফরজে কিফায়া হুকুম আছে যার ওয়াজ লেকচারে আলোচনার সুযোগ নেই। এমন অবস্থা যেন সেগুলো কুরআনে নেই-ই। এজন্য শিক্ষিত অংশটাকে অবশ্যই কুরআনমুখী হতে হবে। শতভাগ মানতে না পারলেও জানতে হবে, না মানার আফসোস থাকতে হবে। নয়তো জবাবদিহি আছে। শতভাগ দীন জানতে হলে কুরআন শেখার আর কোন বিকল্প নেই। কেননা দীনের কিছু অংশের জন্য ওয়াজ-নসীহতের পথ বন্ধ।

আবার একলা শেখারও বিপদ আছে। এখন কীভাবে আলিমগণের তত্ত্বাবধানে ব্যাপকভাবে কুরআনের চর্চা করা যায় সেটার ফরমেট বানানো দরকার। অনলাইন-অফলাইনে। Online Islamic Study Panel নামে একটা গ্রুপে ক্ল্যাসিকাল তাফসীর পড়ছি শাইখ Munirul Islam Ibn Jakir হযরতের

নিগরানীতে। এমন আরও গ্রুপ হওয়া চাই। আর অফলাইনেও রোজ কিছু সময় মসজিদে কুরআনের হালাকা আয়োজন করতে পারেন।

আরেকটা জিনিস হয় কি না। পা পিছলানোর জায়গা গুলো নিয়ে একটা কিতাব হল। সেটা সবাই তাফসীর পড়ার আগে পড়ে নিলাম। বা তাফসীর পড়ার সাথে কাছে রাখলাম। বা সেই জায়গাগুলোতে নিকটস্থ আলিমের সাহায্য নিলাম।
আগেই জানা থাকল, কোথায় কোথায় অবশ্যই আলিমের শরণাপণ্ন হতেই হবে।
এমন একটা কিতাব হতে পারে কি না।

৯.

গত কিছুদিন যাবৎ ফেসবুকে শুধু ভাঁড়ামোমূলক পোস্ট দিচ্ছি।
বন্ধুরা অনেকেই বিরক্ত হচ্ছেন। কিসু করার নাই ভাইয়া। অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর, ততোধিক শোকে বাঁদর।

কিছু কিছু হাসির মাঝে অসহায়তা লুকিয়ে থাকে। অক্ষমতা ঢাকার চেষ্টা ছুপানো থাকে। লজ্জার মাথাটা গিলে খেয়ে হাসতে হয়। যারা বেশি হাসে তাদের গোপন গভীর ক্ষত থাকে। না বলা যন্ত্রণায় মুখব্যাদানকে আপনারা হাসি দেখেন।

ইদানীং গভীর কিছু ভাবি না। যদি ভাবনার গহীনে ডাক দিয়ে ওঠে নতুন কোন অসহায় টপিক, অক্ষম আমাকে তিরস্কার করে ওঠে নতুন কোন অসহ্য সুন্দর। তাই আর ভাবি না। মরে যাক ভাবনারা, মরে যাই আমরা। সেই ভালো।

১০.

ক্যাডেট কলেজের ফাজিল পোলাপান আমার রসবোধ ছিনিয়ে নিয়েছে। সেখানে খুব সতর্ক হয়ে সবাইকে জোকস করতে হতো। যেকোন জোকস করলে বেরসিক বন্ধুরা অপমান করতে এক সেকেণ্ড দেরি করতো না। ধরেন আপনি জোকস করলেন, ইচ্ছে করে হা হা খ্যা খ্যা করে সবাই মিলে হেসে আপনাকে ডাউন করে দিবে। বা সবাই মিলে 'অ্যা' সাউণ্ড করে আপনার ফানি মুডটাই অফ করে দেবে। বজ্জাত ছ্যাড়ারা। এজন্য যেকোন জোকসে হাসি আসেও না ঠিকমত এখন আর।

এই বইটা (হুজুর হয়ে) অস্থির। বিশেষ করে যাদের পরিচয় আছে ক্যারেক্টারগুলোর সাথে। চলচ্চিত্র কল্পনা করে ভয়ংকর মজা পেয়েছি। ওনারা এই হাসি তামাশার ফাঁকে ফাঁকে দীনী নানান বিষয় শিখিয়েছেন। তাওহীদ-শিরক-বিদআত-বর্তমান প্রেক্ষাপট দারুণ। এভাবে প্রতিটি উপলক্ষকে ব্যবহার করুন দীনী চেতনা ছড়িয়ে দিতে। দীনের অবস্থান, সৌন্দর্য্য, বাস্তবভিত্তিকে প্রেজেন্ট করুন সম্ভাব্য সকল উপায়ে। বইটা আমাকে হাসিয়েছে- ভাবিয়েছে-শিখিয়েছে- অনুপ্রাণিত করেছে ভীষণভাবে। হাসিতামাশাকেও দাওয়াহর মাধ্যম বানানো যায়, ধারণাতীত ছিল।

আল্লাহ ওনাদের কবুল করুন। আরও এমন খিদমত উম্মাতের সামনে পেশ করার তাওফীক দিন। আমাদের হায়াতের দ্বারা যেন দীনের ফায়দা হয়, আমাদের মওত দ্বারাও যেন দীনের ফায়দা হয়। অহেতুক হায়াত ও মওত থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। আমীন।

১১.

ক.
ফাউন্ডেশন ট্রেনিং-এ একজন যুগ্মসচিব সেশন নিচ্ছিলেন। উনি ওনার একটা ট্রেনিং-এর অভিজ্ঞতা শেয়ার করছিলেন, সিঙ্গাপুরের।

১৯৬৫ এর আগস্টের এক সকাল। আকাশ ভেঙে পড়ল সিঙ্গাপুরের জনগণের মাথায়। অধিবাসীরা জানল, মালয়েশিয়ান ফেডারেশন থেকে বের করে দেয়া হয়েছে তাদেরকে। বাধ্যতামূলকভাবে স্বাধীন করে দেয়া হয়েছে। প্রধান নেতা লি কুয়ান প্রেস কনফারেন্সে কাঁদতে কাঁদতে বলল: "আজকের এই মুহূর্ত আমার কাছে অসহনীয়। সারাটা জীবন আমি একত্রীকরণের স্বপ্ন দেখেছি। আজ কীভাবে আমি সহ্য করব?"। একটা নগর রাষ্ট্র, ফসলী জমি নাই, খনিজ নাই। কীভাবে রাষ্ট্র চলবে ভেবে পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই সিঙ্গাপুর আজ কোথায় চলে গেছে। আমাদের মাত্র ৬ বছর আগে স্বাধীন হয়েছে। অথচ, আমাদের সবই ছিল।

স্যার বলেন: আমরা এয়ারপোর্টে নামলাম রাত দুটোয়। নেমে একটা ক্যাব নিয়ে হোটেলের দিকে রওনা দিলাম, সাথে গাইড। সিগন্যাল পড়ল। আমাদের ট্যাক্সি দাঁড়াল, কিন্তু কোন গাড়িটাড়ি ক্রস করলো না, খামোখা সিগন্যাল। যখন সবুজ হল, আমাদের ক্যাব ছাড়লো, আমি জিগেস করলাম, তুমি তো না থামলেও পারতে, যেহেতু ডান-বামে কোন গাড়ি ছিলোনা, সোজা চলে যেতে পারতে। ড্রাইভার শোনালো আজব কাহিনী। ওদের দেশে নিয়ম হল, কেউ যদি অটোকন্ট্রোলড সিগনাল না মানে, পুলিশের উপর নির্দেশ সরাসরি গুলি। কেউ জানবে না কোথা থেকে গুলি এলো, কোথায় আছে পুলিশ। আইন করার পর থেকে এখন পর্যন্ত একজন ড্রাইভারকে গুলি করতে হয়েছে, তাও মরেনি।

খ.
নতুন একটা দেশের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হল 'দুর্নীতি'। সিঙ্গাপুর খুব সফলভাবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। এর পিছনের ঘটনা হল, লি কুয়ান সরকারি আমলাদের কাছে বেতন স্কেল চেয়েছেন। আমলারা নিজেদের

চাহিদা মত বেতন স্কেল করে দিয়েছে।
- এটা হলে তোমাদের মাস চলবে তো? নাকি আরও লাগবে?
- এতেই চলবে।
- এর দ্বিগুণ বেতন দেব তোমাদের। কিন্তু দুর্নীতি পেলে মৃত্যুদণ্ড।

গত ৫৩ বছরে ২/৩ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে।

গ.
আইনের উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে প্রথমে। আইনের উদ্দেশ্য কি অপরাধীর সাজা? নাকি অপরাধ হতে না দেয়া? অপরাধীর সাজা দিয়ে তো ক্ষতি উঠে আসবে না। খুনীকে ফাঁসি দিয়ে তো নিহতকে বাঁচানো যাবে না। বরং ফাঁসি যেহেতু কাউকে দিতেই হচ্ছে, এমনভাবে দেয়া চাই, যাতে আরও দশটা পটেনশিয়াল খুনী সতর্ক হয়। অপরাধ নিয়ন্ত্রণ হল উদ্দেশ্য, অপরাধী নিয়ন্ত্রণ নয়। ব্রিটিশ মনমানস থেকে আমরা আর বেরোতে পারলাম না। আইন হতে হবে কঠোর। শুনতে যেন কঠোর শোনা যায়, কিছুটা অমানবিকও (!) হওয়া চাই। কেননা শাস্তিটা মানবের হচ্ছে না, হচ্ছে অপরাধী এক পশুর। তাই আইন কখনো মানবিক হবে না, আইন হবে পাশবিক। শুনলে যেন ভয় লাগে, ওরে বাবা। শুনতেই যদি জানের পানি না শুকায়, তাহলে করতেও ডাল-ভাত মনে হবে। আর শুনতেই যদি ভয়ঙ্কর লাগে, তাহলে প্রয়োগও কম করতে হবে। আর আইন যদি হয় দু'পাঁচ বছর বসে বসে খাওয়া, তাহলে তো...

ঘ.
আসল যে কথা বলার জন্য পোস্ট লেখা শুরু করেছিলাম সেটা ভুলে গেছি। পরে মনে পড়লে বলবোনে।

১২.

বিরক্ত না হয়ে পড়তে থাকুন। নিচে সোনাদানা আছে মে বি।

মুফতি তালহা সাহেব। বয়েসে আমার চেয়ে হয়ত ছোটই হবে, এই পঁচিশ-ছাব্বিশ। আমার সাথে পরিচয় বেশিদিন না, তবে সম্পর্ক অনেকদিনের। আমার শ্বশুরমশাই আরব জামাতের সাথে চিল্লায় ছিলেন আমার মহল্লাতেই, ঐ জামাতে ১ সালের সফরে ছিলেন তিনি। সেই থেকে পরিচয়। যতই তাঁকে নিয়ে ভাবি, অবাক ছাড়া আর কিছু হইনা।

ঐ সফরের পর ৬০ দিনের জামাত নিয়ে উনি চুয়াডাঙ্গা আসেন। একদম গ্রামের আনপড় কিছু মানুষ, তাদের জিম্মাদারি নিয়ে চলতে হয়েছে এক-দুই না ৬০ দিন। এটা যারা তাবলীগে সময় দিয়েছেন, আমীরের দায়িত্ব পেয়েছেন, তারা বুঝবেন। ২০ জনের ২০ রকম রুচি, এটিটিউড, ইখতিলাফ, ঝগড়া, সমস্যা সব ম্যানেজ করে রাখা, আবার দীন শেখানো, দাওয়াত শেখানো, রুটিন গ্রুপওয়ার্ক করানো সব আঞ্জাম দেয়া চাট্টিখানি কথা না। আমি যেহেতু তখন কাছাকাছি থাকতাম, আমাকে বার বার বলতেন একটু আসতে, সাথীদেরকে একটু বুঝাতে। আমি দুনিয়ার আঠা থেকে ছুটে একদিনই যেতে পেরেছিলাম। কী খুশি তার চোখে মুখে।

পরের সফরে আবার চুয়াডাঙ্গা, আরব জামাত নিয়ে এসেছেন। আমার অবাক হবার পালা এখন। আমাকে ডাকলেন, আমি দুনিয়ার আঠা ছুটিয়ে গা-টা ছিলে হাজির হলেম। গত সফরের ভয়ংকর ৬০ দিনে উনি একটা বিরাট কাজ করে ফেলেছেন, আল্লাহ উনাকে দিয়ে করিয়েছেন। চুয়াডাঙ্গার ১ নম্বর বয়েজ হাইস্কুলের নাম ভি.জে.স্কুল। সারা চুয়াডাঙ্গার পিএসসি-তে টপ করা ছেলেগুলো এখানে পড়ে। উনি সেই স্কুলের ক্লাস নাইনের এক ছেলেকে পেলেন, যে জেএসসি পর ১ চিল্লা দিয়েছে। এবার মুফতি তালহা ফিকির করা শুরু করলেন। সেই ছেলের রাহবারিতে ভি.জে. স্কুলের ক্লাস নাইনের (বর্তমান টেন) রোল ১ থেকে ২০ ছেলেগুলোর কাছে গেলেন, একদম বন্ধু হয়ে গেলেন। আড্ডা-গল্প-খাওয়াদাওয়া। দীনের দাওয়াত। এই ছেলেগুলো সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট মসজিদে একত্রিত হয়। এমন একটা জমায়েতে

আমি গিয়েছিলাম। তারা এটাও জানে না মুফতি তালহা একজন মুফতি। উনি জানাননি যাতে দূরত্ব না হয়, যেন ওনাকে জাস্ট একজন বড়ভাই-ই মনে করে। আমি গিয়ে আবিষ্কার করলাম—

১. তারা সবাই আগের সপ্তাহে জমায়েত থেকে এই জমায়েত পর্যন্ত ৭ দিনে ৩৫ ওয়াক্ত নামাযই পড়েছে। দুএকজনের দুই-তিন ওয়াক্ত কাজা হয়েছে, তবে কাজাও পড়ে নিয়েছে।

২. সবাই টাখনুর উপর কাপড় পরে। মুফতি সাহেবই নিষেধ করেছে কাটতে, ভাঁজ করে পরে।
কাটলে বাবা মায়ের তরফ থেকে প্রতিকূলতা আসতে পারে।

৩. কেউই গান শোনে না। মুফতি সাহেব রিপোর্ট চাইলেন, এই সপ্তাহে কে কোন গুনাহ ছেড়েছো। সবাই এটার কথা কমনলি বলেছে। আরও নানান গুনাহ ছাড়ার কথা বলেছে।

৪. সবাই পরের সপ্তাহে নজরের হিফাজত করবে বলে সংকল্প করল। এবং রিপোর্ট দেবে।

৫. সবাই একজন করে বন্ধুর দায়িত্ব নিল যারা এখানে আগে আসেনি। তাকে আনবে এবং মনিটর করবে তার নামায ইত্যাদি।

৬. এসএসসি পরীক্ষার পর সবাই ১ চিল্লার জন্য বের হবে ইসলামী লাইফস্টাইলে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য। এজন্য অধিকাংশই মাটির ব্যাংক কিনেছে এবং রোজকার খরচ, ঈদের সেলামী থেকে টাকা জমাচ্ছে। যারা এখনও করেনি তারাও সংকল্প করেছে। কেউ কেউ গীটার কেনার জন্য টাকা জমাচ্ছিল, সেটা ব্যাংকে দিয়ে দিয়েছে।

৭. সামনের ছুটিতে সবাই ৩ দিনের জন্য জামাতে বের হবে।

৮. দুই সেকশনের ফার্স্টবয়দের উপরেই পুরো মেহনত চালানোর ও পরের সপ্তাহে একত্রিত হবার দায়িত্ব। সেই সাথে নিচের ক্লাসের ১-২০ রোলের উপরে মেহনতের দায়িত্ব। তারা সবাই পড়ার পাশাপাশি এটাকে এক্সট্রা-কারিকুলার হিসেবে নিয়েছে, একটা সাংগঠনিক দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছে।

৯. জমায়েত ভাঙ্গার আগে মুফতি সাহেবের শেষ এজেন্ডাঃ ‘যে গুনাহ ছেড়েছি তা আর ধরবো না, আর যা যা আমল শুরু করেছি তার ভেতর কমবেশ হতে পারে’। সবাই সমস্বরে একমত প্রকাশ করল।

আমি মুফতি তালহার এই মেহনতে অভিভূত। এই ছেলেগুলো চুয়াডাঙ্গার সবচেয়ে ক্রিম ছেলে। রোল ১-২০। এরা একদিন দেশের বড় বড় পর্যায়ে যাবে আল্লাহ চাহে তো। এদের মধ্যে দীনের বুঝ, সুন্নাহের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা কত জরুরী ছিল। আল্লাহ মুফতি সাহেবের ফিকরকে কবুল করেছেন। একজন অস্থানীয় ব্যক্তি যদি এমন সাফল্য পান, আমরা নিজ নিজ এলাকায় মেহনত করে কেন এমন ফল পাবো না।

পরের মাসে ওরা যখন ৩ দিনের জামাতে বের হল, আমি গেলাম। মুফতি তালহাকে ওরা পাগলের মত, বন্ধুর মত ভালোবাসে। যে ছেলেগুলোর দুষ্টুমি-ফাজলামি-টাংকি মারার বয়স তারা আমাকে ঘিরে কী পরিমাণ তৃষ্ণা নিয়ে সাহাবীদের কুরবানি আর বীরত্বের ঘটনাগুলো শুনেছে আমি আপনাদের বুঝাতে পারব না। আমি পুরো একদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাদের সাহাবীদের কাহিনী শুনাতে বাধ্য হয়েছি। ঘুমাবে না, গভীর রাত অব্দি শুনবে। আর বাবামায়ের খিদমত আর তাদের দুআ আমাদের জন্য কত জরুরি এটা বুঝালাম। আর পড়াশুনা করতে বললাম, ভালো রেজাল্ট করলে সবাই আমাদের এই কাজের প্রতি আগ্রহী হবে, পরের ব্যাচগুলোতেও এর প্রভাব পড়বে। তারাও দীনের দিকে ঝুঁকবে। আর রেজাল্ট খারাপ হলে সবাই আমাদের এই কাজকেই দোষ দেবে, পরের ব্যাচও আর আগ্রহী হবে না—এইসব হাবিজাবি বুঝালাম। আমি অফিসের ব্যস্ততায় ফেরত চলে এসেছি দু’দিন থেকে। তাদের চোখে যে আগ্রহে ছেদ পড়ার কষ্ট আমি দেখেছি, তাও কী দিয়ে বুঝাব। আমি অভিভূত।

এখন শোনেন আমি কেন এই কাহিনী শোনালাম। আমার বন্ধুরা তো সবাই তাবলীগের না, অনেকে মারাত্মক বিরোধীও। তাবলীগের ফরমেট বাদ দেন। আমরা সবাই কি পারি না, আমার নিজের একটা সার্কেল বানাতে। আমার আখলাক, আমার আন্তরিকতা দিয়ে সমবয়সী বা জুনিয়র বা নানাবয়েসীদের সমন্বয়ে এমন একটা ১০-২০ জনের দীনী সার্কেল আমার মহল্লায় বানাতে, সেজন্য মেহনত করতে। পারি কি না? কিছু বেতলব, উদাসীন মানুষকে

দীনসচেতন করতে? তাবলীগের ফরমেট পছন্দ হয় না, বাদ দেন। নিজ মহল্লায় একটা ফরমেট বানান, যেটা আস্তে আস্তে বাড়বে।

আমার আগের হালাকার আমীর ইঞ্জিনিয়ার ফরীদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, ‘মারকাজ (কেন্দ্র) আবার কী? দাঈ প্রত্যেকে একেকটা মারকাজ, মানুষ দাঈর মধুতে আকৃষ্ট কয়ে তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে’। এক সাহাবী নবীজীর দরবারে ছুটে এসেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার কিছু ভালো লাগে না আপনাকে ছাড়া। আপনার দরবারে যতক্ষণ থাকি, আমি আনন্দে থাকি। আর যখন ব্যবসায় বা পরিবারের কাছে যাই আমার প্রাণ মানেনা। আমি ছটফট করি যতক্ষণ না ছুটে এসে আপনাকে একনজর দেখে না নিই। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এখন না হয় আমি মন চাইলেই আপনাকে এসে দেখে নিতে পারি। কিন্তু আখিরাতে আপনার জান্নাত হবে কত উঁচু মর্যাদার। আর আমি জান্নাত পাব কি না জানিনা, যদি পাইও তবে কত নিচে পাব কে জানে। আমার ভয় হয় আমি তখন মনে চাইলেই আপনাকে দেখতে পাবো না। তখন আমি কীভাবে সবর করব? নবীজী এই প্রশ্ন শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। আল্লাহ সাথে সাথে আয়াত নাযিল করে বলে দিলেনঃ
“আর যে আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে নিবে, তারাও নিয়ামত প্রাপ্তদের সাথেই থাকবে অর্থাৎ নবী-সিদ্দিক-শহীদান-সলিহীনদের সাথে”। [তাবারানী আওসাত ও সগীর, রাবীদের মধ্যে সবাই সহীহ, কেবল আব্দুল্লাহ বিন ইমরান ছিকাহ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, তাফসীরে ইবনে কাসীর]

শুধু আখলাকের দ্বারা এমন পাগল করে দেয়া যায় মানুষকে। আপনার জন্য সবাই পাগল হয়ে থাকবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা দাসদের কিনে কিনে আজাদ করছো ভালো কথা, কিছু উত্তম ব্যবহারের দ্বারা আজাদ লোককে কেন দাস বানাচ্ছো না? ভালো ব্যবহারের দ্বারা সবাই আপনার গোলামে পরিণত হবে। আপনার জন্য পাগল হয়ে যাবে। আল্লাহর জন্য। আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য

শত্রুতা- ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। করতে পারিনা সবাই নিজ নিজ মহল্লায়?

যে যেই মানহাজেই থাকি না কেন সমস্যা নাই। একটা পিক দিলাম, দেখেন মিসর থেকে বিতাড়িত ইখওয়ানের সদস্যরা কাফির দেশে গিয়ে কী মেহনতটা করেছে, মাশাআল্লাহ। যদি আপনারা আমার এই বার্তাটা উপলব্ধি করতে পারেন তাহলে পরের পোস্ট/নোটে একটা রাফ কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে পারি। আর যদি এই পোস্টেও ‘তাবলীগ বিদআত, শিরক’— এটা ছাড়া আর কিছুই নজরে না আসে, আর কিছুই নেয়ার মত না পান, কোন উদাহরণই না পান, আর কোন মন্তব্যই করার না পান, তাহলে এ পর্যন্তই থাক। তবে আমি বুঝি এখন এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আমাদের দরকার মুফতি তালহার মত ৬০ হাজার মানুষ, প্রতিগ্রামে একজন। নিশ্চয়ই এ দীন বিজয়ী হওয়ার জন্যই এসেছে কনফার্ম। শুধু এটাই দেখার বিষয় যে, এই নিশ্চিত বিজয়ে আমার-আপনার ভূমিকা কতটুকু। আল্লাহ আমাদের হাওয়ারী ও সাহাবীগণের মত আনসারুল্লাহ হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

১৩.

ফোনে প্রথম পরিচয়

- আপনার বইটা দারুণ লেগেছে। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। মাশাআল্লাহ
- আলহামদুলিল্লাহ । আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন।
- তো আপনি দীনের পথে কিভাবে এলেন?
- জি, তাবলীগের মাধ্যমে।
- বুঝতে পেরেছি। তো আপনি কি এখনও তবলীগের চিন্তাভাবনাই লালন করেন?
- জি আলহামদুলিল্লাহ । তবে দৃষ্টিভঙ্গি ও জানার পরিধি আরও

প্রসারিত।
- আপনি কি কুরআন ও সুন্নাহকেই দলিল মনে করেন তো, তাই না?
- জি অবশ্যই। কুরআন সুন্নাহর সাথে ইজমা ও কিয়াসও শরীয়তের দলিল।
- দেখেন কুরআনে ৯১ জায়গায় ইজমা কথাটা এসেছে ইউসুফ নবীর ১০ ভাই ইজমা করে তাকে কুয়োয় ফেলে দিয়েছে। তাহলে ইজমা খারাপ বিষয়েও হতে পারে। তাই ইজমা শরীয়তের দলিল না। তবে হাদিসে এসেছে ইজতেহাদ শরীয়তের দলিল। ঠিক হলে ২ সওয়াব, ভুল হলে ১। কিন্তু ইজমা শরীয়তের দলিল না।
- আপনার বোধ হয় একটু ভুল হচ্ছে 'ইজমা' শব্দটা নিয়ে। ভিন্ন ভিন্ন আলিমের আলাদা আলাদা ইজতেহাদ যখন কোন ইস্যুতে মিলে যায় তখন সেই সম্মিলিত ইজতেহাদকেই 'ইজমা' বলে। আভিধানিক না নিয়ে পরিভাষা হিসেবে বুঝেন। কোন আলিমের একক ইজতেহাদের চেয়ে বহু আলেমের ইজমা আরও শক্তিশালী ও এটাও শরীয়তের দলিল যে বিষয়ে অর্থের অস্পষ্টতা আছে।
- না না, কুরআনে ৯১ জায়গায় ইজমা শব্দটা আছে । এটা খারাপও হয়। এটা দলিল না। আর কিয়াস। কুরআনে এসেছে শয়তান কিয়াস করে আল্লাহকে জবাব দিয়েছে আমি আগুন আর আদম মাটি। এই কিয়াসের শুরু। কিয়াস তো কুফর।
কিয়াস কখনোই দলিল না।
- আপনার ইজমা ও কিয়াস বোঝায় ঘাটতি আছে। আরও বুঝার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।

ফিলিং _ বিদআতী

বিঃদ্রঃ
সালাত, সাওম, যাকাত, মাজহাব, ইজমা, কিয়াস এগুলোর একটা আভিধানিক অর্থ আছে। একটা পরিভাষিক/ব্যবহারিক অর্থ আছে। শব্দগুলো ব্যবহার হয় পারিভাষিক অর্থে, আভিধানিক অর্থে না। 'অর্থ' হল 'মানে'। কিন্তু অর্থনীতি মানে কিন্তু মিনিংবিদ্যা না। এখানে 'অর্থ' মানে টাকা। তেমনি 'ইজমা' অর্থ ফিকহের পরিভাষায় সম্মিলিত ইজতিহাদ। প্রত্যেক

প্রজন্মের ইজমা পরবর্তীদের জন্য দলিল। সাহাবীদের ইজমা, তাবেঈদের ইজমা, এভাবে আলিমদের নানান টপিকে ইজমা আছে। যেগুলো কুরআনের আয়াত ও হাদিসের অর্থকে স্পষ্ট করে। ব্যভিচারের রজমের আয়াত কুরআনে ছিল, স্থগিত করা হয়েছে। কিন্তু রজমের হুকুম বলবৎ আছে। আয়াত উঠিয়ে দেবার পরও এই হুকুম যে বলবৎ আছে এটা সাহাবীদের ইজমা আছে। উমার রা. বিশ রাকাআত তারাবিহর সিদ্ধান্ত দিলেন, সাহাবীরা সবাই মেনে নিলেন, এটাও ইজমা। ইজমা কুরআন ও হাদিসের কোন অর্থকে স্পষ্ট করে। আমি মনের মত অর্থ বানিয়ে নিলে সেটা ইসলাম না। সাহাবীরা কি বুঝেছেন তা থেকে, এটা ইজমার দ্বারা বুঝে আসে। তাই ইজমা শরীয়তের শক্ত দলিল। নয়তো যে যার মত অর্থ করে নিত।

মদ কুরআনে হারাম । কিন্তু কুরআন হাদিসে কোথাও গাঁজা-হিরোইনের কথা আছে? নেই। তার মানে কি গাঁজা-হিরোইন হালাল? কখনোই না। কিভাবে হারাম হল? ফিকহের পরিভাষায় একে বলে ' গাঁজাকে মদের উপর কিয়াস করা'। মদের মধ্যে কি আছে যার কারণে আল্লাহ মদ হারাম করলেন? নেশা আর মাতলামি। এখন কিয়ামত পর্যন্ত যত গাছ, পাতা, ওষুধ, ইন্জেকশন, ট্যাবলেট, ড্যান্ডি, সিরাপ-যা কিছু আসবে যার মধ্যে এই দুই জিনিস পাওয়া যাবে সব হারাম। সেগুলোকে মদের উপর কিয়াস করা হবে। মানে কুরআন-হাদিস থেকে কোন হুকুমের রোশনি নিয়ে তা কোন নতুন বস্তুর উপর ফেলে তার হুকুম বের করাকে বলে কিয়াস। অবশ্যই কিয়াস শরীয়তের দলিল। কিয়াসের সু্যোগ আল্লাহ রেখেছেন বলেই ইসলাম সব যুগের সব কালের ধর্ম। চির আধুনিক জীবনবিধান।

আমাদের শায়খরা আমাদের কি শিখায় একদম বেসিক জিনিস তো মাথা দিয়ে চিন্তা করতে হবে। খুঁটিনাটি বাদ দিলাম। যা কিছু তারা বলে সবই গিলে নেয়া আবার কেমন হল? আবার আমরাই যাচাই বাছাইয়ের কথা বলি। এটা আবার কেমন # ডাবল _ স্ট্যান্ডার্ড?

১৪.

আলহামদুলিল্লাহ । সংশয়বাদিতা বিষয়ে এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ বইটা পড়লুম। আল্লাহ তাআলা অনুবাদক Abdullah Mojumder সাহেবকে গাইরি হিসাব জাযা দান করুন। ওরা আমাদের বই শেষ পর্যন্ত পড়ার হিম্মতই পায়না। আমরা ওদের ধর্মগ্রন্থগুলো ঠিকই পড়ি। এ বই ওরা হয়ত পড়বে না, পড়লেও ভাববে না, ভাবলেও বুঝবে না। যদি না আল্লাহ হিদায়াত দেন। তবে আলহামদুলিল্লাহ, পড়ার পর আমার ঈমান বেড়ে গেছে, তৃপ্তি পেলাম। আপনেরাও পড়িয়েন। এখনও ছাপা হয়নি। পিডিএফ ঈদের পর পাবেন। কোন ঈদ শিওর না।

খ.
কোটা ইস্যুতে আমি শক্ত অবস্থান ঘোষণা করলাম। কোন পক্ষে তা বললে চাকরি থাকবে না।

গ.
খুব গবুষণা চলছে। ভাবছি এ বছর খালি নোটই প্রসব করব। আপনাদের কার কী নোট লাগবে বইলেন। সব বিষয়েই একটা সবজান্তা মতামত না দিলে মস্তিষ্ক নিশপিশ করে।

ঘ.
বিশ্বকাপ। খেলা না দেখলেও ফিক্সচার নিয়ে বেশ চিন্তাভাবনা করলাম। সৌদি-মিসর-মরক্কো-তিউনিসিয়া-সেনেগাল খেলছে। ইরানও খেলছে। ইসরাইল কিন্তুক কির্কেট-ফুটবল কিসুই খেলে না। সবখানে ধর্ম টেনে আনবেন না। এমনি মনে হল।

১৫.

ক.
গেদাবাচ্চাদের জন্য কিছু দীনী কাজ হওয়া দরকার। এইজগ্রুপ ভাগ করে কাজ করা যায়।
৩-৫ বছর: কিছু কমিকস যা মায়েরা পড়ে শোনাবে/ ভিডিও জাতীয় কিছু
৫-১০ বছর: কমিকস, আকীদা সিরিজ, হাদিস সংকলন, সীরাত ও হায়াতে সাহাবা থেকে গল্প সংকলন
১০-১৫: হাদিস সংকলন, গল্প সংকলন সীরাত থেকে, কুরআন বেসিক, আকীদা বিস্তারিত, তাওহীদ-কুফর দ্বন্দ্ব, সাহাবী-তাবেঈনদের কৈশোর

খ.
আমরা টেক্সট বইয়ের সাথে ছোটবেলায় "একটিভ ইংলিশ" পড়তাম, গ্রামার পড়তাম যেগুলো সরকারি না, বাইরে থেকে কিনতাম। স্কুল সিলেক্ট করে দিত। ওগুলো কি এখনও আছে?

একটা একটিভ ইংলিশ বই করা যায় দীনী মেজাজের? একটা ইংলিশ গ্রামার যেখানে ট্রান্সলেশন দিয়ে দীন শেখাবো? পাপীরা আগুনে পুড়িতে থাকিবে। জারিফ শবে কদরে নামাজ পড়িয়াছিল। আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিকে উঠান।

একটা বাংলা গ্রামারও চেষ্টা করা যেতে পারে।

গ.
স্কুলের ইসলাম শিক্ষা বইটা পর্যাপ্ত না। পরীক্ষার ছুটিতে বাবা মায়েরা একটা দীন সিলেবাস করতে পারেন বাচ্চাকে পড়ানোর জন্য। এমন ক্লাস ওয়াইজও হতে পারে বইগুলো বয়স ওয়াইজ না হয়ে। আমি একটা করেছিলাম। পরে দিবনে ইনশাআল্লাহ। আপনারা কেউ করলে শেয়ার করতে পারেন। ইদানীং মনটন খারাপ থাকে। তাই বাচ্চাদের নিয়ে ভাবি। মন ভাল হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ।

টাইট্রেশন
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·THURSDAY, OCTOBER 11, 2018

- ‘আচ্ছা তোরা রাজনীতি করতে চাস কেন? একজন একজন করে বল’।

- ‘ভাই, আমি ইঁদুরের মত বাঁচতে চাই না’।

হিদায়াত, পথের খোঁজ। কোন পথ? কেমন সে পথ? পিচঢালা, না মেঠো, না ডিজিটাল? সে পথ বড় সহজ, বড় আরাম। ছোটবেলা থেকে আমাদের মাথায় পুঁজিবাদী, ‘স্বল্পমূল্যে শ্রমসন্ধানী’ সিস্টেম একটা কথা শিখিয়ে দিয়েছে— লাইফ ইজ নট অ্যা বেড অব রোজেজ। জীবনটা ফুলের বিছানা নয়। জীবন খুব কঠিন, টিকে থাকার জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে। বস্তুবাদী সমাজে বস্তু কেনার যোগ্যতা চাই, নাহলে কমফোর্ট জোনে থাকতে পারবা না । লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে সে। গাড়ি-বাড়ি-নারী- কাঁড়িকাঁড়ি কড়ি-ছড়ি এগুলোর জন্য দৌড়াও, ভাগো।

আরেকটা পথ আছে, কমফোর্ট জোনে ঢোকার পথ, আরাম-শান্তি-সুখের পথ। কমফোর্টের জন্য যে পথে উন্নত বস্তু লাগে না, কুঁড়েঘরেই-অর্ধাহারেই-হাঁটাপায়েই সেখানে কমফোর্ট মেলে। অর্জনের প্রতিযোগিতা নেই সেপথে। শুধু আছে বিসর্জনের প্রতিযোগিতা। ‘বস্তু ভোগের মাঝে তৃপ্তি’ আগের ওই পথে। আর এই পথে --‘ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ’, আসল সুখ।

এই পথের সন্ধান পাওয়াকেই বলছি হিদায়াত, যে পথের দুধারে ফুলের মত ফুটে থাকে সুখেরা। আমি কোন কিতাবী নীতিবাক্য বা কম্যুনিজমীয় ইউটোপিয়া বা ঠাকুরমার ঝুলির কথা বলছি না। রেগুলার শেভের আড়ালে পাকা দাড়ির গোড়ার মত বাস্তব, কড়া মেকআপের আড়ালে প্রৌঢ়ার ভাঁজ পড়া চামড়ার মত বাস্তব এক পথের অস্তিত্ব জানাচ্ছি আপনাদেরকে, যেখানে সুখের অভিনয় করে প্রতি মুহূর্তে মরতে হয় না। সে রাস্তায় ‘দম

নিলেও’ ঘ্রাণ পাওয়া যায় সুখের, এতটাই সস্তা সেখানে সুখ। একটা ছেলের গল্প শোনাবো আজ।

‘ছেলেটি’র জগতটাও টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত-সন্তানের জীবন দর্শনে ঠাসা। পুঁজিবাদের সেবা করে নিজের কমফোর্ট জোন নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য ‘পুঁজিবাদের ঠিক করে দেয়া শিক্ষাটা’ ভালোমত আয়ত্ত্ব করাটা জরুরি। যেখানে ভালো বাবা, ভালো স্বামী, ভালো সন্তান কীভাবে হতে হয় — তা নেই। ভালো চাকর হয়ে কীভাবে ভালো চাকরি করা যায়, শুধু সেটা শিখলেই যথেষ্ট। এরপর বস্তু আহরণের জন্য এমনভাবে চাকরগিরি করবে, যাতে সন্তান বাপ-মাকে কাছে না পায়। বস্তুর জন্য যৌতুক চেয়ে বউ পেটাতেও না বাধে। আর, বুড়ো বাপের সম্পত্তি লিখে নিয়ে আশ্রমে পাঠিয়ে নিজের কমফোর্ট জোন নিশ্চিত করা যায়। ভালো বাবা, ভালো স্বামী, ভালো সন্তান হওয়া শেখেনি যে। শিখেছে শুধু বস্তু লাগবে নিজের কমফোর্টের জন্য— গাড়ি-বাড়ি-আইফোন-বাইক। সে জগতে বস্তুই সব, বাকি সব মিথ্যে।

তো, দক্ষ চাকর হবার জন্য ছেলেটা ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হলো। সেখানে নাকি চাকর হবার সব গুণগুলো বিকশিত হয়— মনিবের ভাষায় পটাপট কথা বলা, কো-কারিকুলার্স, সুস্থ-সবল-বেশি কর্মক্ষম চাকর তৈরি। ভালো অর্থেই বললাম। ডানপিটে ছেলেটা কঠোর নিয়মের মাঝে আবিষ্কার করে বসল এক মহাসত্য— নিয়ম ভাঙ্গার মজা। জামাআতের সাথে মাগরিবের নামায পড়াটাও একটা নিয়ম ছিল সেখানে। আল্লাহ ছেলেটাকে মাফ করুন।

আবারো ঐ নিয়মের ভয়েই আইএসএসবি-তে গ্রীনকার্ড পেয়েও গেলো না ছেলেটা। ভার্সিটি লাইফ এনজয় করতে হবে তো। ফ্রেন্ডস-আড্ডা- ঘোরাঘুরি-বিপরীত লিঙ্গের সান্নিধ্য এসব ছেড়ে আর্মিতে গিয়ে যৌবন বরবাদ করার কোন মানে হয়? শেষমেসশ স্বপ্নের ঢাবি ক্যাম্পাসে কাঙ্ক্ষিত সাবজেক্ট (জেনেটিক্স) না পেয়ে একপ্রকার হতাশ হয়েই ভর্তি হলো ঢাকার এক সরকারি কসাইখানায়। কাহিনী শুরু হচ্ছে এখন...

প্রথম ফোঁটাঃ

- ‘বাবা, এদিকে আয়, দেখে যা’

- ‘জি আব্বু, আসছি...’

- ‘এই দ্যাখ, এই লোকটা ডাক্তার। দ্যাখ কীভাবে অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে রেফারেন্স দেয়। একদম মুখস্থ। শোন একটু’

- ‘তাই নাকি? আচ্ছা লোক তো!’

টিভিতে দাড়িওয়ালা, কোট-টাই পরা হালকা-পাতলা গড়নের এক লোক। ‘স’ উচ্চারণে একটু সমস্যা, ‘নাম্বার ওয়ান’ বলার সময় বুড়ো আঙুল আগে তোলে। খ্রিস্টান পাদ্রী যেন আজন্ম-বোবা, হিন্দু পণ্ডিত যেন পালাতে পারলে বাঁচে। ছেলেটা মুগ্ধ হয়ে দেখে আর ভাবে— আমিও তো ডাক্তারি পড়ি, আমিও তো পারি এমন করে মানুষের হিদায়াতের উসীলা হতে।

ছেলেটা কল্পনায় স্টেজে লোকটার জায়গায় নিজেকে ভাবে। ‘নাম্বার ওয়ান’ বলার সময় বুড়ো আঙুল আগে দিয়ে। পটাপট বলে চলে বাইবেল-গীতা- ঋগবেদ-কুরআনের চ্যাপ্টার-ভার্স নাম্বার। আমাদের ছেলেটার কুরআনের অনুবাদ পড়ার আগেই ‘ইংরেজি একটা বাইবেল’ আর ‘গসপেল অব বার্নাবাস’ শেষ হয়ে গেল। ডাউনলোড হয়ে গেল বেদের সব খন্ডই, ‘আফ্রিকান ধর্মগুলোর পবিত্র শ্লোক’ আর ‘প্রাচীন চৈনিক ধর্মপুস্তক’। ‘ডেড সী স্ক্রল’ নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখত, আর সুরিয়ানী ভাষায় (আরামায়িক, ঈসা আলাইহিস সালামের নিজের ভাষা) লিখত খাতার মলাটে নিজের নাম। এভাবেই চলছিল ফার্স্ট ইয়ারের সোনালি দিনগুলো।

ভালো চাকর হবার প্রতিযোগিতা কেড়ে নিলো সব। সঅঅঅব। ভয়ংকর সব বই, হোস্টেল লাইফ আর কিন্নরী হাসিগুলো ‘আসল’ রাস্তায় ফিরিয়ে নিলো ছেলেটাকে। হঠাৎ একদিন দেখলো ভার্সিটি লাইফ যতটা হৈ-হুল্লোড় হবার

কথা ছিলো, অতটা আর হচ্ছে না। মেডিকেল কলেজের টীচারদের কড়া শাসন আর প্রথম ব্যাচের হম্বিতম্বিতে সব বরবাদ হচ্ছে, কিন্ডারগার্টেন বানিয়ে ফেলেছে একদম। এভাবে তো আর চলে না। এই প্রেসার থেকে উত্তোরণের পথও পাওয়া গেল— ছাত্ররাজনীতি। সীনা টান টান করে হাঁটা। টীচার-সিনিয়র-জুনিয়রদের সমীহের দৃষ্টি, দাবি-আন্দোলনের অ্যাডভেঞ্চার। হুমমম, চেতনার ডিলারশীপ নিয়ে নিলো ছেলেটা। কেন রাজনীতিতে আসতে চাচ্ছে, বড়ভাইয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটি জবাব দিয়েছিল— ‘ভাই, আমি ইঁদুরের মত বাঁচতে চাই না’।

আর চেতনার সাথে একটু এসব না হলে চলে? এসবের সাথে একটু ‘ওসব’ না হলেও ‘সেসব’ তো লাগেই। না হলে রাজনীতি জমেই না মোটে।

দ্বিতীয় ফোঁটাঃ

প্রথম ব্যাচে লেবাস-পোশাকে হুজুর একজনই। চোখে পড়তেন না তেমন। করিডোর ধরে হেঁটে যেতেন শান্তসমাহিত, মাথানিচু করে। পিঠে থাকত পুরোনো আমলের একটি ব্যাগ। কথা হয়নি কখনো। দ্বিতীয় ব্যাচে সবাই নেতা। আমাদের আলোচ্য ছেলেটার ব্যাচে পোশাকী হুজুর নেই, চতুর্থ-পঞ্চম ব্যাচেও না। ষষ্ঠ ব্যাচে হঠাৎ করে ৫টা জবরদস্ত হুজুর এসে পড়েছে। ডিলারশীপের আওতায় ‘মুরগি ধরা’ একটা দায়িত্ব। কিন্তু এই কতগুলো মুরগি, যাদের ধরা যায় না। এদের পোশাক এদেরকে রক্ষা করে দুই গ্রুপের টানাটানি থেকে, বাতিলের দৃষ্টি থেকে। পোশাকের শক্তি। কেউ একজন এদেরকে রক্ষা করছে আমাদের শ্যেনদৃষ্টি থেকে। রুমের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে আমাদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই।

আগে ছিল একজন, এখন হল ৬ জন। এখন চোখে পড়ে বেশি, বার বার। নতুন কিসিমের মানুষ। এতদিন জানতাম মাদ্রাসার ছেলেরা দাড়ি-টুপি- পাঞ্জাবীওয়ালা। এখন দেখি মেডিকেলেও। ছেলেটার ব্যাচে আলিয়া মাদ্রাসা থেকে একটা ছেলে এসেছিল। দাড়ি আছে, শার্টপ্যান্ট পরে।

কিন্তু এই হুজুরগুলোর মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডও নেই। এতদিন একটা লজিক দাঁড় করিয়েছিল ছেলেটা। আল্লাহ জিগ্যেস করলে বলবে— ‘মালিক, আপনি আমাকে মাদ্রাসায় পড়ালে টুপি-দাড়ি-পাঞ্জাবী পরতাম। আপনি আমাকে পড়িয়েছেন ডাক্তারি। তাই টাখনুর উপর প্যান্ট-দাড়ি-টুপি এসব রাখিনি’। এখন দেখা যাচ্ছে লজিকটা মার খেয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা স্পষ্ট দেখতে পায়, আল্লাহ এই ৬ টার একটাকে সামনে এনে বলছেন— ‘এও তো মাদ্রাসায় পড়েনি। এ তো পেরেছে। তুমি এমন কী হয়ে গিয়েছিলে যে পারোনি?’

কী জবাব দেবে ছেলেটা তখন? আছে কোন জবাব?

তৃতীয় ফোঁটাঃ

মুরগি ধরার একটা স্ট্র্যাটেজি হল, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আড়ালে ওঁত পেতে থাকা। যেসব মুরগি সরাসরি কোন গ্রুপে আসতে চায় না, তাদেরকে সাংস্কৃতিক উইং-এর সদস্য বানিয়ে কর্মী না হোক, স্রেফ সমর্থক বানিয়ে রাখা। আরেক গ্রুপও নিতে পারলো না, আবার কাজেকর্মেও পাওয়া গেলো। কলেজে কালচারাল প্রোগ্রাম বলতে সারা বছরে দুইটা। ছেলেটার গ্রুপ করে সরস্বতী পূজার প্রোগ্রাম, আর বিপরীত গ্রুপ করে ‘সন্ধানী’ বার্ষিক প্রোগ্রাম। ধর্ম যার যার, স্বরস্বতী পূজা সবার। হিন্দুরা কমিটিতেই আছে। স্টেজ সাজানো-পারফর্ম করা-গেট সাজানো- মূর্তি ধরে এনে স্থাপন করা এগুলো মুসলিমদেরই কাজ। নামায-রোযা খুব একটা না করলেও পূজার কাজে উৎসাহের অন্ত নেই তাদের। ছেলেটার আবার ক্যাডেট কলেজে পড়ার সুবাদে কো-কারিকুলারের তালিম ছিলো ভালোই। এখন বেশ ‘কাজে’ লাগছে।

কাল পূজা। বিকেলে কালচারাল প্রোগ্রাম। পুরো কলেজ সাজানো হচ্ছে। ‘বিদ্যার’ দেবী বলে কথা। স্টেজ ডেকোরেশনের জন্য বিশাল স্বরস্বতীর মূর্তি আঁকা হচ্ছে। ছেলেটা আরো দুই মুসলিম সিনিয়রের সাথে আঁকছে।

এর পিছনে লাইট ফেলে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ স্টেজটা বানানো হচ্ছে এবার। ওদের সন্ধানীর স্টেজকে বেশ টেক্কা দেয়া হবে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ব্রাশ করতে করতে বাইরে উঁকি দিল। হুজুরগুলোর হাতে কোদাল, ঝুড়ি। কী ব্যাপার? ওওও, আচ্ছা। হোস্টেলে ডাইনিং-এ ছোট্ট জায়গা নিয়ে মসজিদটা অস্থায়ী । বড় মসজিদ চাই। হুজুররা আরো কিছু হুজুরমনাদের সাথে নিয়ে নেমে পড়েছে জায়গা সাফ করতে। হোস্টেলের সারা বছরের আবর্জনায় মেখে একেকজন যাচ্ছেতাই অবস্থা।

এরা মসজিদ বানানোর জন্য ময়লা মাখাচ্ছে গায়ে, আর ও কি না সরস্বতীর ছবি এঁকে ময়লা হচ্ছে?— ময়লা হচ্ছে তো দুজনই। অথচ কী আকাশ-পাতাল তফাৎ। এক নিমেষ মাত্র চিন্তাটা উঁকি দিয়েই হারিয়ে যায়। মুখে পানির ঝাপটা দিয়ে ছবি আঁকায় ফিরে যায় আমাদের ‘ছেলেটি’।

চতুর্থ ফোঁটাঃ

ফার্স্ট ব্যাচের এক সিনিয়রকে জঘন্য লাগত ওর। ওভার-এক্সপ্রেশান। টেবিল টেনিস খেলছেন তো খেলেন ভাই, এতো টেবিল থাপড়ানো- চিল্লাচিল্লি করার কি আছে? টিটি টেবিলটা আবার ছেলেটার রুমের পাশেই। যা করছে, তার দশগুণ চিল্লাপাল্লা, শো-অফ। বিরক্তিকর। ফাইনাল পরীক্ষার পর ভাইকে অনেকদিন দেখা যায় না। যাক, ক’টা দিন শান্তিতে থাকা গেল, যত্তোসব। হঠাৎ একদিন ভাইকে দেখা গেল। বড় দাড়ি, টুপি, পাঞ্জাবী, মাঝেমাঝে পাগড়ি। কী ব্যাপার? তাকে দেখে আগের মতো বিরক্ত লাগছে না কেন? হাসি দিয়ে প্রথম কথা বললেন— ‘তোমাদের বিভিন্ন সময় কষ্ট দিয়ে থাকতে পারি, মাফ করে দিও ভাই’।

ঘুরে গেল মাথাটা। গা-জ্বলা লোকটা কোন জাদুতে প্রিয়দর্শন হয়ে গেলো। ভাইয়ের রুম থেকে মসজিদে যাবার পথে ওদের রুম পড়ে। যেতে যেতে শান্ত সুরে ভাই ডেকে যেত— আসি ভাই, যোহরের নামাজ, এশার নামায। ফাহিম, সোহেল, আসো ভাই। কোন চেঁচামেচি নেই, কণ্ঠভরা মায়া, যেন

কেঁদে কেঁদে ডাকছে কেউ। আমাদের ছেলেটাকে তাবলীগের ছেলেরা দাওয়াত দিতে আসতো না। হয়তো ‘গন-কেস’ মনে করতো। ভাই এসে মাঝে মাঝে ফাহিমকে মসজিদে যাবার দাওয়াত দিয়ে যেতো। কিন্তু ভাইয়ের এই প্রতি ওয়াক্তে হেঁটে যাওয়াটাই আমাদের ছেলেটার জন্য মারাত্মক এক দাওয়াত ছিল, ভাই জানতোও না। ‘সুন্নাহ’ নিজেই দাওয়াত। আপাদমস্তক সুন্নাহ নিয়ে কেউ হাঁটবে, আশপাশের লোকেরা দাওয়াত নিতে থাকবে। সে দাওয়াত জবানের চেয়ে স্পষ্ট, ভাষার চেয়ে শক্তিশালী।

পঞ্চম ফোঁটাঃ

তখন ফাইনাল ইয়ার। ছেলেটা রুমমেটদের সাথে সারারাত তাস খেলত, আর সারাদিন ঘুমাতো। ক্লাসে যেতো না। ৭৫% উপস্থিতি না থাকলে ফাইনালে বসতেই পারবে না— সে চিন্তা ছিল না ওদের। ভাবতো, এতো বছর রাজনীতি করেছি, নেতাদের সেবা করেছি। পরীক্ষায় বসতে না দিলে ‘কাবজাব’ দিয়ে প্রেসারাইজ করে বসে পড়ব। আর বসতে পারলেই একমাসে সব পড়ে উল্টায়ে দিবো। আর বাই চান্স কোন ভাইভা একটু খারাপ হলে পলিটিক্যাল ‘জ্যাক’ দিয়ে তো উতরানো যাবেই। অবশ্য ব্যাচে কেন জানি ওদের ‘মেধাবী’ বলে সুনাম ছিল। কিন্তু মেডিকেলে মেধার চেয়ে জরুরি হল অধ্যবসায়। বুঝবে বাছাধন, বুঝবে।

রুমমেট মুজাহিদের জ্বালায় ওরা অতিষ্ঠ। কমবখতের শরীরটা পাহাড়ের মত বলে ওকে বেশি কিছু বলাও যাচ্ছে না। ইজতিমা থেকে আসার পর পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ছে, প্যান্ট টাখনুর উপর কেটেকুটে একাকার। তাও ঠিক আছে, সই। রাতে তাস খেলার সময় ১০ টা বাজলেই লাইট অফ করতে বলে। আর সারারাত তাস খেলে ফজরের আজান পড়লে ওরা যখন শুতে যাবে, তখন ডাকাডাকি শুরু করে। দোস্ত, ওঠ, ঘুম থেকে নামায উত্তম, নামায পড়ে শো’, সৌর-সোহেল-ফাহিম। উফ, পাহাড়ের সাথে ঝগড়াঝাটি করাও ঠিক হবে না। সারাদিন ঘুমকাতুরে কুম্ভকর্ণ মুজাহিদ তখন আমাদের সারাদিন

নসীহতের উপর রেখেছে। হোস্টেলটার হলো কী? কী বড়ি খেয়ে চেনা মানুষগুলো কী রকম জানি হয়ে যাচ্ছে, একদম অচিন মানুষ।

ষষ্ঠ ফোঁটাঃ

আজ একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেছে ছেলেটার সাথে। আজ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের নির্বাচন ছিল। ছেলেটার গ্রুপের প্রিয় ডাক্তার নেতা বড় পোস্টে লড়ছেন। পুরো গ্রুপ প্রেসক্লাবের সামনে বিএমএ অফিসে গিয়েছিল আজ। ফুলের মালায় বরণ করে নিল বিজয়ী নেতাকে। রাত ১১টার দিকে সবাই ক্যাম্পাসে ফিরছিল। পেয়ে গিয়েছিল ফাঁকা একটা ৮ নম্বর বাস। আসাদগেট আড়ং-এর মোড়ে ধানমণ্ডির দিক থেক ট্রাকটা আসছিল ফুল স্পীডে। বাসে ওঠার সময়ই ড্রাইভারটাকে গড়বড় মনে হচ্ছিল। ছেলেটা, ফাহিম আর মিঠুন ভাই ছিল ড্রাইভারের বামপাশের মহিলা সিটে। ওরা দেখছে ট্রাকটা স্পীড কমাচ্ছে না, বাসওয়ালাও পিনিকে ডানে কাটছে না, সামনেই যাচ্ছে। সবাই হৈ হৈ করে উঠলো একসাথে, চিৎকারে ড্রাইভার কিছুটা হুঁশ ফিরে পেল বোধহয়। পুরো ডানে কাটার চেষ্টা করলো। ভালো একটা ঘষা দিয়ে বেরিয়ে গেল ট্রাকটা।

ক্যাম্পাসে পৌঁছে সবাই ড্রাইভারটাকে পিটিয়ে পুলিশে দিচ্ছে। অন্য সময় হলে ছেলেটাও সোৎসাহে শরীক হত। আজ সে সবাইকে ফেলে হাঁটা দিয়েছে হোস্টেলের দিকে। পিছনে উন্মত্ত জটলা রেখে, ধীরপায়ে। যেনো ঝড়ের বিপরীতে হাঁটছে, ঝড় তো হচ্ছেই কোথাও। সব ঝড় কি দেখা যায়?

৭ম ফোঁটাঃ

খবরটা হলো, ওরা পরীক্ষায় বসতে পারছে না এবার। ৭৫% উপস্থিতি ছিল পরীক্ষায় বসার শর্ত। ৫০% যাদের ছিলো তারাও অনুমতি পেয়েছে। ১ম লিস্ট, ২য় লিস্ট, ৩য় লিস্টেও নাম নেই ওদের। একেকজনের উপস্থিতি ৩০-৩৫% এর বেশি না। পাগলের মতো ছুটছে নেতাদের দুয়ারে দুয়ারে।

কিন্তু কোন ‘মেকানিজমে’ই কাজ হচ্ছে না। মিটিং হচ্ছে, কিন্তু স্যাররা নাছোড়বান্দা। না, ওদের বসতে দেয়া হবে না, তাহলে পরের ব্যাচগুলো আর ক্লাস করবে না। আর এবার টাইট দিলে পরের ব্যাচগুলো ক্লাস করবে ঠিকমতো। কোনভাবেই বসতে দেয়া হবে না। নেতারাও বলে দিল,- ‘ঠিক আছে। পরের বার বসো’।

পুরো জীবনে ওরা কখনো ফেল করেনি। ছেলেটা ক্যাডেট কলেজের। তিন জন নটরডেমের। একজন রাইফেলস পাবলিক, একজন বঙ্গবন্ধু কলেজের ফার্স্ট বয়। যতটা না পরীক্ষায় বসা দরকার, তার চেয়ে বেশি ইমেজ ইস্যু। মা- বাবা জানলে, তার চেয়ে বেশি টেনশন— আত্মীয়স্বজন জানলে? এতোটা কঠিন পরিস্থিতি কখনো হয়নি জীবনে। পরীক্ষার বাকি আর ৮ দিন মাত্র। সিগারেটের ধোঁয়া সবাই দেখে, অন্তর পোড়া ধোঁয়া দেখা যায় না।

বিকেলে দরজায় নক। তাবলীগের ভাইয়েরা এসেছে ফাহিমের কাছে। ছেলেটা শুয়ে শুয়ে শুনছে আর জ্বলছে, জ্বালাচ্ছে। আজ মাগরিবের পর পরীক্ষার্থীদের জড়ো করা হবে। কাকরাইল থেকে মুরুব্বিরা আসবেন, এশা পর্যন্ত কথা হবে। এরপর খানাপিনা। প্রতি বছরই আয়োজন হয় নাকি। যে ছেলেটা ডাকতে এসেছে তার শুরুর কথাগুলো কেমন যেন...সবকিছু করনেওয়ালা সত্তা একমাত্র আল্লাহ। ততটুকুই হয় যতটুকু আল্লাহর চান। যাকে আল্লাহ হেফাজত করেন তাকে সারা পৃথিবী মিলে ক্ষতি করতে পারে না, যার ক্ষতি আল্লাহ করেন সারা পৃথিবীর সব শক্তি মিলে তাকে উপকার পৌঁছাতে পারে না...।

বহুদিন পর মসজিদে এলো ছেলেটা। চামড়ার মোজা পরা ছেলেটার কথাগুলো অন্যরকম ছিল একদম। তাই তো, যদি আল্লাহ না চান, কেউ বসাতে পারবে না পরীক্ষায় তাকে, কেউ না। মন দিয়ে বয়ানটা শোনে ও। একজন মুফতি সাহেব, আগে ঢাকা ভার্সিটির ফার্মেসিতে পড়েছেন, পরে কওমীতে মুফতি পড়েছেন। আশ্চর্য সব কথা। সব কথার মাঝে নিজের একটা ঘটনা শোনালেন মুফতি সাহেব। ওনারা ব্রাজিলে ছিলেন জামাতে। ধরুন, বড় একটা ঘর অন্ধকার।

আপনার হাতে মোমবাতি। ঘরে আরো কয়েকটা মোমবাতি আছে নেভানো। আপনি যদি আপনার বাতিটা নিয়ে পুরো ঘর ঘোরেন, আঁধার দূর হবে না। কিন্তু যদি নিভে থাকা মোমগুলো জ্বালিয়ে দেন, ঝলমল করে উঠবে সারা ঘর। তাবলীগের লোকেরা তাই বিদেশে থাকা মুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়াকে প্রাধান্য দেয়।

তো ঘটনাটা হল, ওনাদের জামাত ব্রাজিলে চলছিল। মুসলমান খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে, কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। শেষমেশ একটা কবরস্থানে ঢুকে জিরিয়ে নিচ্ছিল সাথীরা। হঠাৎ একটা কবর, নামফলক আরবি। মুসলমানের কবর। বাড়ি সিরিয়াতে। পদবীটা টুকে নিয়ে সারা শহর খুঁজে ফিরলো এই পদবীর লোক। পাওয়া গেলো ৮০ টা পরিবারের বিশাল এক মহল্লা, সবাই খ্রিস্টান, কিন্তু পদবীটা আছে। জামাত ওখানে এক জায়গায় অবস্থান করে সব পরিবারে দাওয়াত পৌঁছালো। স্মরণ করিয়ে দিলো, আরে তোমরা তো মুসলিম, তোমাদের পূর্বপুরুষ মুসলিম, সিরিয়া থেকে এসেছিল। অধিকাংশ পরিবার ইসলামে ফিরে এলো। মোটামুটি ফরজটুকু শিখিয়ে, জামে মসজিদ বানিয়ে, রাজধানী থেকে ইমাম নিয়োগ দিয়ে জামাত অন্য এলাকায় চলে গেল।

আরে, এটাই তো কাজ। সেই পুরনো স্বপ্নটা ফিরে এলো ছেলেটার চোখে। মানুষের হিদায়াতের উসীলা হবার সেই মেজাজ। চল্লিশ দিনের জন্য নাম লিখিয়ে দিল পরীক্ষার পর। দ্বীন শিখবে, দাওয়াত দেয়া শিখবে, আল্লাহর থেকে চেয়ে নেয়া শিখবে। আর দুআ করল— ‘আল্লাহ, এবারের মত পরীক্ষায় বসিয়ে দাও। এক চিল্লার জন্য যাব। বিয়ে করে ‘ভালো হয়ে’ যেতামই, তার আগেই ভালো হয়ে যাব। প্লিজ’। বৃহস্পতিবার এই ঘটনা, শনিবার আবার মিটিং ডাকা হল। বিনা নোটিশে ইমার্জেন্সি মিটিং, যেটা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। শনিবারই ফরম ফিলআপ করল ওরা। পরীক্ষার বাকি মাত্র ৬ দিন। ওওও, চাওয়ার জায়গা তাহলে এটাই।

পরীক্ষা শেষ। বাপ-মাও রাজি। চল্লিশ দিন। ওদের মেডিকেলের ৫ জন। কাকরাইল থেকে সিরাজগঞ্জ শহরে। জামাতের আমীর সাহেব আলিম। জীবনের শ্রেষ্ঠ ৪০ দিন। ২৫ বছরের জীবনে প্রথম বসে প্রসাব করা শিখল, বালেগ হবার পর প্রথম ফরজ গোসল শিখল। হাসছেন? হাসবেন না। ৯৫% মুসলমানের বাচ্চার হাল এর চেয়ে খুব বেশি ভালো না বোধ হয়। ১০টা সূরা একদম সহীহ-শুদ্ধ হল, দাওয়াত দেয়া শিখল, নতুন করে কুরআন পড়া শিখল, ঘুম-খাওয়া-বাথরুম এসবের মাসনূন দুআ মুখস্ত হল, জিকির-তাহাজ্জুদের অভ্যাস হল, আর শিখল— ‘শিক্ষার পরিপূর্ণতার জন্য মোট ১২০ দিন লাগবে’। ততদিনে সুখ পেয়ে গেছে। বুঝেছে এটাই কাঙ্ক্ষিত লাইফ ফরম্যাট। আবার ৪০ দিন, এবার জামাতের আমীর আমাদের ছেলেটা, গন্তব্য যশোর। জামাতের সাথীরা যত দুষ্টুমি করে, আমীরের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে তত বাড়ে। কিছু হলেই দুই রাকাত নামাযের অভ্যাস হল— ‘ইয়া আল্লাহ, সাথীদেরকে শয়তান থেকে হেফাজত করো। জোড়মিল দিয়ে দাও’।

এর মধ্যে রেজাল্ট হয়ে গেল। তিন সাবজেক্টের তিন ত্রিক্কে নয়টা পরীক্ষা— লিখিত, ব্যবহারিক, ভাইভা। ২ টার ভাইভাতে ফেল আমাদের হিরো। ৬০ এ পাশ, হিরো একটার ভাইভাতে ৫৭, একটাতে ৫৮। নেতা সবগুলো ফেল। যেগুলো ঐ শেষদিন পরীক্ষার অনুমতি পেয়েছিল, সব ক’টা। স্যাররা বললেন, তোমাদের অনেককে পাশ করিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু যারা এতদিন রেগুলার ক্লাশ করেছে তাদের সাথে অবিচার হত। ২০ দিন পর ফিরে আসতে হল। সাথীদের সে কি কান্না! নিজের ভাই মরে গেলেও এতো কাঁদে না মানুষ। বাসে ফেরার পথে আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতা হল ছেলেটার। বাসে জোরে গান বাজছে, কিন্তু কানের ভিতর ঢুকছে না, মনে হচ্ছে কানের পাশ দিয়ে শব্দগুলো চলে যাচ্ছে। ফেল করেও কোন দুঃখ নেই। আল্লাহ এর মধ্যেই হয়তো ভাল কিছু রেখেছেন। হয়তো পাশের যোগ্য ছিল না ও। হয়তো আবার কি? আসলেই তো পড়া হয়নি কিছুই। ৩ মাস পর সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা। মেডিসিন-সার্জারী পড়ে তামাতামা করে ফেলতে হবে এবার।

পরীক্ষা শেষে? ১২০ দিন তো পুরো হয়নি। আবার ঐ পথেই। দেশী-বিদেশী জামাতের সাথে, কত মানুষ! কত গুণ! কতকিছু শেখা! বড় বড় কিছু জরুরি সূরা মুখস্ত হয়ে গেল, তাহাজ্জুদে পড়াও যাবে, ওযীফা হিসেবে পড়াও যাবে। দাওয়াতে আরো পরিপক্বতা এলো। জীবনের প্রথম খতম হল কুরআন। ইসলামী জীবন অভ্যাসে এসে গেলো। অসুখ কম হলে ঘরেই সারে, কিছু অসুখের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। পরিবেশ সবচেয়ে বড় জিনিস। ১২০ দিন এই পরিবেশেরই নাম, মসজিদের পরিবেশ। এখন দরুদ পড়লে মুখে মিষ্টি টের পায় ছেলেটা, তাহাজ্জুদে লম্বা সূরা আর চোখের পানি, আর নিঃশ্বাসে মিন্ট ফ্লেভার। হায়! তোমরা যদি জানতে। এখন অবশ্য সে ফিলিংস আর নেই।

ইন্টারের রসায়ন ব্যবহারিকে ‘টাইট্রেশন’বলে একটা কথা আছে। লবণ নির্ণয় করা। ফোঁটা ফোঁটা কী জানি ফেলে শেষ ফোঁটায় রঙ পরিবর্তন হয়। নীল হলে কপার সালফেট, এটুকু মনে আছে। কয় ফোঁটা গেল মনে রাখতে হয়, ঘনত্ব হিসাব করার জন্য। হিদায়াত হল টাইট্রেশন। ফোঁটা ফোঁটা পড়তে পড়তে শেষ ফোঁটায় জীবন পরিবর্তন, রাস্তা পরিবর্তন। এজন্য কেউ জীবনের পরিবর্তন চাইলে বেশি বেশি ফোঁটা নিতে হবে— ভাল কিতাব, দ্বীনী বন্ধুর সাহচর্য, আলিমগণের সোহবত, মসজিদের পরিবেশ, দাওয়াত-এগুলো ফোঁটার জায়গা। কেউ জানে না কয় ফোঁটা লাগবে, তাই বেশি বেশি ফোঁটা ফেলুন। আর দুআ তো আছেই, নামাযে সূরা ফাতিহার ‘ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাক্বীম’ পড়ার সময় বেশি করে আবেগ ঢালুন, করেই দেখুন না।

শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী (দাঃ বাঃ) একটা দুআ করেন—

ইয়া আল্লাহ, অনেকটা সময় চলে গেছে জীবনের। তোমার থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। ‘বহত দূর সে আয়া হু, বহত দেড় মে আয়া হু, আয়া তো সহি’। অনেক দূর থেকে এসেছি, অনেক দেরী করে এসেছি। এসেছি তো। মাফ করেই দাও, মালিক।

ছেলেটার ‘কাছে আসার গল্প’ আজ এপর্যন্তই। অন্য ফোঁটাগুলো অন্য কোন দিন শোনাবো আপনাদের।

ছেলেটা এখন দুনিয়ার ক’টা দিন ইঁদুরের মতোই বাঁচতে চায়।

ধর্ষণের মানসাংক ও সমাধান
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·FRIDAY, OCTOBER 12, 2018

শুরু

খুব সংক্ষিপ্ত ভূমিকা শেষে দ্রুত আমরা মূল বিষয়ে চলে যাব। যেহেতু মূল টপিকটাতে ব্যাপক আলোচনা ও মনোযোগ ধরে রাখার প্রয়োজন আছে, তাই প্রারম্ভিকাতে সময় ও মনসংযোগ ক্ষেপণ করা উচিত হবে না। কেন এই প্রবন্ধ? বিশ্বায়নের নামে ‘সস্তায় শ্রমক্রয়’ ও ‘শ্রমদাতা দেশকে চুষে নেবার’ এই বিশ্বসংস্কৃতি, যেখানে মুনাফাই সব। পশ্চিমের এই ফর্মুলার আগ্রাসনে পূর্ব-উত্তর-দক্ষিণের নাভিশ্বাস। অনিবার্য ফল — ৯৮% সম্পদের মালিক ২% মানুষ। ‘বস্তু ভোগের’ প্রতিযোগিতায় ক্রেতারা, মুনাফার তামার বিষে মাল্টিন্যাশনাল শিল্পপতিরা; মূল্যবোধ-সংস্কার-সুকুমারবৃত্তি নামের সামাজিক ভারসাম্যগুলো আজ বাহুল্য, অপাঙক্তেয়। যেকোনভাবে বস্তু চাই—গাড়ি-বাড়ি-জমি- ব্যাংকব্যালেন্স। এজন্য যা করতে হয় করো, যাকে মারতে হয় মারো। মা- বাবা, সহোদর ভাই, সহকর্মী, স্ত্রী, দুধের শিশু। আর ওদিকে মুনাফাজীবীদের মুনাফা চাই, চাহে সেটা যে জিনিসের ব্যবসাই হোক, যা লাগে করো। পতিতা-পর্ন-ড্রাগস; কে মরলো কে আর্তনাদ করল দেখার সময় নেই, শোনার সময় নেই, গোনায় ধরার সুযোগ নেই, ব্যবসা হবে না তো। স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে গেছে এক ভয়ংকর চক্র, টাকার বিষে ভেঙে পড়ছে পরিবার, সমাজ মানস, কৈশোর, মনুষ্যত্ব। আর সুযোগ করে দিচ্ছে নতুন নতুন ব্যবসার। আজ আমরা এই ভেঙে পড়া সমাজ, ভেঙে পড়া মনোজগতেরই এক বহিঃপ্রকাশ নিয়ে আলোচনা করব সম্পূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ

থেকে। এর পিছনের সূক্ষ্মতম মনোবিশ্লেষণ, কারণ, বিস্তার ও সমাধান নির্দেশ করার চেষ্টা করব গতানুগতিক ধারা থেকে একটু বেরিয়ে। শুরু করা যাক।

ধর্ষণ...

প্রতিটি ধর্ষণের পর জনগণ দুটি দিকে ভাগ হয়ে যায়। একপক্ষ পুরো দায় ভিকটিম নারীর পোশাক আশাক, চলাফেরার উপর দিয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর দেয়। আরেক পক্ষ পুরো দায়টা ধর্ষকের মানসিক বিকৃতির উপর দিয়ে ‘কে জানে কার’ সমর্থন আদায় করতে চায়, যদিও এরাই আবার বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষকের রোল-প্লে করে ধরাটরা খায়।

প্রথম পক্ষের কাছে ২য় পক্ষ ও সেইসাথে আমারও প্রশ্ন:

- নারীর শরীরী প্রদর্শন ও পোশাকই যদি ধর্ষণের একমাত্র ফ্যাক্টর হয়, তাহলে অ-নারী (অবিকশিত নারীত্ব) ৩ মাস বয়েসী বাচ্চা কী উগ্রতার কারণে, ৪ বছরের গালফোলা বাচ্চা মেয়েটা আর ৭ বছরের ময়লামাখা টোকাই বালিকাটি কোন শরীরী আবেদনের শিকার হলো?

- ৯ বছরের বাচ্চা ছেলেটা তার কী শরীরী উগ্র প্রদর্শনের কারণে জানোয়ারের চোখে পড়ল?

- হাঁস-মুরগী-ছাগল-গরুটার পোশাক কতটুকু শালীন হলে ঘটনাটা ঘটত না?

আর দ্বিতীয় পক্ষের কাছে আমার ও প্রথম পক্ষের প্রশ্ন:

এত রুদ্ধদ্বার গবেষণা করেন আপনারা, একটু গবেষণা করুন না,

কেন হচ্ছে এই ধর্ষণ?

কী তার মনস্তত্ব?

এই সমস্যা নিরসনে কী করা দরকার?

শাস্তিটা কেমন হওয়া দরকার?

পুরুষের মানসিকতাকেই একমাত্র কারণ মনে করছেন, তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়ে কালোব্যাজ ধারণ করছেন— ঠিক আছে।

কিন্তু এই মানসিকতাটা কেন ডেভেলপ করল?

কী ফ্যাক্টর দায়ী?

কী কী ফ্যাক্টর দূর করলে এই রকম মানসিকতাসম্পন্ন পুরুষ আর জন্ম নেবে না?

শাস্তিটা কেমন হলে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে পটেনশিয়াল রেপিস্টদের কাছে?

আসলে আপনারা কী চান, মানববন্ধনের ফটোসেশান না সমাধান? তা আপনারা নিজেরাই জানেন না হয়তো।

আসুন না, আজ একটু গভীরে ডুব দিই, দেখি কী পাওয়া যায় শেষমেশ। অক্সিজেন সিলিন্ডারে পর্যাপ্ত মনোযোগ আছে কি না দেখে নিন। এখন আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, মানব মনোজগতের এমন কিছু অলিতে গলিতে যেখানে বন্ধ হয়ে আসে দম, গুলিয়ে আসে গা আর বিস্ময়ের আতিশয্যে ভাষা হয়স্তব্ধ— এমনটাও হয়?!!!

ফার্মগেট ওভারব্রীজের উপর নিজেকে কল্পনা করুন। কর্মদিবসের ব্যস্ততায় জীবন্ত ফুটপাত, ‘ছুটন্ত’ রাস্তা। যেন রাস্তাটারই সময় নেই। হাজার হাজার মানুষ, ফর্সা-শ্যামলা, নারী-পুরুষ, বাচ্চা-বুড়ো। প্রতিটি চেহারার দিকে তাকান। আপনি দেখছেন মুদ্রার একটা পিঠ, এবং এই প্রতিটি মুদ্রার একটা ওপিঠ-ও আছে— মন। মন কি? .... (ঢাবি’র মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. আবদুল খালেক তাঁর ‘মন ও মনোবিজ্ঞান’ বইয়ে বলেন, যখন থেকে মনোবিজ্ঞান দর্শনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে বিজ্ঞানের গণ্ডিতে এসেছে, তখন বিজ্ঞান অদৃশ্য ‘মন’কে বাদ দিয়ে, দৃশ্যমান

‘আচরণ’কে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান তাই আর মনের বিজ্ঞান নয়, বরং আচরণের বিজ্ঞান।)

মনের একটা অংশের ছাপ ফুটে ওঠে চেহারায়— টেনশন, কষ্ট, আনন্দ, উচ্ছ্বাস। ব্যক্তি নিজেই এগুলো প্রকাশ করে স্বেচ্ছায়। মনের আরেকটা অংশ আশপাশের মানুষ বুঝতে পারে তার আচরণে-কাজেকর্মে— সরলতা, ধূর্ততা, পরশ্রীকাতরতা, আন্তরিকতা, ভালোবাসা, ঘৃণা, যৌনতা।

কিন্তু আরেকটা অংশ আছে বুঝা যায় না, জানা যায় না, ধারণাও করা যায় না। সে অংশটা সে নিজে লুকিয়ে রাখে সজ্ঞানে, সে অংশটার আলোচনা আমাদের জন্য ট্যাবু। মনের সেই গোপন কুঠুরির খবর কেউ কারোটা জানে না, সেখানে আইডিয়া চলে না, সেখানে সূত্র খাটে না। প্রেমিকা জানে না প্রেমিকেরটা, স্বামী জানে না স্ত্রীরটা, সহকর্মী জানে না সহকর্মীরটা। আমি যৌনমনোজগতের কথা বলছি না। এ জগতে তো স্বামী- স্ত্রী পরস্পরকে চেনে, জানে, বোঝে। সেখানে আর কারও প্রবেশাধিকার নেই, এমনকি ব্যক্তি নিজেই সেখানে প্রবেশ করে কালেভদ্রে। যখন আর কেউ দেখে না, যখন সব শেখানো সভ্যতা-ভদ্রতা-মূল্যবোধ-লজ্জা আর সুকুমারবৃত্তি পরাস্ত হয়, ঠিক তখনই পরাজিত এক এক সৈনিক প্রবেশ করে মনের গহীন নিষিদ্ধ এক প্রকোষ্ঠে।

প্রস্তাবনা

আমাদের জানা প্রতিটি ধর্ষণের ঘটনা স্মরণ করার চেষ্টা করুন।

- ধর্ষণের শিকার শুধু পূর্ণযৌবনা নারী-ই হচ্ছে তা নয়। নারীবৈশিষ্ট্যহীন মেয়েশিশু, পুরুষ, পশুপাখিও ভিকটিমের তালিকায় রয়েছে। লিঙ্গ-প্রজাতি এসব স্পেসিফিক না।

- শুধু ঘরের বাইরের লোকের দ্বারাই হচ্ছে তা-ও নয়। এসব লিখতেও খারাপ লাগে। আপন নিকটাত্মীয়ও জানোয়ারের রূপ ধরে ফেলার খবর আমাদের কাছে আছে।

- রাত ও নির্জন জায়গা ওদের প্রাইম চয়েস। এ থেকে মনে হয় যে, ধর্ষণ ব্যাপারটা সব সময় পরিকল্পিত।

- আবার যথেষ্ট পার্ভার্ট না হলে শিশু-পুরুষ-পশুপাখি ভিকটিমকে নিয়ে কেউ পরিকল্পনা করবে না যে, এই বাচ্চাটাকে কখন পাওয়া যায় বা সেক্সি মুরগিটাকে কিভাবে নির্জনে নেয়া যায়। এ থেকে মনে হয়, ধর্ষণ পুরোপুরি পরিকল্পিতও নয়, অনেক ক্ষেত্রে অকস্মাৎ, ধর্ষকের জন্যও। মানে অনেকটা ইমার্জেন্সী।

সব ধর্ষণের ঘটনাকে আমরা যদি একটা কমন ফর্মুলায় ফেলতে চাই, তাহলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায়—

১. মেন্টাল সেটআপ

২. পরিবেশ

৩. স্টিমুলাস বা উদ্দীপক

এই ৩ টি ফ্যাক্টর মিলে গেলে ধর্ষণ হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না, কিছুতেই না। একটু ব্যাখ্যা দরকার তাই না। আচ্ছা।

১. অনিয়ন্ত্রিত অথবা বিকৃত যৌনচাহিদাবিশিষ্ট মানুষ (পুরুষই ধরে নিচ্ছি, তবে নারীকেও একদম বাদ দিচ্ছি না)

২. যদি নির্জন বা ‘পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট নির্জন’ পরিবেশে

৩. যৌন-উদ্দীপক (নট যৌন-উত্তেজক) কিছুকে পায়। তার জন্য যৌন-উদ্দীপক হলেই হবে, এমন না যে উর্বশী তিলোত্তমা-ই হতে হবে। ঐ মেন্টাল সেট-আপে বা ঐ বিকৃতিতে ঐটাই স্টিমুলাস। ১ নং এর জন্য যে ৩ নং দরকার সেটা হলেই হবে। সেটা জন্তু হলেও হবে।

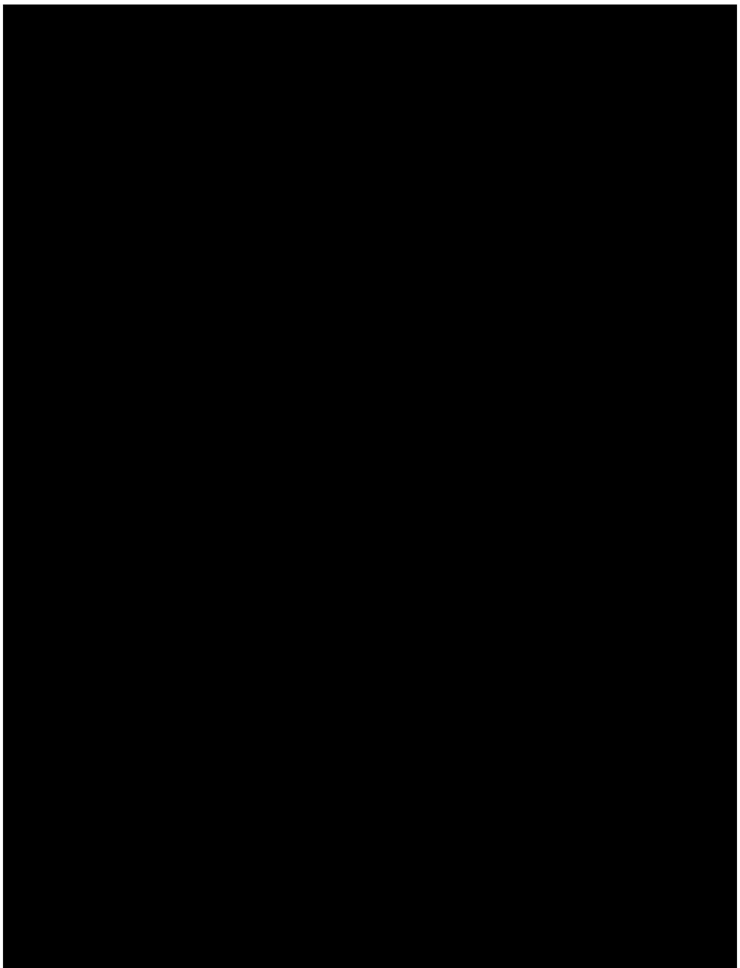

[illegible],

[illegible] ‘[illegible]’ (penetration) [illegible], [illegible] ...([illegible])

[illegible]... ([illegible])

[illegible]-[illegible]-[illegible] [illegible]... ([illegible])

[illegible]

মেয়েরা সবাই বোরকা পড়লে ধর্ষণ হবে না মর্মে প্রচলিত যে বয়ান ধার্মিক মহলে সমাদৃত, তা আমার মতে ভুল। বোরকা পরেও যদি নির্জনে ঐজাতীয় মেন্টাল সেট-আপের (যার কাছে ঐ মুহূর্তে সেক্স ইমার্জেন্সি) কারো কাছে পড়ে গেলে, ঘটনা ঘটবে; যেমনটি আমরা কিছুদিন আগেই এক মাদ্রাসা শিক্ষিকার বেলায় দেখেছি। বোরকা পরার কারণে ৩ নং ফ্যাক্টর হয়ত প্রতিরোধ করেছে; কিন্তু বার্থডে পার্টি, রাতে নির্জন রাস্তা দিয়ে আসা বা রাত্রে ক্যাম্পাসে আল্পনা করার দ্বারা ২ নং ফ্যাক্টর এবং অনিয়ন্ত্রিত যৌনমানসের কারো হাতে পড়ার দ্বারা ১ নং ফ্যাক্টর বর্তমান থাকায় সেখানেও ধর্ষণ হবে। মোদ্দাকথা, এই ৩ টি ফ্যাক্টর একত্রিত হলে যদি মিরাকল না ঘটে তাহলে ধর্ষণ হবে। আমার প্রস্তাবনা হল,

নির্দিষ্ট মেন্টাল সেট-আপের কেউ (১) নির্দিষ্ট জায়গায়/সময়ে (২) নির্দিষ্ট স্টিমুলাসের কিছু পেলে (৩) ধর্ষণ সংঘটিত হয়।

এবার আমরা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করছি।

ফ্যাক্টর ১: মেন্টাল সেট-আপ

যৌনতা সহজাত মানব চাহিদা। ক্ষুধা-তৃষ্ণা- আরাম-মলমূত্রত্যাগ এগুলো যেমন সহজাত মানবিক আবশ্যিক প্রয়োজন। যৌনতাও আলাদা কিছু নয়।
মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এগুলোকে বলে ‘প্রেষণা’ (Motivation)।

মনোবিজ্ঞানী Woodworth এর মতে, প্রেষণা ব্যক্তির একটি অবস্থা/প্রবণতা যা তাকে কোন আচরণের দিকে/ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নিয়োজিত করে।

মনোবিজ্ঞানী Wenger বলেন, প্রেষণা হল প্রাণীর একটি আভ্যন্তরীণ অবস্থা যা তাকে এক বিশেষ ধরনের কাজে অবিরত লেগে থাকতে বাধ্য করে।

মানে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত হলে প্রাণীর মধ্যে যে গতিশীল/সক্রিয় অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে প্রেষণা বলে। এ অবস্থায় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার তীব্র ইচ্ছার উদয় হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্দেশ্য পূরণ না হয় ততক্ষণ এই গতিশীল অবস্থা চলতে থাকে। [1]

যেমন খাদ্যের প্রেষণা তাকে খাবারের সন্ধানে লাগিয়ে দেয়, খাওয়ার মধ্যেও সীমারেখা আছে, আদব আছে, সভ্যতা আছে। ক্ষুধামন্দা, অতিভোজন, বেশি বাছবিচার— সবই সমস্যা। ঘুমেও তেমনি; অনিদ্রা,অতিনিদ্রা, নিদ্রালুতা, নিদ্রাপ্রিয়তা— কোনটাই কাম্য নয়। মানে, সহজাত মানবচাহিদাও লাগামছাড়া হবে না, চাহিদা হবে নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত চাহিদা দেয় সুস্থজীবন-সুস্থ সমাজ- সুস্থ পৃথিবী। আর অনিয়ন্ত্রিত চাহিদা ব্যক্তিকে ধ্বংস করে, সেই সাথে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র সব।

প্রথমত স্বীকার করে নিতে হবে যৌনতা একটা স্বাভাবিক মানব চাহিদা, যেমনটি ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ঘুম। আলাদা কিছু না। সামনে খাবার থাকলে কিংবা না থাকলে, পানি থাক বা না থাক, আরামের ব্যবস্থা থাক বা না-ই থাক, মলত্যাগের ব্যবস্থা থাকলে কিংবা না থাকলেও, প্রয়োজন/চাহিদা হলে এগুলো পূরণ করা হবেই, করতে হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। প্রেষণার সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি প্রেষণা পূরণ করার জন্য প্রাণী যেকোন উপায় খুঁজে নেয়। তেমনি যৌনতার পরিবেশ করে দিলে, কিংবা না দিলেও প্রাণী পরিবেশ করে নেবে চাহিদা পূরণের জন্য। স্বাভাবিক উপায় না পেলে ভিন্ন উপায়ে যাবে, কিন্তু যাবেই। এটাই প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক। তবে অন্যান্য প্রেষণা/চাহিদার মত, এটাও হতে হবে লাগামওয়ালা, নিয়ন্ত্রিত, সীমানিরূপিত ও ভদ্রোচিত।

পশ্চিমাদের একটা বড় সমস্যা হল, যৌনতাকে মানবীয় প্রয়োজন হিসেবে স্বীকার না করা। যদি এটা অপরিহার্য অনিবার্য মানবিক চাহিদা না-ই হবে তাহলে একটা সিঙ্গেল পর্নসাইটে প্রতিদিন ৮ কোটি ভিজিটর কী

করেন?[2] টপ ৫ টা পর্নসাইটে প্রতিদিন ২০ কোটি বার কেন ভিজিট হচ্ছে, বাকিগুলোর কথা বাদই দিলাম?[3] যৌনচাহিদা যদি খিদে-পিপাসার মত সমান অনিবারণযোগ্য প্রয়োজন না-ই হয়, তবে ১৩-২৪ বছর বয়েসী ৬৪% তরুণ-তরুণী সপ্তাহে কমপক্ষে ১ বার কেন পর্ন খোঁজে?[4] এটাই প্রমাণ করে যৌনতা এমন এক চাহিদা, যা অন্য কিছু দিয়ে পূরণ করে দেয়া যায় না। ক্ষমতায়ন করে, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা নিশ্চিত করে তা ভুলিয়ে দেয়া যায় না। যৌনতা ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতই একটা মানবীয় প্রয়োজন, স্বতন্ত্র চাহিদা। নির্দিষ্ট সময় পর যেমন ক্ষুধা লাগে, তৃষ্ণা পায়, যৌনতাও তেমন। এটা আলোচনা বা বিবেচনায় না আনলেই তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।

শুরুতে আমি মনোজগতের এক গোপন কুঠুরির কথা আপনাদেরকে বলেছিলাম। যাকে ব্যক্তি সজ্ঞানে আড়াল করে চলে। এমনিতেই মনোজগত একটি গুপ্ত বিষয়। তার মাঝে যৌনমনোজগত আরও গোপনীয়। সেই গহীন যৌনমানসেরও গহীনে গিয়ে দেখা মেলে আরেকটি কন্ট্রোলরুমের, যার নাম— যৌন প্রতীকবাদ বা সেক্সুয়াল সিম্বোলিজম। সিম্বল শব্দের অর্থ প্রতীক।......

যৌনমনোবিজ্ঞানের ভাষায়, যা ব্যক্তির মাঝে যৌন আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং সে যে জিনিসের দ্বারা যৌনকাজে উদ্বুদ্ধ হয় (Turn on) সেটিই তার জন্য যৌন প্রতীক। সেই জিনিসটি তার যৌন প্রেষণাকে নিয়ন্ত্রণ করে । আমরা মানুষের যৌনমানস ও যৌন আচরণ দুটোকে একসাথে ‘যৌন কাঠামো’ বলবো। মোটকথা যৌন প্রতীক মানুষের যৌন কাঠামোর নিয়ন্ত্রক।

কোন ব্যক্তির পুরো যৌনকাঠামোটিকে নিয়ন্ত্রণ করে তার সিম্বল। যৌনজীবনের প্রথম দিকের গবেষকগণ মানুষের যৌনজীবনের একটিই কাঠামো হতে পারে বলে বিশ্বাস করতেন— যার জন্য তারা এর নামকরণও করেননি, একটাই তো। এবং মনে করা হত, ব্যক্তি সহজাতভাবেই এই কাঠামোটিকে আবিষ্কার করে নেবে বড় হলে, শিখিয়ে দেবার দরকার নেই। কিন্তু পরবর্তী গবেষকদের বিস্তৃত অনুসন্ধানে উঠে আসে এক বিশাল মহাসাগর।

তাঁরা বলতে বাধ্য হন— মূলত পৃথিবীতে যত জন মানুষ আছে, যৌনজীবনের ঠিক ততগুলোই কাঠামো রয়েছে [5]। প্রতিটি মানুষের যৌন কাঠামো ইউনিক, একদম ভিন্ন ভিন্ন। হুবহু এক হয় না কখনই। এর কারণ হল, প্রত্যেকের সিম্বল ভিন্ন, যৌন আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ভিন্ন, ফলে যৌনচিন্তাও ভিন্ন ভিন্ন [6]। আসুন দেখি কতটা ভিন্ন, এটা কি অলিগলি নাকি গোলকধাঁধাঁ? এমনও সম্ভব?

অলিগলি

কোন মানুষই এই সিম্বলের বাইরে না। সিম্বল একটা ব্যাপক টার্ম। ‘যা কিছু’ মানুষের যৌন আগ্রহের সুইচ হিসেবে কাজ করে সবই সিম্বল। সেটা অতিস্বাভাবিক প্রেমের প্রতিফলন হতে পারে, আবার অত্যন্ত ভয়াবহ যৌনবিকৃতিও হতে পারে। আবার কেবল ‘সুস্থ যৌন অনুভূতির সূচনাকারী’ এবং ‘মিলনের সহায়ক’ হতে পারে। এ থেকে শুরু করে ‘সুস্থ যৌনমিলনের বিকল্পও’ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে যদি কী কী জিনিস প্রতীক হতে পারে তা আগে দেখে নিই।

সুবিধার জন্য ৩ টি প্রধান শ্রেণীতে আমরা সিম্বলগুলোকে ভাগ করে নেবঃ[7]

১. জীবন্ত/ শারীরিকঃ

ক. স্বাভাবিকঃ হাত, পা, স্তন, নিতম্ব, কেশ, গায়ের গন্ধ, লালা, ঘাম, যৌনকেশ।

খ. অস্বাভাবিকঃ খোঁড়া, কুঁজো, প্রস্রাব, পায়খানা, বসন্তের দাগ, শিশু, বয়স্ক, সমলিঙ্গ, মৃতদেহ, পশু।

২. জড় পদার্থঃ

ক. মানুষের সাথে সম্পর্কিতঃ হাতমোজা, জুতো, রুমাল, অন্তর্বাস, চশমা।

খ. মানুষের সাথে সম্পর্কহীনঃ মূর্তি

৩. কার্য ও প্রবণতাঃ

ক. সক্রিয়ঃ অত্যাচার করা, নিষ্ঠুরতা, যৌনাঙ্গ প্রদর্শন, চুরি করা, অঙ্গচ্ছেদ, হত্যা।

খ. নিষ্ক্রিয়ঃ নির্যাতিত হওয়া, সুগন্ধ ও কণ্ঠ শোনা।

গ. দৃশ্যের প্রতি আকর্ষণঃ পোষাক পরিবর্তন, মলমূত্রত্যাগকর্ম, জানোয়ারের মৈথুন।

যেটা বলছিলাম, স্ত্রীর পা দেখে কামার্ত হওয়া যতটা স্বাভাবিক ও সুন্দর, যেকোন নারীর পা দেখে কামার্ত হওয়া তার থেকে একটু ‘কেমন যেন’ হলেও স্বাভাবিক। কিন্তু কারো সিম্বল যখন শিশু বা পশু, তা তখন বিকৃতির মধ্যে চলে গেল। এগুলো সবই সিম্বল। একজনের জন্য যা সিম্বল, আরেকজনের জন্য তা কিছুই না, বা হাস্যকর। স্তন কমবেশি সব স্বাভাবিক পুরুষের জন্যই সিম্বল, কিন্তু জুতো সবার জন্য সিম্বল না। চুল কারো উত্তেজনার সূচনা, কারো কাছে কিছুই না। নিজ স্ত্রীর পোশাক বা অন্তর্বাস দেখে কাম জাগতে পারে, আবার সব নারীর পোশাক দেখেও উত্তেজনা আসতে পারে; কিংবা পোশাক না, জাস্ট থানকাপড় বা ফেব্রিক দেখেও (সিল্ক, সাটিন, ল্যাটেক্স, ফার) কামভাব আসতে পারে কারও। এগুলোর কিছু স্বাভাবিক মিলনে সহায়ক, যেমন স্ত্রীর পোশাক দেখে মিলনের আগ্রহ আসা। স্ত্রীর পোশাকই যদি স্ত্রীকে বাইপাস করে ফেলে মুখ্য আকর্ষণ হয়ে যায় তা হয়ে পড়ে অস্বাভাবিক। এভাবে একদম নির্দোষ সিম্বলও হয়ে যেতে পারে বিকৃতির কারণ।

অনেকে ভাবছেন কীসব বাকওয়াস শুরু করেছি। না বন্ধু এগুলো আসলেই বাস্তবে রয়েছে।

- ডার্কওয়েবে গেলে দেখবেন হাজার হাজার টেরাবাইট শিশুপর্নো। এগুলো কারা দেখে?

- পর্নোসাইটে শতশত ল্যাটেক্স, স্প্যান্ডেক্স, লেগিংস, জিন্স, সিল্ক, সাটিন, ফার ফেটিশ পর্নো আমার কথার বাস্তবতাকে প্রমাণ করে।

- পশুর সাথে সেক্স করাকে বলা হয় Bestiality. হাজারো ভিডিও ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘোড়া-কুকুর-শূকর- ছাগলের। এগুলো কেউ না কেউ তো দেখে।

- যৌনসঙ্গীকে প্রহার-ব্যথা দেয়া-ছ্যাঁকা দেয়া-কেটে দেয়া এবং এর ফলে কামোত্তেজনা অনুভব করাকে বলে Sadism.

- আর নিপীড়িত হয়ে যে কাম অনুভব করে সেটাকে বলে Masochism.

- নিজ লিঙ্গ আরেকজনকে দেখিয়ে উত্তেজনা আসাকে বলে Exhibitionism.

- মৃতদেহের সাথে মিলনেচ্ছাকে বলে Necrophilia, যেখানে মৃতদেহের শীতলতা কাম জাগিয়ে তোলে। ডার্কওয়েবে ছড়িয়ে আছে এসব পর্নো ভিডিও, কোথায় চলে গেছে পশ্চিমা সভ্যতা আমাদের ধারণাই নেই।

- পায়ুমিলনের ফলে এক পর্যায়ে বেরিয়ে আসে রেক্টাম (Prolapse), এটিও কিছু মানুষ আছে যারা উত্তেজিত হয় দেখে, একে বলে Rosebudding.

- সেক্সের শেষে পায়খানা বা পেশাব করে দেয় সঙ্গী, সেগুলো গায়ে মেখে বা খেয়ে উত্তেজনার নির্বাপিত হয় কারো। একে বলে Coprophilia। কী, খারাপ লাগছে শুনতে? পর্নোসাইট এসবে ভর্তি। এগুলোই মানবমনের অলিগলি, যার শেষে নর্দমা আর ডাস্টবিনের পচা গন্ধ।

- হাজারো ভিডিও রয়েছে Footjob এর যারা পা দেখে কামার্ত হয় তাদের জন্য।

- কিংবা Hairjob, চুলের প্রতি যাদের আকর্ষণ তাদের জন্য।

- লুকিয়ে লুকিয়ে কাউকে দেখে উত্তেজিত হওয়াকে বলে Voyurism

- আর কাউকে পেশাব করতে দেখে উত্তেজিত হওয়াকে Uranism বলে।

- ফেসবুকেই আছে বহু আইডি যারা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক দিয়ে উত্তেজনা প্রশমন করে ভিডিও দেয়। কিংবা পিছন থেকে মহিলাদের হাঁটা ভিডিও করে।

- কেউ আছে বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরে কামের শীর্ষে চলে যায় (Transvestism)। এগুলো অধিকাংশই আমরা পড়েছি ফরেনসিক মেডিসিনে।

- কিছুদিন আগে আমরা ফেসবুকে দেখলাম এক লোক বাসে নারীদের পোশাক কেটে আনন্দ পায়।

- বহু আইডি আছে যারা মেয়েদের চকচকে বোরকার ছবি কালেক্ট করে, বোরকার বা পোশাকের শাইন/ গ্লস দেখে উত্তেজিত হয়। যাবেন কোথায়?

বিচ্যুতি বাদ দিলেও স্বাভাবিক যৌনচর্চার মাঝেই রয়েছে অগণিত প্রকারভেদ। ফ্রয়েডীয় ঘরানার বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী হ্যাভলক এলিস। তাঁর ৭ খণ্ডের বই Studies in the Psychology of Sex. এই বিশাল কিতাবের সংক্ষেপায়ন The Psychology of Sex-এ তিনি বলেন, প্রতীক বনে যাওয়া এমন বস্তুর সংখ্যার কোন ব্যবহারিক সীমা নেই, যাতে কেবল শরীরে অঙ্গই নয়, বরং নির্জীব বস্তুও এসে যায়। [1] তবে এসবের স্বাভাবিকতার সীমারেখা কি? তাঁর মতে ২ টি শর্ত পেলে আমরা সিম্বলিজমকে বিচ্যুতি বলব—

১. যখন তা এতটা বিস্তৃত হয়ে যায় যে, যৌন সম্ভোগের কেন্দ্রীয় কার্যের (Penetration) ইচ্ছার (মিলনেচ্ছা) স্থানটা নিয়ে নেয় [2]।

2. স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকার জন্য সমস্ত প্রকারান্তরগুলোর জন্য এটা আবশ্যক যে, সেগুলোর মধ্যে প্রজননতত্ত্ব সম্মিলিত থাকে, যার জন্যই সেক্সের অস্তিত্ব। এমন কার্যকলাপ উচিতরূপে মস্তিষ্কবিকৃতির সূচক বলে মনে করা যেতে পারে যাতে প্রজনন সম্ভব নয় [3]।

তাঁর মতে, যৌন আবেগের বিচ্যুতিসমূহের মধ্যে অসংখ্য প্রকারভেদ আছে, আর সেসবের সীমাও ব্যাপক। এর এক প্রান্তে আমরা পাই নির্দোষ ও সুখকর আকর্ষণ; যেমন, প্রেমিক প্রেমিকার হাতমোজা ও চপ্পল থেকে। এ

এমন এক আকর্ষণ যা মার্জিত ও সুস্থতম মস্তিষ্কের ব্যক্তিটিও অনুভব করে। আরেক প্রান্তে আমরা পাই খুনী হামলা , যার তুলনা হতে পারে ‘জ্যাক দ্য রিপার ’। [4]

SAGE Journals প্রকাশিত দ্বিমাসিক পিয়ার রিভিউড জার্নাল *Psychological Reports* এ একটা রিসার্চ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় [5]। Hofstra University-র William J. Ruth এবং New Rochelle, New York-এর Harriet S. Mosatche এবং Passaic County Community College-এর Arthur Kramer এর প্রাপ্ত ১৯৮৫ টি ডাটা ফলো -আপ করে বেরিয়ে আসে আমি এতোক্ষণ যা বললাম। তারা ক্রেতার ক্রয় করার ইচ্ছার উপর সেক্স সিম্বলের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেন। মদের কিছু বিজ্ঞাপনে তারা যৌন সিম্বল রাখেন যা যৌনমিলনকে রিপ্রেজেন্ট করে , আর কিছু বিজ্ঞাপন রাখেন সিম্বলিজম ছাড়া। ক্রেতারা সিম্বলিক পণ্য কিনতে সর্বদাই বেশি আগ্রহী হয়েছে। এই রিসার্চটি ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ তত্ত্বকে সাপোর্ট করেছে।

ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব (psychoanalytic postulate) এটাই আমাদের বলে যে, যৌন সিম্বলিজম অজ্ঞাতসারে দর্শককে তার উদেশ্যপ্রণোদিত আচরণের দিকে তাড়িত করে। (supported the psychoanalytic postulate that sexual symbolism unconsciously motivates an observer toward goal-directed behavior)

প্যারাফিলিয়া

সিম্বলিজম থেকে যৌন বিচ্যুতি , যৌনবিচ্যুতি থেকে প্যারাফিলিয়া। Diagnostic and Statistical Manual, 4th edition (DSM-IV) অনুসারে [6], কমপক্ষে ৬ মাস বার বার প্রবল যৌন উত্তেজক ফ্যান্টাসি বা কোন প্যারাফিলিক / যৌনবিচ্যুত আচরণের তাড়না অনুভব করা যা সামাজিক /পেশাগত/ব্যক্তির অন্যান্য জরুরি কাজে এতটা বাধা ও কষ্টের

কারণ হয়, যা চিকিৎসার দাবি রাখে (clinically significant); তাহলে একে প্যারাফিলিয়া বলে। ২০০০ সালে এই সংজ্ঞায় যোগ হয়, রোগী নিজে কষ্ট না পেতে পারে, রোগীর দ্বারা ‘ইচ্ছুক নয় এমন অন্য কেউ’ কষ্ট পেলে, তাও প্যারাফিলিয়া বলে গণ্য হবে। International Classification of Diseases, 10th revision –এ আরেকটু বেশি বলা আছে, যৌন উত্তেজনা ও তৃপ্তির জন্য যেসব প্যারাফিলিক আচরণ করা হয়, সবই এর অন্তর্গত [7]।

আসুন একটু সাহস করে দেখে ফেলি কী কী আচরণ এই প্যারাফিলিয়ার আওতায় পড়েঃ [8]

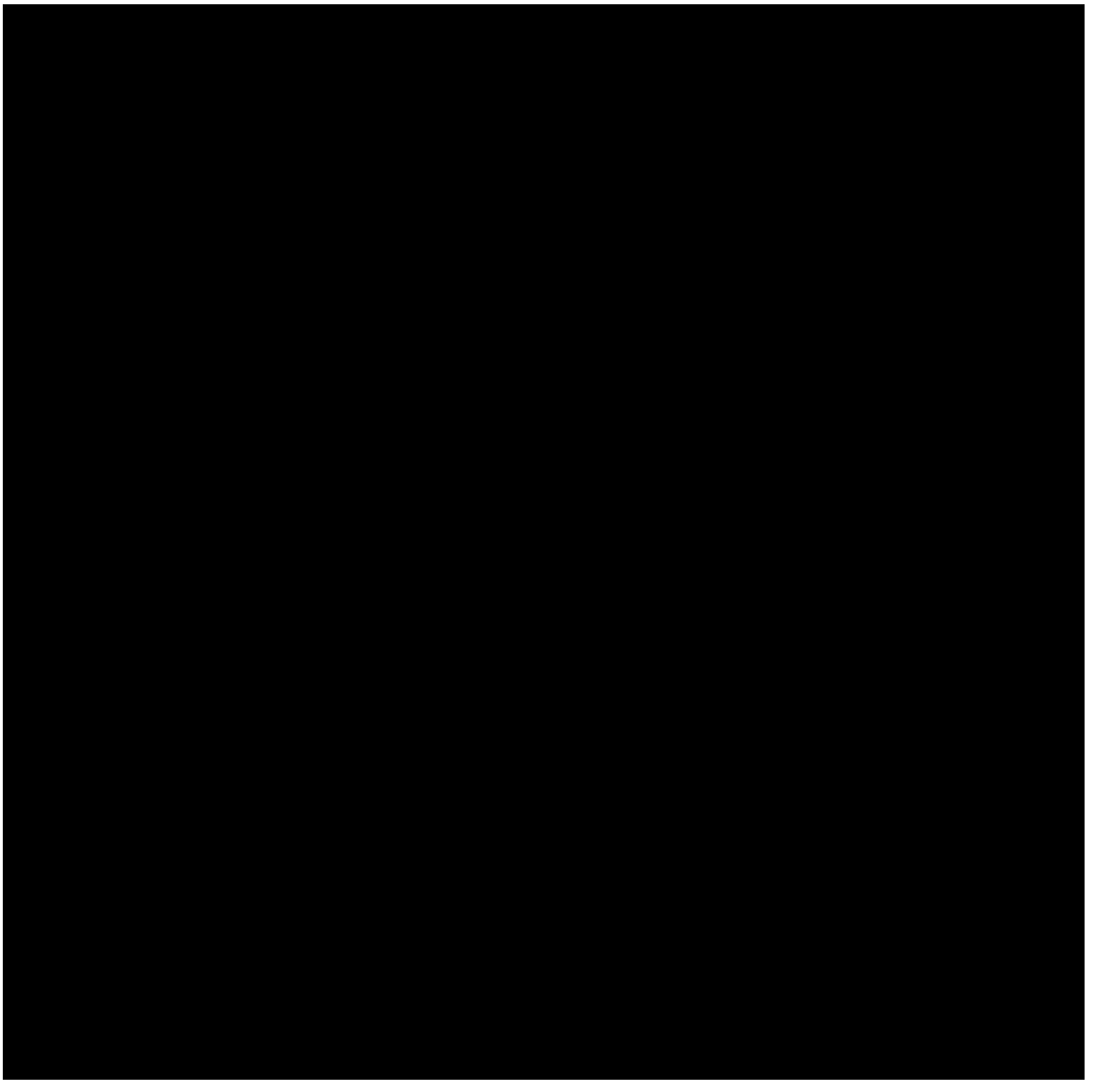

আবার আপনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই ফার্মগেট ওভারব্রীজের উপরে। হাজার হাজার মানুষ। কর্মব্যস্ততায় যাদের এসব নিয়ে ভাবার ফুরসতই নেই বলে মনে হয়। অথচ প্রত্যেকের আছে একটা মন যার কোন সংজ্ঞা নেই, যা দুইজনে কখনও এক না। সেই মনের আছে একটা গোপন গহীন কুঠুরি, কন্ট্রোল-রুম, সিম্বোলিজম। হাজার হাজার মানুষের হাজার হাজার সিম্বোলিজম। কেউ কারোটা জানে না, অনেক সময় ব্যক্তি নিজেও ততটা ওয়াকিবহাল থাকেন না। হাজার হাজার মেন্টাল সেট-আপ। যেগুলো জানা সম্ভব না, সাজানো সম্ভব না, সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব না, নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না। কে সিম্বোলিজমের কোন বিচ্যুতিতে কোন পর্যায়ে আছে জানা সম্ভব না।

আপনার মনে হতে পারে আমি বাড়িয়ে বলছি। এই হাজার হাজার মানুষ কি আর খারাপ নাকি? এদের সবাই কি ধর্ষক নাকি? এভাবে ভাবলেই তো দুনিয়াতে চলাই যাবে না। এই প্রশ্নের জবাব একটু পরে দিচ্ছি। মনে রাখবেন, নিতান্ত সহজ সরল আঁতেল ছেলেটারও আছে একটা গহীন কুঠুরি। আপনার সবচেয়ে কেয়ারিং ছেলে বন্ধুটারও (বয়ফ্রেন্ড না) আছে একটা সিম্বল। আপনার পাশের বন্ধু বা সহকর্মীটি আপনার কোন জিনিস নিয়ে ফ্যান্টাসিতে আছে আপনি জানেন না। আপনার নিকটাত্মীয়ের একটা মন আছে, যার নেই কোন সংজ্ঞা, নেই কোন পূর্বাভাস বা প্রেডিকশান। প্রেষণা সবার আছে, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণ করাকেই আমরা মনুষ্যত্ব বলি, তা পূরণ করাকে নয়। কিন্তু একটা প্রেষণা নিয়ন্ত্রণে আছে বলেই যে তা সবসময়ই নিয়ন্ত্রণেই থাকবে ব্যাপারটা কি তা-ই? না, পরিবেশভেদে ও পরিস্থিতিভেদে আপনার আমার প্রেষণাও লাগাম ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। কী সেই পরিবেশ আর কী সেই পরিস্থিতি সে বিষয়ে একটু পরে আসছি।

২. নির্জন

এ এক অন্য দুনিয়া। এখানে আইন চলে না। আইন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু চিন্তাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে না। অথচ এই চিন্তাপ্রবাহ-ই নিয়ন্ত্রণ করে আচরণকে। আইনের কারণে সে হয়ত সবার সামনে নিজের প্রেষণা পূরণ করছে না। কিন্তু তাই বলে আইন তো তার মেন্টাল সেট-আপ বদলে দিতে পারেনি। সুতরাং—

যেখানে আইন নেই,

যেখানে আইনের পৌঁছানোর সুযোগ নেই বলে তার মনে হবে,

কিংবা যেখানে চক্ষুই নেই যে চক্ষুলজ্জা থাকবে,

বা যখন সে মনে করে যে কেউ দেখার নেই, লুকিয়ে করতে পারবে, ধরা পড়বে না

তখন সে বেরিয়ে আসে, তীব্র প্রেষণা তাকে তাড়িত করে। প্রেষণার সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি, যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্দেশ্য পূরণ না হয় ততক্ষণ প্রেষণা চলতে থাকে। সে যেভাবেই হোক নিজের মেন্টাল সেট-আপের অনিবার্য তাড়না কে প্রশমিত করবে।

এক্ষেত্রে হয়—

- আগে থেকেই নির্জন থাকবে, উদ্দীপক নিজেই এক্সিডেন্টালি নির্জনে এসে পড়বে। (যেমন চলন্ত বাসে ধর্ষণ, ডেটিং রেপ)

- বা সে অপহরণের মাধ্যমে উদ্দীপককে নির্জন জায়গায় নিয়ে যাবে। (পোড়োবাড়ি, ক্ষেত)

University of Missouri –র মনোবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক Zoë D. Peterson সাহেব ১২০ জন ১৮-৩০ বছর বয়েসী পুরুষের উপর জরিপ করেন। তিনি পান, এরা যারা মোটামুটি নিশ্চিত যে রেপ করার পর শাস্তি এড়িয়ে পার পেয়ে যাবে, তাদের যৌন ভায়োলেন্সের সম্ভাবনা বেশি। (those who felt sure they could get away with rape without punishment were more likely to report they used coercive behavior.)[1] অর্থাৎ হয় এরা নির্জনে পেয়ে গেছে, অথবা কিডন্যাপ করে নির্জনে নিয়ে গেছে। যেখানে আইন পৌঁছবে না বলে তারা মনে করেছে।

১৯৮৭ সালে ৩১৮৭ জন কলেজপড়ুয়া মেয়েদের এক জরিপে দেখা যায় তাদের ১৫% ধর্ষিতা হয়েছে। এখন এই হার আরও বেশি। ধর্ষিতাদের ৫৬% জানিয়েছে যে, ডেটিং-এ গিয়ে তারা রেপড হয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমসকে জানিয়েছেন University of Arizona Medical School এর মনস্তত্ত্ববিদ

Dr. Mary Koss. দেখা যাচ্ছে এরা স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে নির্জনে প্রেজেন্ট করেছে। [2]

৩. উদ্দীপক

উদ্দীপক আর উত্তেজক এক না।

শিশুকামীর জন্য ছোট শিশু উত্তেজক। সে বেছে বেছে শিশুই খোঁজে, শিশুই তার প্রথম চয়েস।

আর একজন নর্মাল ধর্ষকের জন্য শিশু উদ্দীপক, একটা কিছু হলেই হয়। সে শিশুর জন্য তক্কে তক্কে থাকে না। মেন্টাল সেটআপ অসহনীয় হয়ে ছিল, নির্জনে পেয়ে গেছে, এখন দরকার, কিছু একটা হলেই হয়।

আমি আগেই বলেছি ধর্ষণ সবসময় পরিকল্পিত না, কখনও কখনও ধর্ষকের জন্যও সারপ্রাইজ, আকস্মিক (impulsive)। সে তখন আর নিজের মধ্যে নেই। সে তখন প্রবেশ করেছে অন্ধকুঠুরিতে। এখন তার প্রয়োজন, তার প্রেষণা।

আগে থেকেই তার মাঝে মেন্টাল সেট-আপ ছিল। সেটা হতে পারে বিকৃত (শিশুকাম)। আবার হতে পারে স্বাভাবিক কিন্তু প্রচণ্ড অনিয়ন্ত্রিত (নির্জনে একটা শিশুই পেয়ে যাওয়া)। সামনের আলোচনাগুলোতে আরও ক্লিয়ার হবে আশা করি।

তেমনি বোরকা পরা মেয়েও হতে পারে উদ্দীপক, যদিও সে উত্তেজক না। যদি নির্জনে পাওয়া যায়। মোদ্দাকথা নির্জনে পাওয়া যে কোন কিছুই মেন্টাল সেট-আপের তীব্রতার উপর নির্ভর করে উদ্দীপক হয়ে যেতে পারে যদিও তা উত্তেজক নয়। আবার এমন এমন জিনিস মেন্টাল সেট-আপ ভেদে উদ্দীপক হয়ে যেতে পারে যা আমাদের কাছে হাস্যকর বা চিন্তায়ও আসে

□□□□□□, □□□□□-□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ Boston University Medical School-□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ Dr. Robert Prentky □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□, □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

* সুযোগসন্ধানী ২৩%, ডেটিং-এ যারা রেপ করে তারা এই ক্যাটাগরির।

* আগে থেকেই সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসিতে ভোগে এমন ২৫%, এরা ভাবে কোন মেয়েকে রেপ করতে পারলে মেয়েটি তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়বে। এরা ‘রেপ মিথে’ বিশ্বাসী।

* ৩২% ভিনডিকটিভ টাইপ, এরা মেয়েদের প্রতি কোন কারণে রাগের বশবর্তী হয়ে রেপ করে।

* ১১% স্বভাবগত রাগী, সবার প্রতিই রাগী। এরা ভিকটিমকে দৈহিকভাবে আহত করে ফেলে।

* ৮% হল একদম বিকৃতমনা, স্যাডিস্ট। এদের কাছে ভিকটিমের ভয় পাওয়াটাই বেশি উত্তেজনাকর (victim's fear is a sexual stimulus) ।

আশ্চর্যের বিষয় এই ৮% বাদে বাকি ৯২% ধর্ষকেরই যৌন আগ্রহ ও পছন্দ স্বাভাবিক। সুতরাং ধর্ষকেরা রুচিগতভাবেই পশু, এই বহুল প্রচলিত ধারণাটা ভুল প্রমাণ হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি। এই ৯২% সাধারণ মানুষ রুচিগত বিকৃতির কারণে নয়, বরং ভিন্ন কোন কারণে এমন অস্বাভাবিক আচরণ করেছে। এ পর্যায়ে আমরা প্রতিটি টাইপ এবং তার কারণ নিয়ে আলোচনা করব, এবং ক, খ, গ... এভাবে মার্ক করে রাখব, যাতে পরে পয়েন্ট ধরে ধরে সমাধান আলোচনা করতে পারি। এতোক্ষণের পুরো আলোচনা স্মরণ করার অনুরোধ। আমরা এখন সমস্যা চিহ্নিত করতে নেমেছি। শ্রেণিকরণ ছকটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

টাইপ ১-স্যাডিস্ট রুচি (৮%)

আমরা পেয়েছি, এরা রুচিগতভাবে বিচ্যুত। ভিকটিমের ভীত, যন্ত্রণাময় চেহেরা এদের যৌন উত্তেজনা ও তৃপ্তিকে পূর্ণতা দান করে। অর্থাৎ এদের যৌন সিম্বল হচ্ছে, কাউকে যন্ত্রণা দেয়া, কষ্ট পেতে দেখা, স্যাডিজম। যেটা হ্যাভলক এলিসের মতে, বিচ্যুতির পর্যায়ে পড়ে। কেন একটা সিম্বলিজম বিচ্যুতির বা বিকৃতি হয়ে গেল? কী এর কারণ যার জন্য একজন মানুষের ভাবনা এতটা বিকৃত হতে পারে? চলুন দেখি কী কী কারণে সিম্বলিজম বিচ্যুত হয়ে নিজেই মানবমনের চালকের আসনে বসে যেতে পারে।

কারণ

হ্যাভলক এলিসের মতে, নিঃসন্দেহে সময়ের পূর্বে যৌন পরিপক্কতা এই বিচ্যুতির অনুকূলে পড়ে (Precocity is undoubtedly a condition which favours such deviation; a child who is precociously and abnormally sensitive to persons of opposite sex before puberty has established the normal channels of sexual desire is peculiarly liable to become the prey of a chance symbolism.)।

আরও বলেন, ব্যক্তির মধ্যে এমন সিম্বোলিজম সব মাত্রায় দেখা যেতে পারে। অল্প অনুভূতিশীল স্বাভাবিক প্রেমিকের তো এই বিষয়ে অনুভূতি একেবারেই হয় না। তবে যৌন বিষয়ে অধিক সচেতন (alert) এবং কল্পনাপ্রবণ (imaginative) প্রেমিকের জন্য এগুলো উত্তেজনাকে সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতা দেবার জন্য চমৎকার অংশ (fascinating part of highly-charged crystallization of passion)। [1]

উপরের দুটো কথা খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে এই সিম্বোলিজম আমাদের মাঝে প্রবল হবার ২ টো কারণ টের পাওয়া যায়।

1. বয়স হবার আগেই যৌন পরিপক্কতা এসে পড়া...[ক]। ফলে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণটা আগে আগেই এসে পড়ে। যখন স্বাভাবিক কামনার প্যাটার্নটা সে আগে আগেই ধরে ফেলে, একটা পর্যায়ে সে নতুন কিছুর খোঁজে লেগে যায়। স্বাভাবিক মানবসত্তার দাবি হিসেবে সে নতুন কিছুর প্রতি কৌতূহলী হয়। তৈরি হয় সিম্বোলিজম।

2. যারা যৌন বিষয়ে বেশি সচেতন, বেশি ভাবে এবং বেশি কল্পনাপ্রবণ, যৌন বিষয়গুলো নিয়ে বেশি বেশি কল্পনা করে, ফ্যান্টাসিতে ভোগে...[খ] তাদের মাঝে এই সিম্বোলিজম স্পষ্ট হয়।

3. সিম্বোলিজমই একটা পর্যায়ে মূলবস্তুতে পরিণত হয়। একপর্যায়ে হয় বিচ্যুতি। হ্যাভলক এলিস বলেন, প্রথমে এটা থাকে প্রেয়সীরই একটা মনোলভা বৈশিষ্ট্য, এরপর এটা গিয়ে দাঁড়ায় প্রেয়সীর আবশ্যক সাজ, এরপর প্রেয়সী নিজেই হয়ে পড়ে গৌণ, কেবল সিম্বল-ই পূর্ণ তৃপ্তি ও কামনার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এসময় আমরা একে বিচ্যুতি বা রোগ মনে করি। [2] সিম্বলিজমের এই বিবর্তন হয় অধিক পরিমাণ কল্পনার (sexual fantasy) দ্বারা।

৩টি পয়েন্টকে মিলিয়ে আমরা যেটা পাই, সেক্স বুঝার বয়স এবং স্বাভাবিক সেক্সে অভ্যস্ত হবার মধ্যবর্তী সময় যত দীর্ঘ হবে তত সে সেক্স নিয়ে জল্পনা-কল্পনা বা ফ্যান্টাসি করার সময় বেশি পাবে। তত তার মেন্টাল সেট-আপ বিচ্যুতি বা বিকৃতির সম্ভাবনা বাড়বে...[গ]। যৌনজীবনের স্বাভাবিকতা বিবর্জিত এসব ফ্যান্টাসি তাকে ক্রমশ স্বাভাবিক যৌনজীবনের কেমিস্ট্রি থেকে অন্য এক ভুবনে নিয়ে যাবে। আর এই আগুনে ঘি ঢালবে পর্নোগ্রাফি...[ঘ], যা তার ফ্যান্টাসির জগতকে আরও উস্কে দেবে, লালন করবে।

টাইপ-২ রেপ মিথে বিশ্বাস (২৫%)

ধর্ষণ সম্পর্কে আমাদের সমাজে বা ছেলেদের মনে কিছু ভুল ধারণার জন্ম নেয়। যেগুলো বলা হয় রেপ মিথ (Rape Myth)। এই ছেলেগুলো আগের ৮% এর মত বিকৃত রুচির না, স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কারণে রেপ সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা তাদের মনে বিশ্বাসের পর্যায়ে চলে গেছে। প্রথমে দেখা যাক কি কি রেপ মিথ আমাদের মধ্যে প্রচলিত।

রেপ মিথ (Rape Myth) [3]

1. পোশাক এবং ভাবভঙ্গিতেই বুঝা যায় যে, মেয়েটি সেক্স চায়।

2. মেয়েরা ধর্ষণ এনজয় করে।

3. মেয়েরা যদি চায়, রেপ নাও করতে দিতে পারে। করতে দিয়েছে বলেই করেছি।

4. রেপ বলে কিছু নেই, মেয়েরা জাস্ট শোধ নিতে রেপের দাবি তোলে। আসলে তখন সম্মতিই ছিল।

5. রেপ একবার করতে পারলে মেয়েটা তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়বে।

6. সেক্স একবার করে ফেলতে পারলে সম্পর্কটা আর টুটবে না। মেয়েটা তাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবে না। ইত্যাদি।

7. মেয়েটা যদি পরিচিত হয়, তাহলে এটা রেপ না।

২০১৪ সালে Psychology Today-তে Otterbein University-র মনোবিদ্যার অধ্যাপক Norm Shpancer সাহেব ধর্ষণের মনস্তত্ত্ব নিয়ে এক আর্টিকেলে লেখেন, কিছু লোকের মনে এক বিকৃত সামাজিক নিয়ম জেঁকে বসে যে, যেকোন মেয়ের সাথে ফ্লার্ট এবং ফোরপ্লে করলে তারা মিলনে রাজি হয়। ফলে যখন তারা এগুলো করে এবং মেয়েটির কাছে বাধা পায় তখন তারা রেগে গিয়ে ধর্ষণ করে। (some men internalize a pervasive social norm that flirting and foreplay lead to intercourse)[4]

তো এই অবাস্তব মিথ আমাদের মধ্যে তৈরি হবার কারণ কি?

কারণ

১. পর্নোগ্রাফির শুরুতে ছোট্ট একটু ড্রামা থাকে, যেখানে এসব জিনিস দেখানো হয়। কখনো দেখানো হয় টাকা বাড়িয়ে দিলে একজন অপরিচিত মেয়ে মুখমেহনে রাজি হয়ে যাচ্ছে, যে কিনা আসলে বেশ্যা নয়, সাধারণ মেয়ে। এডাল্ট মুভিগুলোতে কাহিনীর ফাঁকে এটাই দেখানো হয় যে, ডেটিং মানেই ডিনারের পর এলকোহল, একটু মিউজিক এবং বিছানা; এবং এটা প্রথম ডেটিং – এই। তারা সব ডেটিং-এ এটাই কামনা করে। কোথাও দেখানো হচ্ছে মেয়েরা রাফ সেক্স (কষ্ট দিয়ে মিলন) বেশি পছন্দ করছে। মোদ্দাকথা, পর্নোগ্রাফিই...[ঘ] একটা সুস্থ চিন্তার মানুষের মাঝে এসব মিথকে বিশ্বাসের পর্যায়ে নিয়ে যায়। বার বার নারীকে সস্তা ভোগ্যপণ্য রূপে উপস্থাপন দেখে দেখে সে সব নারীকেই পর্নো অভিনেত্রীর মত মনে করে।

২. ফিল্ম/মুভি তে সেক্স দৃশ্য কম থাকে, কিন্তু সেক্সের আগের কেমিস্ট্রি আরও বিশদ দেখানো হয়। ফলে এই কেমিস্ট্রি তারা বাস্তব মনে করে এবং বাস্তবে পেতে চায়। কখনো ধর্ষণদৃশ্যও দেখানো হয়। যা ধীরে ধীরে রেপ পর্নে আকর্ষণ তৈরি করতে পারে, ভালোই তো। হলিউড বলিউড মুভিগুলো এই রেপ মিথের পিছনে দায়ী...[ঙ]

টাইপ ৩- নারীর প্রতি রাগ (৩২%)

এবার আপনাদের একটা গবেষণার কথা শোনাব [5]। খুব মনোযোগ ধরে রাখার ব্যাপার আছে। মনোযোগ না থাকলে পরের সিদ্ধান্ত বা যেসব সমাধানে আমরা পৌঁছবো সেগুলোর যৌক্তিকতা বুঝে আসবে না। আপনাদের বলছি কানাডার কিংস্টন, অন্টারিওর Queen's College-এর মনঃচিকিৎসক Dr. Howard Barbaree-এর কথা, যিনি একই সাথে ধর্ষকদের মানসিক চিকিৎসার একটা প্রোগ্রামের ডিরেক্টর। Journal of Clinical and Consulting Psychology তে তাঁর রিসার্চের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, যখন এমন কিছু শোনানো হয়, যাতে পুরুষটি নারীটিকে বলপ্রয়োগ করছে, বা নারীটি ব্যথা বা কষ্ট পাচ্ছে; এসব শুনলে অধিকাংশ পুরুষেরই উত্তেজনা হ্রাস (dampens the arousal) পায় ৫০%। সম্মতিসহ প্রেমময় সেক্সের কথা শুনলে যে পরিমাণ উত্তেজনা আসে, এসব জোরজবরদস্তি শুনলে তা অর্ধেকে নেমে যায় (Ordinarily violence inhibits sexual arousal in men), অধিকাংশ ছেলেদের ক্ষেত্রে। এবং এই কমে যাওয়া উত্তেজনা যোনিপথে প্রবেশনের জন্য যথেষ্ট না (not be able to penetrate a woman)। মানে অধিকাংশ ছেলে জবরদস্তি করে ধর্ষণ করতে পারবে না, ঠিকমতো শক্তই হবে না।

যে যন্ত্রটি পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয়, তার নাম penile plethysmograph. এটি দিয়ে বিজ্ঞানীরা যৌনদৃশ্য দেখিয়ে বা শুনিয়ে পুরুষাঙ্গে রক্তের প্রবাহ পরিমাপ করেন । আপনারা হয়ত ইতোমধ্যেই জানেন যে, লিঙ্গ উত্থান বা শক্ত হয় লিঙ্গে প্রচুর রক্ত প্রবেশ

করে, আবার বেরিয়ে গেলে নরম হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন ভলান্টিয়ারদেরকে প্রেমময় (consenting lovemaking) সেক্স ও ধর্ষণের দৃশ্য দেখানো হল। Dr. Barbaree দেখলেন, ধর্ষণ দৃশ্যের প্রতি প্রতিদিন তাদের উত্তেজনা আগের চেয়ে আরও কমে যেতে দেখলেন। কিন্তু যারা ধর্ষণ মামলার আসামী, তাদের ক্ষেত্রে পেলেন ব্যতিক্রম। ১০% রেপিস্ট যাদের অনেকেই একাধিক ধর্ষণ করেছে, তাদের ক্ষেত্রে দেখলেন যে, প্রেমময় সেক্সের চেয়ে ধর্ষণদৃশ্যে তারা বেশি উত্তেজিত হয়। Emory University-র সাইকিয়াট্রিস্ট Dr. Gene Abel বলেন, যাদের ধর্ষণের সংখ্যা বেশি, ধর্ষণদৃশ্যে তাদের উত্তেজনা বেশি। এবং এদের দ্বারা ভিকটিম শারীরিকভাবে আহত হয়ও বেশি। এরা আমাদের টাইপ-১, যা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

মন দিয়ে পড়ার অনুরোধ। পর পর কয়েকটি পরীক্ষা করেন Dr. Barbaree, এটা দেখার জন্য যে, কোন কোন পরিস্থিতিতে আমাদের মত আম পাবলিকের উত্তেজনাও (arousal patterns of normal men) রেপিস্টের কাছাকাছি, বা তাদের মত হতে পারে। তিনি পান, এর একটা কারণ হতে পারে কোন কারণে ‘নারীর প্রতি রাগ’।

ভলান্টিয়ারদেরকে বলা হল, আমরা সেক্স উত্তেজনার উপর ব্যায়ামের প্রভাব নিয়ে কাজ করছি। এটা বলে তাদেরকে স্থির বাইসাইকেল প্যাডেল করতে বলা হল এক মিনিট, যে যত জোরে পারে। শেষ হবার পর একজন তরুণী ভিতরে আসবে কাজের ছুতোয়, এসে কতবার প্যাডেল করেছে দেখবে। এরপর তাচ্ছিল্যের সাথে একটা অপমানসূচক মন্তব্য করবে। যেমন,’ এহ, এতটুকুই মুরোদ’ ‘আমি নিজেই আজ সকালে এর চেয়ে বেশি করেছি’ ‘হায়রে পুরুষ’। মানে এমন কোন কথা বলে যাবে, যাতে পুরুষটি তার উপর ভীষণ রাগান্বিত হয়। এরপর পুরুষটিকে ল্যাবে নিয়ে ধর্ষণের দৃশ্য দেখানো হবে। কী পাওয়া গিয়েছিল বলুন তো? Dr. Barbaree বলেন, এই স্বাভাবিক লোকগুলো প্রেমময় সেক্স দেখে যে পরিমাণ উত্তেজিত হত, এখন ধর্ষণ দৃশ্যেও সেই পরিমাণ উত্তেজিত হয়েছে। তার মানে ‘নারীর স্বাভাবিক

আচরণের কারণে রাগ’ সাধারণ একটা ছেলেকেও ধর্ষকের মত করে চিন্তা করার দিকে ঠেলে দিচ্ছে... [চ] । ধর্ষকেরা প্রায়ই বলে, আমি ধর্ষণ করতে চাইনি, মেয়েটি আমাকে রাগিয়েছে। নারী যদি কোন অপমান করে, সেটাকে এরা ‘পুরুষত্বের প্রতি অপমান’ হিসেবে নিয়েছে। দেখেন কত সামান্য কথাতেই স্বাভাবিক পছেলেও ধর্কদের মত মানসিকতার হয়ে যাচ্ছে।

অন্য পরীক্ষায় আরও দুটো রিস্ক ফ্যাক্টর চলে আসে। স্বাভাবিক মানুষ যে আগে ধর্ষণের চিন্তা দিয়ে উত্তেজিত হত না, সে এলকোহল পানের কারণেও ধর্ষকসুলভ উত্তেজিত হয়...[ছ]। আর একটা ফ্যাক্টর হল, মেয়েটির উপস্থাপনে তার মনে হয় যে, মেয়েটি সেক্স-ই চাচ্ছে...[জ] (the woman portrayed had been "asking for it.")। অর্থাত নারীর উপস্থাপনাও একজন স্বাভাবিক পুরুষকে ধর্ষকেরই মত ভাবাচ্ছে। যারা বলেন, নারীর পোশাক দায়ী নয়, তাদের ভাবার সময় চলে এসেছে।

আমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে যে ধারণা প্রচলিত যে, রেপিস্টদের মন মানসিকতাই আলাদা হয়। তারা এতটাই বিকৃতমনা যে, ভায়োলেন্স বা জবরদস্তি দ্বারাই উত্তেজনা লাভ করে, তাদের যৌন প্যাটার্নই আলাদা। Dr. Barbaree বলেন, শেষ ফলাফল এই ধারণাটাকে ভুল প্রমাণ করে। তিনি বলেন, ফ্যাক্টরগুলো মিলে গেলে (With the right combination of factors) অধিকাংশ স্বাভাবিক পুরুষ ‘জবরদস্তি সেক্সে’ও (aroused by violent sex) উত্তেজিত হতে পারে।

কারণঃ

এরাই অধিকাংশ ধর্ষক, যারা বলে মেয়েটি আমাকে রাগিয়েছে। রাগের কারণ গুলো যা যা হতে পারে—

- ব্রেক আপ

- সম্পর্কে সন্দেহ

- ঝগড়া

- একদম সাধারণ কোন কথা

- ইয়ার্কি ফাজলামি

- টিজ করা

তাহলে এখানে আমরা ৩ টা রিস্ক ফ্যাক্টর পেলাম—

- এলকোহল... [ছ]

- মেয়েদের উপস্থাপনঃ উত্তেজক পোশাকে বা আচরণে (রেপ মিথ এবং উদ্দীপক) (provocative dress or behavior) [ঘ,ঙ,জ]

- নারীর প্রতি যেকোন কারণে রাগ...[চ]

আর University of Arizona-র public health এর প্রফেসর Mary P. Koss আমাদের রিস্ক ফ্যাক্টর দিচ্ছেন— [6]

- মদপান... [ছ]

- অত্যধিক মিলনের তাড়না (কারণ মূলত পর্ন আসক্তি) [ঘ]

- ‘রেপ মিথে’ বিশ্বাস [ঘ,ঙ]

- কোন ফ্রেন্ড সার্কেল যারা মেয়েদেরকে অশ্লীলভাবে বর্ণনা করে।... [ঝ]

আর University of California-র মনোবিদ Neil Malamuth বলছেন একটা ফ্যাক্টর হল, যারা রেপ পর্ন দেখে উত্তেজিত হয় (টাইপ-১) [7]।

টাইপ ৪- স্বভাবগত রাগী বা অপরাধী (১১%)

এরা শুধু ধর্ষণ না, অন্যান্য অপরাধেও জড়িত থাকে। এর পিছনে অনেক কারণের মধ্যে অপরাধে লিপ্ত হবার রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোও শামিল। যেমন—

- অশিক্ষা

- সুবিধাবঞ্চিত জীবনযাপন

- ছোটবেলা থেকে নিগ্রহ

- মাদকাসক্তি

- ব্রোকেন ফ্যামিলি ইত্যাদি

University of Pennsylvania-র গবেষক Ann Burgess-এর ১৯৮৮ সালের এক গবেষণায় উঠে এসেছে, ৫৬% ধর্ষক যাদের বয়স ৩০ এর কোঠায়, শিশুকালে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আর Dr. Prentky পেয়েছেন তার স্টাডিতে, কমপক্ষে ৩ টা ধর্ষণ করেছে এমন আসামীদের ২৩% শিশু বয়সে যৌন নিগ্রহের শিকার হয়েছে [8]।

কয়েকটা গবেষণায় এসেছে, ধর্ষকেরা জীবনের শুরুতে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে যায়। সেটা হতে পারে যৌন নির্যাতন, হতে পারে দৈহিক প্রহার, বা ব্যর্থ পারিবারিক পরিমণ্ডল [9]। ফলে এরা আশপাশের মানুষের সাথে স্বাভাবিক সংযোগ (attachment problems) এবং সুস্থ দৈহিক সম্পর্ক (healthy adult relationships) তৈরি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে [10]। তাই এরা আশেপাশের মানুষের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, সন্দেহপ্রবণ, উদাসীন ও অসহিষ্ণু হয় [11]।

তবে এখানে যে ফ্যাক্টরের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তা হল, স্বাভাবিক যৌন সম্পর্কে প্রবেশের অনিশ্চয়তা... [ঞ]। ছক দেখুন। এদের একটা টেন্ডেন্সি, আমার ভবঘুরে জীবন, কে আমাকে পছন্দ করবে? কিংবা কবে বিয়ে শাদী হবে ঠিক নেই, একটা এখন পেয়েছি, ছেড়ে কী লাভ? এজাতীয় মানসিকতা থেকে এরা রেপ করতে পারে।

টাইপ ৫- সুযোগসন্ধানী (২৩%)

এরা অপরিকল্পিত, আকস্মিকভাবে (impulsive) রেপ করে। রুচিগত সমস্যা নয়, বরং পরিস্থিতি এদেরকে উস্কে দেয়— গভীর রাত, একেলা মেয়ে, আশেপাশে কেউ নেই।

Kent State-এর মনোবিদ্যার Associate Professor জনাব Gordon Nagayama Hall, Ph.D. সাহেব ও তাঁর সহকর্মীরা একটি জাতীয় ফোরামে এভাবে সমাপ্তি টানেন, আগে আমরা যেমন ভাবতাম এখন তার চেয়ে বেশি লোককে পটেনশিয়াল রেপিস্ট মনে করা উচিত। [12] (that more people should be considered potential rapists than previously thought.) তাঁদের রিসার্চে ২৫% কলেজ ছাত্র কোন না কোন মাত্রার যৌন অসদাচরণ করেছে জীবনে। ‘নির্জন’ পয়েন্টে আমরা দেখেছি ধর্ষিতাদের ৫৬% জানিয়েছে যে, ডেটিং-এ গিয়ে তারা রেপড হয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, ধর্ষকদের খুব সামান্য অংশই নারীর প্রতি রাগ থেকে বা জবরদস্তি সেক্সে উত্তেজনা অনুভব করে এমন মানসিকতার (sadistic fantasy)। বরং অধিকাংশ ধর্ষকই আমাদের মত সাধারণ মানুষ (normal sexual orientation), যারা আকস্মিকভাবে (impulsively) ধর্ষণ করে, যেটার জন্য তারার নিজেরাও প্রস্তুত থাকে না। এটা তখনই ঘটে যখন

সুযোগ নিজে এসে ধরা দেয়, বিশেষ করে ডেটিং-এ। [13] আমাদের প্রস্তাবনা তো এটাই।

আশা করি এখন আপনারা আমার সাথে এবং Dr. Barbaree-র সাথে একমত হবেন যে, পরিস্থিতি, সুযোগ একজন স্বাভাবিক পুরুষকেও ধর্ষকের ভূমিকায় নামিয়ে দিতে পারে। এবং অধিকাংশ ধর্ষকই (৯২%) আসলে আমার আপনার মত স্বাভাবিক রুচিরই মানুষ। আমরা আবার আমাদের প্রস্তাবনায় ফিরে যাচ্ছি—

আমি বলেছিলাম, নির্দিষ্ট মেন্টাল সেট-আপের কেউ (১) নির্দিষ্ট জায়গায়/সময়ে (২) নির্দিষ্ট স্টিমুলাসের কিছু পেলে (৩) ধর্ষণ সংঘটিত হয়। এবার বোধ হয় ক্লিয়ার।

এখন যেকোন ধর্ষণের ঘটনাকে আপনি এই সূত্রে ফেলতে পারেন। দেখেন মেলে কি না।

- শিশুকামী নির্জনে শিশু পেলে ধর্ষণ হয়

- পশুকামী নির্জনে পশু পেলে ধর্ষণ হয়

- রেপ মিথে বিশ্বাসী কেউ নির্জনে বা সুযোগমত (অনেক বন্ধু একসাথে) যেকোন মেয়েকে পেলে ধর্ষণ হবে।

- প্রবল যৌনতাড়নাবিশিষ্ট (কবে বিয়ে হবে কে জানে) নির্জনে যেকোন বয়েসী কাউকে পেলে ধর্ষণ হবে।

- নারীর প্রতি রাগান্বিত কেউ নির্জনে যেকোন নারীকে পেলে (পোশাক যা-ই হোক) ধর্ষণ হবে।

- নিজ আপনজনের প্রতি আগে থেকেই ফ্যান্টাসি করে এমন কেউ, নির্জনে তাকে পেলে ধর্ষণ হবে।

এটাই আমাদের ধর্ষণেরর কমন ফর্মুলা। সামনের অধ্যায়ে আমরা এই ফর্মুলা ধরে ধরে সমাধানে পৌঁছবার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

রিস্ক ফ্যাক্টর

গবেষক থর্নটন ধর্ষণের মনস্তাত্ত্বিক রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে ৪টা রিস্ক ক্ষেত্রে (risk domains) ভাগ করেছেন। ডোমেইন ধরে ধরে সমাধানে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন [14]। সেগুলো হলঃ

1. যৌন আগ্রহ (sexual preference) যা পূর্বেই মনে গেঁথে আছে (preoccupation)। আমরা দেখলাম যা পুরোটাই সিম্বোলিজম নিয়ন্ত্রিত।

2. কিছুটা ভিন্ন চিন্তাধারা ও বিশ্বাস যাতে সে নিজ অপরাধের সাপোর্ট (offence-supportive) খুঁজে নেয়। যেটা আমরা রেপ মিথে দেখলাম।

3. সামাজিক সম্পর্কের ত্রুটি, যেমন- পুঞ্জিভূত আবেগিক তাড়না, সম্পর্ক গড়তে অপারগতা (intimacy deficits) ইত্যাদি

4. আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অভাব (Self-management)

তবে আমরা এভাবে সমাধান আলোচনা না করে প্রতিটি রিস্ক ফ্যাক্টর ধরে ধরে সমাধানে পৌঁছবার চেষ্টা করব। তার আগে আমাদের প্রাপ্ত রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নিই। মূল আলোচনায় যেভাবে নাম্বারিং করা আছে সেই ক্রমানুসারেই দিলাম, যাতে কারো খটকা লাগলে মূল আলোচনা দেখে নিতে পারেন।

মেন্টাল সেট-আপের জন্য প্রাপ্ত ফ্যাক্টর—

[ক] বয়স হবার আগেই যৌন পরিপক্কতা এসে পড়া

[খ] যৌন বিষয়গুলো নিয়ে বেশি বেশি কল্পনা করা, ফ্যান্টাসিতে ভোগা

[গ] সেক্স বুঝার বয়স এবং স্বাভাবিক সেক্সে অভ্যস্ত হবার মধ্যবর্তী সময় যত দীর্ঘ হবে তত সে সেক্স নিয়ে জল্পনা-কল্পনা বা ফ্যান্টাসি করার সময় বেশি পাবে। তত তার মেন্টাল সেট-আপ বিচ্যুতি বা বিকৃতির সম্ভাবনা বাড়বে

[ঘ] পর্নোগ্রাফি

[ঙ] হলিউড বলিউড মুভিগুলো এই রেপ মিথের পিছনে দায়ী

[চ] ‘নারীর স্বাভাবিক আচরণের কারণে রাগ’ সাধারণ একটা ছেলেকেও ধর্ষকের মত করে চিন্তা করার দিকে ঠেলে দিচ্ছে

[ছ] এলকোহল পানের কারণেও ধর্ষকসুলভ উত্তেজিত হয়

[জ] মেয়েটির উপস্থাপনে তার মনে হয় যে, মেয়েটি সেক্স-ই চাচ্ছে

[ঝ] কোন ফ্রেন্ড সার্কেল যারা মেয়েদেরকে অশ্লীলভাবে বর্ণনা করে

[ঞ] স্বাভাবিক যৌন সম্পর্কে প্রবেশের অনিশ্চয়তা

রেফারেন্স সব এলোমেলো হয়ে গেছে

[1] যৌন-মনোবিজ্ঞান (The Psychology of Sex), হ্যাভলক এলিস, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
,২০০৬, পৃষ্ঠা ১৩৭, মূল ১৪৭

[2] যৌন-মনোবিজ্ঞান (The Psychology of Sex), হ্যাভলক এলিস, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
,২০০৬, ইংরেজি পৃষ্ঠা ১৪৮

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3120994/

[4] https://universe.byu.edu/2017/03/07/psychologists-explain-why-men-rape-women1/

[5] https://www.nytimes.com/1991/12/10/science/new-studies-map-the-mind-of-the-rapist.html

[6] https://www.nytimes.com/2017/10/30/health/men-rape-sexual-assault.html

[7] https://www.nytimes.com/2017/10/30/health/men-rape-sexual-assault.html

[8] https://www.nytimes.com/1991/12/10/science/new-studies-map-the-mind-of-the-rapist.html

[9] Craissati J, Falla S, McClurg G, Beech A. Risk, reconviction rates and pro-offending attitudes for child molesters in a complete geographical area of London. J Sex Aggress. 2002;8:22–38.

[10] Dhawan S, Marshall W. Sexual abuse histories of sexual offenders. Sex Abuse. 1996;8:7–15.

[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16871447

[12] https://www.psychologytoday.com/us/articles/199211/round-rapists

[13] https://www.nytimes.com/1991/12/10/science/new-studies-map-the-mind-of-the-rapist.html

[14] Thornton D. Constructing and testing a framework for dynamic risk assessment. Sex Abuse. 2002;14:137–51

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11961888

[1] https://universe.byu.edu/2017/03/07/psychologists-explain-why-men-rape-women1/

[2] https://www.nytimes.com/1991/12/10/science/new-studies-map-the-mind-of-the-rapist.html

[1] □□□-□□□□□□□□□□ (The Psychology of Sex), □□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□- □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ ,□□□□, □□□□□□□ □□□□

[2] □□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□

[3]□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□

[4] □□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□

[5] *Psychological Reports*, Volume 64 Issue 3_suppl, June 1989

http://journals.sagepub.com/doi/10.2466/pr0.1989.64.3c.1131

[6] 4th ed. Washington DC: American Psychiatric Association; 1994. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

[7] Geneva: WHO; 1992. World Health Organization. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic guidelines

[8]https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paraphilias

https://www.issm.info/sexual-health-qa/what-are-paraphilias/

https://www.webmd.com/sexual-conditions/guide/paraphilias-overview#1

[1] □□ □ □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□, □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□, □□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□ □. □□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□

[2] https://www.forbes.com/sites/curtissilver/2018/01/09/pornhub-2017-year-in-review-insights-report-reveals-statistical-proof-we-love-porn/#15a1659924f5

ফোর্বস এর এই আর্টিকেলে বলা আছে , জনপ্রিয় পর্নোসাইট পর্নহাব তাদের ২০১৭ সালের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে।

সেখানে এসেছে , প্রতিদিন গড়ে ৮১ মিলিয়ন মানুষ সাইটটি ভিজিট করে। বছরে ২৮ .৫ বিলিয়ন বার (২৮৫০ কোটি) সাইটটিতে ঢোকা হয়েছে। ২৪৭০ কোটি সার্চ দেয়া হয়েছে। মিনিটে ৫০ ,০০০ সার্চ দেয়া হয়েছে। মানে প্রতি সেকেন্ডে ৮০০ জন সার্চ দিয়েছে। সারা দুনিয়া থেকে গেল বছরে ৪০ লাখ ভিডিও আপলোড দেয়া হয়েছে। যেগুলো মোট ৫ ,৯৫,৪৯২ ঘণ্টার।

[3] https://www.psychologytoday.com/us/blog/all-about-sex/201803/surprising-new-data-the-world-s-most-popular-porn-site

এটা হল একটা পর্নোসাইটের হিসাব। টপ ১০০ সাইটের ভিতর পর্নোসাইট মোট ৫ টা। এই ৫ টা সাইটে প্রতি মাসে ৬০০ কোটি বার ভিজিট হয়। মানে প্রতিদিন ২০ কোটি বার এই ৫ টা পর্নোসাইট ভিজিট হচ্ছে।

[4] ওয়াশিংটনে অবস্থিত National Center on Sexual Exploitation (*NCOSE*) এর ২০১৭ সালের রিপোর্ট।

https://endsexualexploitation.org/publichealth/

[5]

[6]

[7]

‘ধর্ষণের মানসাংক ও সমাধান ’ এর ‘সমাধান ’ পরের পর্বে ইনশাআল্লাহ।

জীবনের অপর নাম পানি

SHAMSUL AREFIN SHAKTI·SATURDAY, OCTOBER 27, 2018

আপনাদের ‘কষ্টিপাথর ’ বইয়ের জীবনের অপর নাম পানি অধ্যায়টা শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। বেশি প্রয়োজন। এই নেন।

জাপানি বিজ্ঞানী, ড. মাসারু ইমোতো। ডক্টর অব অলটারনেটিভ মেডিসিন। Yokohama Municipal University’s Department of Human and Sciences থেকে ডক্টরেট করেন। এরপর ভারতের Open International University for Alternative Medicine-এ অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। ‘অলটারনেটিভ মেডিসিন’ নামটা শুনলেই আমরা ডাক্তাররা চোখমুখ কুঁচকে থাকি। আয়ুর্বেদ, ইউনানী, চাইনিজ মেডিসিন, হোমিওপ্যাথি— চিকিৎসার এই বিকল্প পথগুলোকে অল্টারনেটিভ মেডিসিন বলে। যাকে বাংলাদেশে আমরা ‘অপচিকিৎসা’ বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিই। কিন্তু প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, যখন বর্তমান প্রচলিত ‘বাণিজ্যিক সুচিকিৎসা’র জন্ম হয়নি তখন সারা পৃথিবীতে মানুষ এই ‘অপচিকিৎসা’ দ্বারাই আরোগ্য লাভ করেছে হাজার বছর। হোমিওপ্যাথির কথা বলতে পারি না; তবে আয়ুর্বেদ, চাইনিজ মেডিসিনের আছে হাজার বছরের ইতিহাস। এগুলোর পিছনে যদি কোন সায়েন্স না-ই থাকবে, তবে হাজার বছর ধরে মানুষ এগুলো ব্যবহার করছে কেন? উপকার পায় বলেই তো, ওষুধ কিছু ফলাফল দেখায় বলেই তো, না কি? হতে পারে এই চিকিৎসাগুলোর পেছনের সায়েন্সটা এখনও আবিষ্কার হয়নি। বিজ্ঞান সব আবিষ্কার করে ফেলেছে এমন তো না। এখনো ভারত-চীন-জাপানে এগুলোর ওপর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগত গবেষণা হয়। কোন জাতি শতভাগ অনুকরণ দিয়ে উন্নতি করতে পারে না, এজন্য চাই নিজস্বতার উন্নতি, চাই আলাদা কিছু।

যা হোক, ভদ্রলোক গত ২৫ বছর ধরে পানির স্ফটিক/ কেলাসের (water crystals) ওপর গবেষণা করছেন। দুটো বরফকুচি (snowflake) দেখতে কখনও একই রকম হয় না— এই ধারণার ওপর গবেষণা করে তিনি আশ্চর্য সব ফলাফল পান। যে প্রক্রিয়ায় উনি রিসার্চ করেন তা হল, পেট্রিডিশে ১ মি.লি. পরিমাণ পানি নেয়া হয়। এবার সেটাকে -৫° সেলসিয়াসে বরফ করা করা হয়। ঐ রুমে -৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বজায় রাখা হয়, পেট্রিডিশ বের করেই সাথে সাথে মাইক্রোস্কোপে ক্রিস্টালের ছবি তুলে ফেলা হয় 100-200 গুণ বিবর্ধন করে। একটা স্যাম্পলের ৫০ ফোঁটা আলাদা আলাদা করে জমিয়ে আলাদা ছবি নেয়া হয়। ১৯৯৪ সালে প্রথম ক্রিস্টালের ছবিটা ছিল এটা।

ক. এরপর ওনার টীম একের পর এক বিভিন্ন পানির স্যাম্পল নিয়ে ক্রিস্টালের ছবি তোলা শুরু করেন। টোকিও-লন্ডন-বার্লিন-

ভ্যানকুভার বিভিন্ন শহরের ট্যাপের পানি, সারা দুনিয়ার নানান ঝর্ণার পানি, এন্টার্কটিকার বরফ, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পানির প্রায় ১০,০০০ ফটো তোলেন তাঁরা গত ১৫ বছরে। মজার ব্যাপার হল, প্রত্যেক উৎসের ক্রিস্টালের গঠন আলাদা আলাদা। আপনাদের সুবিধার্থে মাত্র কয়েকটার ছবি দিচ্ছি।

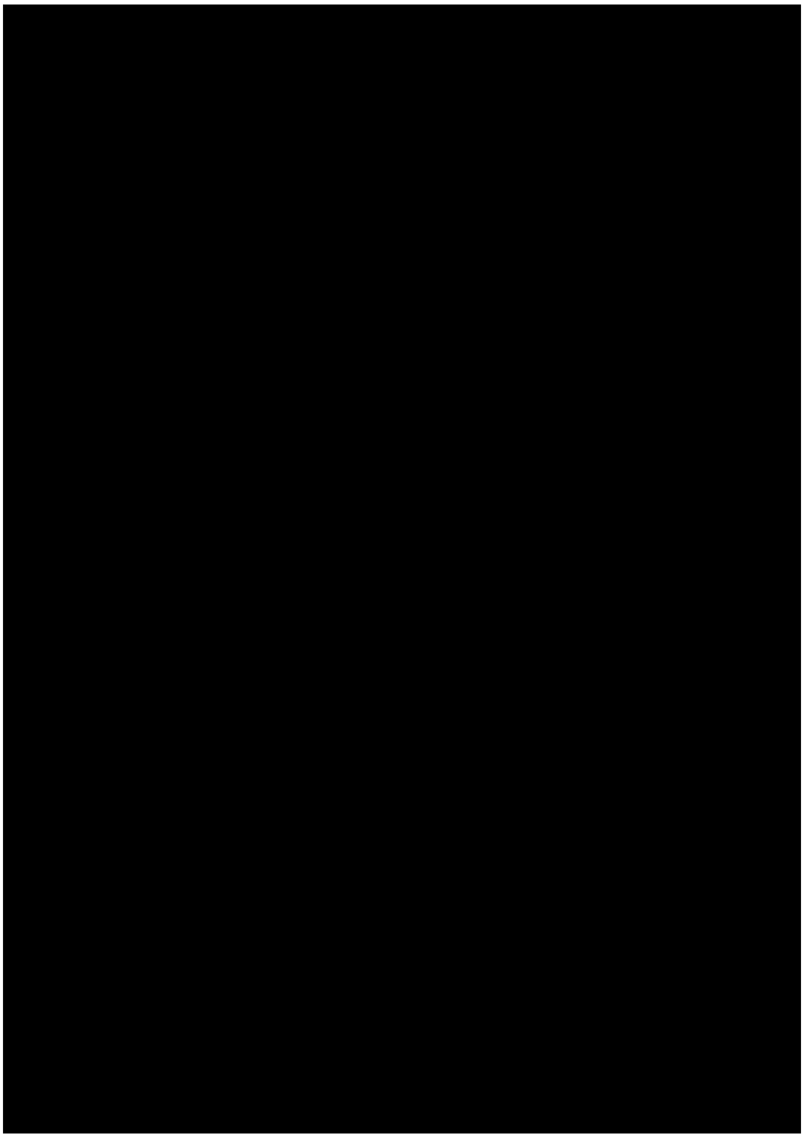

খ. শুধু তাই না, ওনারা পানির ক্রিস্টালের ওপর মিউজিকের প্রভাব অনুসন্ধান করেন। নেগেটিভ লিরিক্স-মিউজিকে বরফের এই ক্রিস্টালের আকার বিকৃত হয়ে যায় বা কোন আকারই নেয় না। আবার সুন্দর মিউজিকে বিভিন্ন ধরনের আকার নেয়।

[illegible] (distorted)[illegible]

[illegible]

[illegible]

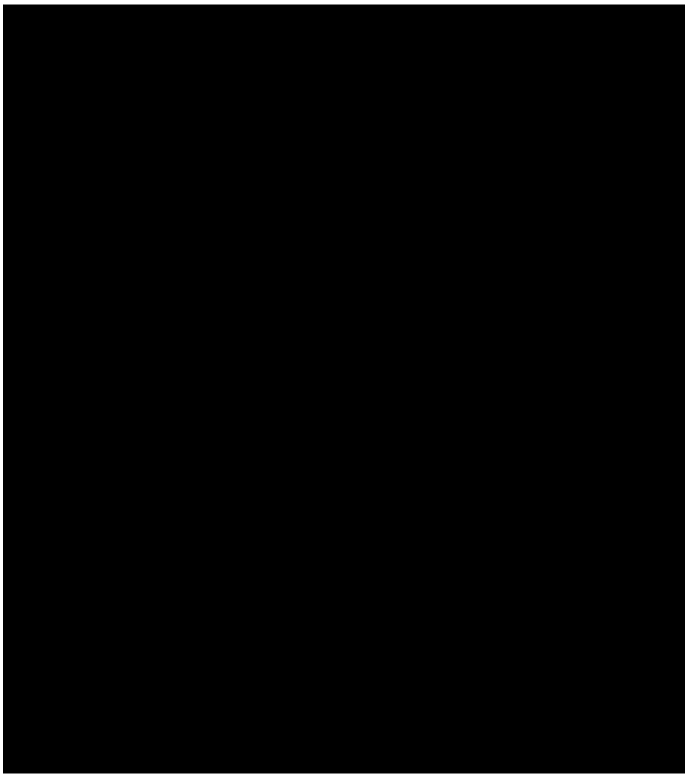

তিনি নিজ ওয়েবসাইটে লিখেছেন, আমরা সবসময় যে ফলাফল পেয়েছি তা হল, ভালো কথা-ভালো সুর - প্রার্থনা এগুলোতে সুন্দর সুন্দর ক্রিস্টাল হয়েছে। আর অন্যদিকে বদখত (disfigured) সব গঠন হয়েছে খারাপ কথা - মিউজিক এসবে। আমরা কখনো একই রকম (identical) ক্রিস্টাল পাইনি। এই সবগুলো ছবি *Messages from Water* নামে ৪ খণ্ডে প্রকাশ হয় 1999, 2002, 2004 এবং 2008-এ। এরপর ২০০১ সালে এই বিষয়ে ব্যাখ্যামূলক বই লেখেন *Water Knows the Answer* নামে যা শুধু জাপানে না, জাপানের বাইরেও বেস্টসেলার হয়। [1]

ভদ্রলোকের লেখা অন্যান্য বইয়ের মধ্যে আছে নিউইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার *The Hidden Messages in Water, Water Crystal Healing:* Music and Images to Restore Your Well-Being, *Messages from Water and the Universe, The True Power of Water:* Healing and Discovering Ourselves, *The Healing Power of Water, Love Thyself:*

The Message from Water III, *The Miracle of Water, Secret Life of Water, Water Crystal Oracle:* Based on the Work of Masaru Emoto, *The Shape of Love:* Discovering Who We Are, Where We Came From, and Where We're Going, *The Secret of Water* ইত্যাদি।

ওনার মূল বক্তব্য হল : পানি মানুষের কর্ম ও আবেগের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, তার ধর্ম -বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়। এজন্যই একই পানি ভিন্ন আবেগ ও ভিন্ন কর্মকাণ্ডে সুন্দর বা বাজে ক্রিস্টাল তৈরি করে। এই হাইপোথিসিসের ওপর IHM Research Institute, Tokyo, Japan থেকে উনি Masaru Emoto আর Takashige Kizu এবং ক্যালিফোর্নিয়ার Institute of Noetic Sciences এর Dean Radin PhD আর Gail Hayssen সাহেব রিসার্চ পরিচালনা করেন। রিসার্চ পেপারটি প্রকাশিত হয় *EXPLORE* জার্নালে সেপ্টেম্বর ২০০৬ সংখ্যায় Vol.2 No.5 pp.408-411। [2] Researchgate, Sciencedirect ও PubMed-এও পাবেন পেপারটি। [3] টোকিও-তে ২০০০ লোককে বলা হল পানির নমুনার প্রতি পজিটিভ ইনটেনশন দিতে একটা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সুরক্ষাযুক্ত কক্ষে। এই ২০০০ লোক জানত না যে, একই পানি আলাদা করে তুলে রাখা আছে 'কন্ট্রোল' হিসেবে। এবার এগুলো ক্রিস্টাল করে ফটো তোলা হল। ফটোগুলোকে ১০০ জন বিচারককে দিয়ে সৌন্দর্য বিচার করানো হল, যারা জানতেন না কোনটা ইমোশনওয়ালা আর কোনটা কন্ট্রোল স্যাম্পল। মানে 'ডাবল ব্লাইন্ড'। ফলাফলে আসা হল, ভালো ইমোশনে ক্রিস্টাল বেশি সুন্দর হয়, নর্মাল পানির চেয়ে। [Results indicated that crystals from the treated water were given higher scores for aesthetic appeal than those from the control water (P = .001, one-tailed), lending support to the hypothesis.]

এবার আরেকটা রিসার্চে গেলেন গবেষক দল। অস্ট্রিয়া ও জার্মানির ১৯০০ মানুষ ৩ দিন ধরে পানির স্যাম্পলের ওপর ভালো ইমোশন প্রকাশ করল। বাইরে আলাদা করে রাখা হল 'কন্ট্রোল' নমুনা, যাতে কোন আবেগ দেয়া হলো না। দুই নমুনাকেই ক্রিস্টাল বানিয়ে এবার ২৫০০ লোককে

□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ [Results suggested that crystal images in the intentionally treated condition were rated as aesthetically more beautiful than proximal control crystals (p ¼ 0.03, one-tailed). This outcome replicates the results of an earlier pilot test.] [4]

□□□□ □□□□□ Dr. Masaru Emoto □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ October 9-12, 2014-□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ Annual Conference on the Physics, Chemistry and Biology of Water-□ “Message from Water” and Science □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ Yasuyuki Nemoto, Director of IHM General Institute□ [5] □□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ Dr. Masaru Emoto □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ (PRWeb [6] □□ □□□□□□), July 7, 2014 □□□□□□□ Power of Water radio show-□□ Sharon Kleyne Hour □□□□□ □□□□□□□□□□□ (VoiceAmerica □ Apple iTunes □ □□□□□□□□□) □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ Gerald Pollack, PhD.[7]

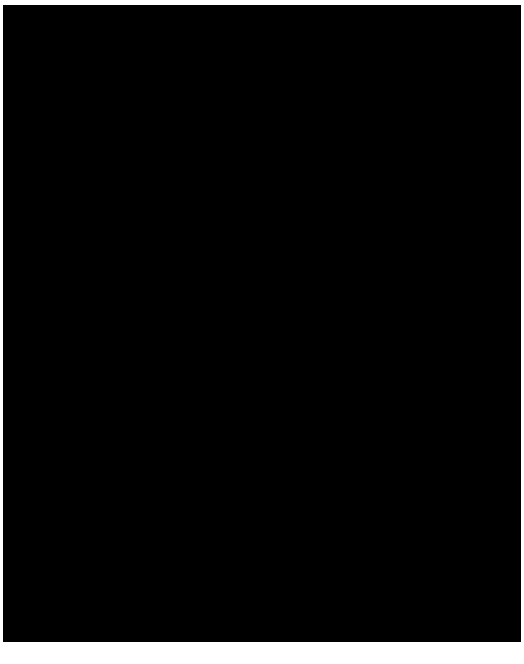

Prof. Gerald Pollack

তিনি কে— এটা আসলে বলতে গেলে আরো ৩-৪ পৃষ্ঠা লাগবে, ওনার বায়োডাটা দেখে নিন। [8] অলসদের জন্য এটুকু কেবল বলি ভদ্দরলোক Professor of Bioengineering, University of Washington এবং Fellow, International Academy of Medical and Biological Engineering. আরো বহু জার্নাল-টার্নাল চালান, বহু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের হেড, চেয়ার, প্রতিষ্ঠাতা, উপদেষ্টা, বোর্ড মেম্বার ইত্যাদি ইত্যাদি। মানে বলতে চাচ্ছি বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে তিনি একজন ‘কিছু একটা’, মেইনস্ট্রীম গবেষক এবং একজন অথোরিটি। যারা এতোক্ষণ Dr. Masaru Emoto-এর গবেষণাকে অপবিজ্ঞান বলে উন্নাসিকতার সাথে পড়ছিলেন, চেহারা ঠিক করে ফেলুন, Boss. তাঁর যুগান্তকারী বিপ্লবী একটা থিওরি আছে— “The Fourth Phase of Water”[9]

The Fourth Phase of Water (Ebner & Sons, 2013) নামে তাঁর একটা বইয়ে তিনি সর্বপ্রথম এই থিওরি তুলে ধরেন। উনার মতে কঠিন (বরফ), তরল ও বায়বীয় (বাষ্প) — এই ৩ অবস্থা ছাড়া পানির আরেকটা অবস্থা আছে, যার নাম দেন তিনি ‘৪র্থ দশার পানি’ বা EZ Water বা structured water. এটা হল বরফ আর তরল পানির মাঝামাঝি একটা দশা। কোন তলের সাথে সংলগ্ন পানির একদম তলঘেঁষা পাতলা স্তরটুকু আসলে এই ৪র্থ দশার পানি (This phase occurs next to water loving hydrophilic surfaces.)। Prof. Gerald Pollack- এর মতে মানবদেহের কোষের ভেতরের মোট ২৮ লিটার পানি ৪র্থ দশায় থাকে। তাঁর মতে, পারিপার্শ্বিক নানান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আবেদনে পানি গঠনগতভাবে সাড়া দেয়, এমনকি এর সামান্য স্মৃতিধারণ ক্ষমতাও থাকতে পারে। মানবদেহ একটা উজ্জ্বল শক্তিক্ষেত্র (radiant energy field) তৈরি করে যা মানুষের শরীর-মনের অবস্থার ওপর পরিবর্তন হয়। কুচিন্তা ভিন্ন বর্ণালীর ভিন্ন ধরনের শক্তি দেয়, ভাল চিন্তার তুলনায়। [10]

Prof. Gerald Pollack আরও বলেন, এটা খুবই সম্ভব যে দেহের radiant energy field এর তারতম্যের কারণে কোষস্থ পানির (৪র্থ দশার) আণবিক

গঠনই বদলে যাচ্ছে। একই ব্যাপার দেহের বাইরের পানির ক্ষেত্রেও অসম্ভব নয়। তিনি বিশ্বাস করেন, যেহেতু পানির স্মৃতি আছে, তাই এই উদ্দীপক (stimulus) সরিয়ে দিলেও বদলে যাওয়া গঠন তেমনই থাকছে।

Pollack সাহেবের মতে, যেহেতু মানবদেহের ৭০%-ই পানি। আর পানির অণু ধরে হিসাব করলে ৯৯%-ই পানি। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা পদার্থ দেহের ভেতর শুধু পরোক্ষ ভূমিকা পালন করবে— এটা হতেই পারে না। Dr. Masaru Emoto-এর গবেষণাকে তিনি পানির ৪র্থ দশা দিয়ে ব্যাখ্যা করেন।

তাহলে, Dr. Masaru Emoto এবং Prof. Gerald Pollack এর চিন্তাধারা মিলে গেল। মানে পানির ভৌত ধর্ম (Physical property) পজিটিভ আবেগ-সুর-প্রার্থনা-শব্দ এসবে পরিবর্তন হয়, নেগেটিভ আবেগ-কথাতেও বদলে যায়। এত কথা কেন বললাম, সামনে আসল মজা।

Dr. Masaru Emoto-কে এক মুসলিম কলিগ জমজমের পানি ও কাবার ছবি দেয় পানির প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। কুরআন তিলওয়াতের প্রতি পানির প্রতিক্রিয়াও দেখা হয়, ছবি তোলা হয় ক্রিস্টালের।

তিনি যমযমের পানিকে ক্রিস্টাল করে আশ্চর্য এক বিষয় লক্ষ্য করেন। যমযমের পানি ‘ডাবল ক্রিস্টাল’ তৈরি করেছে, একটার ওপর আরেকটা, যা আর কোন পানির স্যাম্পল করেনি। এরপর তিনি আগ্রহী হয়ে এটা নিয়ে আরও গবেষণা করেন। এবং তাঁর বইতে লেখেন। এজন্যই আমি জাপান থেকে অরিজিনাল জাপানি বই আনার চেষ্টা করছি, আমার ভয় হয় ইংরেজি অনুবাদে সম্ভবত এই লেখাগুলো সরিয়ে ফেলা হতে পারে। পরে মূল বই থেকে রেফারেন্স দেব ইনশাআল্লাহ।

আপাতত সৌদি আরবের Taibah University –র Dr. Wafa Mansour Frigui এর একটা প্রেজেন্টেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য শেয়ার করি। Researchgate – এই পাবেন এটা। [11] Dr. Masaru Emoto যমযমের পানির ব্যাপারে প্রাপ্ত ফলাফল যা তাঁর বইয়ে লিখেছেন—

১. এর মত গুণগত বিশুদ্ধতা পৃথিবীর আর কোন জায়গার পানিতে পাওয়া যায়নি।

২. তিনি একটা প্রযুক্তি ব্যবহার করেন যমযমের পানি গবেষণায় যার নাম NANO। এবং দেখেন, ১ ফোঁটা যমযমের পানিকে ১০০০ ফোঁটা নর্মাল পানির সাথে মিশালে নর্মাল পানিও যমযমের মত গুণাগুণ অর্জন করে।

৩. এক ফোঁটা যমযমের পানিতে যে পরিমাণ মিনারেলস থাকে আর কোন পানিতে এত পাওয়া যায় না।

৪. তিনি আরও পান যে, যমযমের পানির গুণাগুণ ও উপাদান পরিবর্তন হয় না, করা যায় না, কেন তা তিনি জবাব দেননি।

৫. এমনকি তিনি যমযমের পানি রিসাইকেল করেন, তাতেও তার মান পরিবর্তন হয়নি।

পানির সামনে কুরআন তিলওয়াত প্লে করে তিনি পান সবচেয়ে নিখুঁত আকারের ষড়ভুজাকার (Hexagonal) ক্রিস্টাল। তাঁকে আরও জানানো হয়, মুসলিমরা ১৪০০ বছর ধরে পানি পানের আগে পানির সামনে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে। তিনি জানান, এর ফলে পানির গুণাগুণ স্পষ্টতই বেড়ে যাওয়ার কথা। ২০১৪ সালেই Dr. Masaru Emoto পরলোকগমন করেন। অমুসলিম হিসেবে উনি অনেকটা করেছেন। এখন বাকি কাজ আমাদের। কেউ আছেন?

ক.

Dr. Masaru Emoto-এর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইন্সটিটিউটের গবেষকগণ এখন এই ক্রিস্টালের স্বাস্থ্যগত দিকটা নিয়েই কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন Yasuyuki Nemoto, Director of IHM General Institute. মনোজগতের আবেগিক পরিবর্তন, প্রার্থনা, দর্শন (টিভি,পর্নোগ্রাফি), কথোপকথন, আত্মবিশ্বাস, মানসিক শক্তি— এই বিষয়গুলো কোষস্থ ‘৪র্থ দশার পানি’-কে কীভাবে প্রভাবিত করে, জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকে কীভাবে প্রভাবিত করে, আমাদের দেহের প্রতিরক্ষা (Immunological Capacity), স্বয়ংক্রিয় আরোগ্যলাভকে (Self-Healing) ত্বরান্বিত করে; এ বিষয়গুলো নিয়েই চলছে তাদের পরবর্তী গবেষণা।

জানি না এরকম অলাভজনক, বাণিজ্য ধ্বংসকারক, ইসলামের পক্ষে চলে যায় এমন গবেষণা পুঁজিবাদী মেইনস্ট্রীম মিডিয়াতে কতটুকু আসবে। মুসলিম বিজ্ঞানীদের ঘুম যতদিন না ভাঙছে; বিলিভ ইট অর নট—কুরআনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক আপনাকে সুস্থ রাখে।

কুরআনের কারণে যে নিখুঁত ক্রিস্টালটা হল, মানে পানি তার সবচেয়ে নিখুঁত বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে। পানির তৈরি করার কথা ষড়ভুজাকার ক্রিস্টাল, এই অবস্থায় পানি সেটাই করেছে যেটা আসলেই তার করার কথা।

মানে এটাই হচ্ছে পানির যথার্থ অবস্থা। আল্লাহ বলেছেন, এই কুরআন হল শেফা (রোগমুক্তি)। [12] মুসলিমরা নামাযে তিলওয়াত করে, নামাযের বাইরে দেখে তিলওয়াত করে, প্রতিদিন বিশেষ কিছু সূরার আমল (ইয়াসীন, সাজদাহ, ওয়াক্বিয়া, মুলক) ওযীফা হিসেবে করে। এর স্বাস্থ্যগত প্রভাব ডেফিনিটলি আছে, থাকতেই হবে।

খ.

বিভিন্ন অসুখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াত বা দুয়া পড়ে ফুঁক দিয়ে রুকিয়া করেছেন। আজ বিজ্ঞান বলছে দেহস্থ পানির ওপর এর প্রভাব আছে। ঝাড়ফুঁক-পানিপড়া এগুলো নিয়ে কত ঠাট্টা- বিদ্রূপই না করেছে একসময়। বিজ্ঞান যত বড় হচ্ছে তত সুন্নাত আবিষ্কার করছে, করবে।

আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত,

জিবরীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ?’ তিনি বললেন, ‘‘হ্যাঁ।’’ জিবরীল তখন এই দো‘আটি পড়লেন, ‘বিসমিল্লা-হি আরক্বীক, মিন কুল্লি শাইয়িন ইউ’যীক, অমিন শাররি কুল্লি নাফসিন আউ ‘আইনি হা-সিদ, আল্লা-হু ইয়াশফীকা, বিসমিল্লা-হি আরক্বীক।’

অর্থাৎ আমি তোমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু থেকে এবং প্রত্যেক আত্মা অথবা বদনজরের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ঝাড়ছি। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়ছি। [13]

গ.

‘পানিপড়া’ এখন আর হাসাহাসির বস্তু নেই, কুসংস্কারের পর্যায়ে নেই। এটা এখন বাস্তবতা। পানির ওপর কুরআনের আয়াতের প্রভাব— এটা এখন বিজ্ঞান। এবং দৃশ্যমান বিজ্ঞান। আপনি একটু আগেই সে ছবি দেখেছেন।
হেটার্সরা বলবে, হুজুররা এবার ‘পানিপড়া’ দিয়ে ধান্ধা করবে।

হুজুরদের ডিসটার্ব করবেন না। সূরা ফাতিহা, তিন কুল,আয়াতুল কুরসি আপনি নিজেই পারেন। আর নির্ভরযোগ্য রুকিয়ার কিতাব কিনে নেন। উযু করে নিজেই করেন, পারলে রোগী নিজেই করুক। আরও ভাল। আলিম-উলামার ইমেজ নষ্ট করার জন্য আমাদের অলসতাই দায়ী। [14]

ঘ.

নজর লাগা ব্যাপারটা এখন প্রমাণিত। এটাও এখন আর কুসংস্কার বলার সুযোগ নেই, যদি বিজ্ঞান বুঝে থাকেন বিজ্ঞানীদের মত করে। আর যদি পুঁজিবাদী বাণিজ্য দিয়ে বুঝে থাকেন তাহলে ভিন্ন কথা। পর পর দুটো আন্তর্জাতিক রিসার্চে আমরা দেখেছি কিভাবে পানির ধর্ম পরিবর্তিত হয়েছে ইমোশন দেবার কারণে। কারো মনের নেগেটিভ ইমোশন আমার দেহস্থ পানিকে প্রভাবিত করে আমাকে অসুস্থ করতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানের ইঙ্গিত এখন এদিকেই।

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত,

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: বদ নজর সত্য। [15]

আম্মাজান আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আদেশ করেছেন কিংবা তিনি বলেছেন, নজর লাগার কারণে ঝাড়ফুঁক করতে। [16]

উরওয়া ইবনু যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত,

নবী-পত্নী উম্মে সালমা (রা)-এর ঘরে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করলেন। তখন ঘরে একটি বাচ্চা ক্রন্দন করিতেছিল। লোকেরা আরয করল, বাচ্চাটির ওপর বদনজর লেগেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বদনজরের জন্য ঝাড়ফুঁক করাচ্ছো না কেন? [17]

ঙ.

ধরেন, আপনার অপছন্দের কিছু একটা ঘটল। আপনি বললেন ‘ওহ শিট’ না ‘ওহ নো’ সাথে আছে লোকসানের বেদনা; আপনি নিজের ভেতরই প্রেসার অনুভব করবেন। আর আপনি বললেন ‘ইন্নালিল্লাহ’ (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য), সাথে এই অনুভূতি— আমি ও আমার সবকিছু আল্লাহর, আমি নিজেই ক্ষণস্থায়ী, আমার এই লোকসান তো আরও ক্ষণস্থায়ী। আপনার মানসিক চাপ অনেকটাই কমে গেল। কমে গেল অনেকগুলো বড় বড় রোগের রিস্ক ফ্যাক্টর— উত্তেজনা, অ্যাংজাইটি।

কথায় কথায় বিসমিল্লাহ-আলহামদুলিল্লাহ-ইন্নালিল্লাহ-সুবহানাল্লাহ বলে মুসলিমরা, প্রত্যেক কাজের আগে, ঘুম থেকে নিয়ে সহবাস, সবকিছুর আগে দুআ শিখিয়েছেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম— এরও প্রভাব আছে দেহের এই বিপুল পরিমাণ পানির ওপর। একজন মানুষের পুরো দেহের ওজনের ৬০% পানি। ৭০ কেজি ওজনের একজন মানুষের দেহে ৪২ লিটার পানি। আপনার ১ ট্রিলিয়ন মানে ১০০,০০০,০০০,০০০ পিস কোষের ভেতরে আছে ২৮ লিটার পানি (Intracellular fluid) আর বাইরে আছে ১৪ লিটার (Extracellular fluid)। এই বাইরের ১৪ লিটারের মাত্র ৩ লিটার হল রক্তে (blood plasma), আর ১১ লিটার টিস্যু স্পেসে (interstitial fluid)। [18] এই বিপুল পানির মিডিয়ামে ঘটে চলেছে হাজারও রাসায়নিক বিক্রিয়া। পানি যদি তার নির্ধারিত ধর্ম বজায় রাখতে না পারে, বিক্রিয়ায় সমস্যা হতে বাধ্য।

তাই পাঠকবৃন্দের প্রতি আরজ, বিজ্ঞান বিজ্ঞানের মত এগোক। আমরা আগের মতই ‘ভক্তির মোড়কে বিজ্ঞান’ খাই। ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার পাশাপাশি কুরআন-হাদিসে বর্ণিত চিকিৎসাও ফলো করি। এজন্য নির্ভরযোগ্য একটি কিতাব হল: আল ইলাজ বির রুক্বা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, , শায়খ সাঈদ ইবনে আলী ইবনে ওহাফ আল-কাহতানী রহ. রচিত।[19] কিতাবটিতে বিশেষ বিশেষ অসুখের জন্য বিশেষ বিশেষ সূরার আমল, বা আয়াতের আমল দেয়া আছে। সম্প্রতি মাকতাবাতুল আসলাফ প্রকাশিত তরুণ

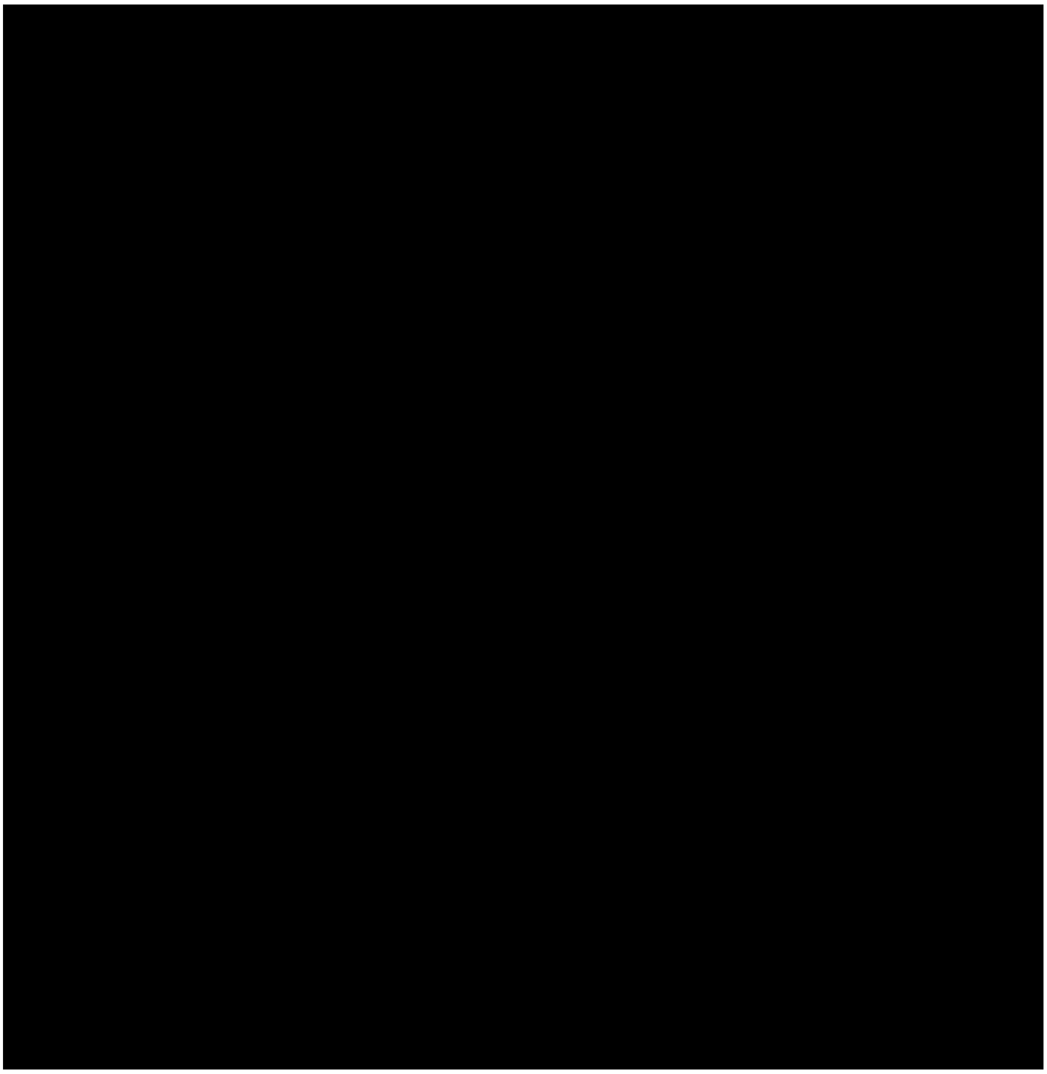

* হে মানবকুল, তোমাদের পালনকর্তার কাছ থেকে তোমাদের প্রতি পৌঁছেছে উপদেশবাণী এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। [সূরা ইউনুস: ৫৭]

অসুস্থ ব্যক্তির করণীয়ঃ

- বেশি বেশি কুরআন তিলওয়াত এবং দুরুদ শরিফ পাঠে রত থাকা

- সূরা ফাতিহা পড়া

- ইস্তিগফার করা

- সদকা করা

- অন্তর আল্লাহর দিকে, আখিরাতের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখা

- কুরআন-হাদিসে বর্ণিত আরোগ্যের দুআগুলো বেশি বেশি পাঠ করা

রোগ প্রতিরোধে করণীয়ঃ

- আগেরগুলো সব।

- ইসলামী জীবনযাপন করা

- পূর্ণ সুন্নাতের অনুসরণ

- নামাযের পর দৌড় না দিয়ে ছোট ছোট সুন্নাত-মুস্তাহাব আমলগুলো পুরা করা।

রেফারেন্স

[1] http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html

[2]
http://www.explorejournal.com/article/S1550-8307(06)00327-2/abstract

[3]
https://www.researchgate.net/publication/255669110_Effects_of_Distant_Intention_on_Water_Crystal_Formation_A_Triple-Blind_Replication

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550830706003272

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16979104

[4]
https://www.researchgate.net/publication/255669110_Effects_of_Distant_Intention_on_Water_Crystal_Formation_A_Triple-Blind_Replication

[5]
http://www.waterconf.org/participants-materials/2014/Presentations/Yasuyuki%20Nemoto_Water_Conference_2014.pdf

[6] PRWeb is a leading online news and press release distribution service. [illegible] ABC news, Fox news.

[7] http://www.prweb.com/releases/2014/07/prweb12008599.htm

[8] https://www.pollacklab.org/jerry [illegible] https://docs.wixstatic.com/ugd/4c5fa1_1ade16c23c984a37ab4d20c4d3f710e6.pdf [illegible]

[9] https://ecee.colorado.edu/~ecen5555/SourceMaterial/Pollack13.pdf [illegible]

[10] Pamala O, Life Colors – What the colors in your aura reveal, New World Library, 2004

[11] https://www.researchgate.net/publication/313472087

[12] [illegible]: [illegible]

[13] বুখারী ৯৭২ , মুসলিম ২১৮৬ , ইবনু মাজাহ ৩৫২৩ , আহমাদ ১১১৪০-১১৩১৩, রিয়াদুস সলেহিন রোগীদর্শন ও জানাযায় অংশগ্রহণ ৯১৩ (iHadis)

[14] "...he recites al-Faatihah then blows into the water – there is nothing wrong with this. Some of the salaf did this, and it is effective and beneficial by Allaah's leave." [Fataawa al-Shaykh Ibn 'Uthaymeen, 1/107] https://islamqa.info/en/21581

[15] বুখারী ৫৭৪০ , মুসলিম ২১৯৩ , ইবনে মাজাহ ৩৫০৬ -৩৫০৭-৩৫০৮ (iHadis)

[16] বুখারী ৫৭৩৮ , মুসলিম ২১৯৫ (iHadis)

[17] বুখারী ৫৭৪৯ , মুসলিম ২১৯৭ (iHadis)

[18] Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 13rd Edition, Chapter: Body Fluid Compartments, Page 306

[19] এলাজে কোরআনী নামে আরও কিছু কিতাবের সাথে মিলে এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত।

মানবশিল্প

SHAMSUL AREFIN SHAKTI·TUESDAY, OCTOBER 30, 2018

ইদানীং বাসায় থাকিই কম কম। ভোরে উঠে নামাযের পর একটু পড়িলিখি। ৮টা -২টা হাসপাতালে থাকি। রোগী দেখা ছাড়াও অফিস -ওয়ার্ক থাকে। যুহরের পর বাসায় একটু খেয়েই চেম্বারে ২ ঘণ্টা বসি। আসরের পর মহল্লায় অফলাইন দাওয়াতের কাজ থাকে। বাসায় যাই একবারে এশার পর , তালিম শেষ করে। মনমেজাজ -শরীর ভাল না থাকলে মাগরিবের পরও যাই মাঝেসাঝে। আর হাসপাতাল -চেম্বার -মসজিদ সব কাছাকাছি , খাদীজাকে দেখতে মনে চাইলে এক ফাঁকে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু খাদীজার মায়ের দিকে এখন আর তাকানোর খুব বেশি ফুরসত হয় না।

বাসায় পার্মানেন্ট কাজের মানুষ নেই। দেড় বছরের ছোট্ট একটা খাদীজা আর খাদীজার একটা আম্মু। সকালের দিকে একজন বুয়া এসে মোটা মোটা কাজগুলো করে দিয়ে যায়। বাসন ধোয়া, কাপড় ধোয়া, ঘর ঝাড়া, আর মোছা। মাছটাছ থাকলে কুটে দেয়। খাদীজার মায়ের কাজ শুধু রান্না আর খাদীজা। অবশ্য যেদিন বুয়া কোন কারণে আসে না, সেদিন বেচারীর দিকে তাকানো যায় না।

কালেভদ্রে খাদীজার মায়ের দিকে চেয়ে থাকি, তার কাজ দেখি, ত্রস্ত এবং ব্যস্ত। এই বাচ্চার হাগু সাফ চলছে, কোলে করে বেসিনে নিলো শুচু করাবে, আবার ডায়পার পরিয়ে একটু রান্নাঘরে যেতেই দেখা গেল খাদীজা পানি ফেলেছে কোথাও, আবার ছোটো সেখানে। খাওয়ার সময় তো তিনবেলা তিন ঘণ্টা লাগে, দশ গাল খাবার দিলে তার পাঁচ লোকমা দেয় বের করে। আমারই মাথা গরম হয়ে যায়। আবার ঘুম পাড়াও, কখনো পায়ে দুলিয়ে, কখনও কোলে নিয়ে যিকির করে করে। আবার পুরো ঘর এলোমেলো করে রাখে বাচ্চা, সেগুলো গুছানো। নিজের গোসল, খাওয়া, কাপড় ধোয়া, নামায, তিলওয়াত আছে। আমি বাসায় থাকলে এর কিছু কাজ আমি করি, কিন্তু যখন থাকি না, তখন? রাতে আমি বেঘোরে ঘুমাই। কিন্তু মাঝেমধ্যে টের পাওয়া যায়, খাদীজা উঠে প্যাঁপুঁ করছে, রাতে ৩-৪ বার ওঠে স্ন্যাকস খেতে। তার মানে সারাদিন এসবের পর রাতেও ওর মার পূর্ণ ঘুম হয়ে ওঠে না। এই আধাখেঁচড়া ঘুম নিয়েই পরদিন আবার দৌড়াও, সারাদিন, এভাবে দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। পরেরটার বেলায়ও এভাবেই ও ছুটবে, তার পরেরটার বেলায়ও, এভাবে বছরের পর বছর। কোন অভিযোগ নেই, কোন অপারগতা নেই। সাময়িক বিরক্তি যে নেই তা নয়, তবে তাতে দু'চামচ মমতা মেশানো থাকে।

কখনও সাহায্য করা থামিয়ে ওর মায়ের দিকে চেয়ে থাকি। তার কাজ করা দেখি। ভাবনার টাইম মেশিনে চড়ে পিছিয়ে যাই তিরিশটা বছর। খাদীজা দেখতে এমনিতেই আমার মত, বেশি রিপ্লেস করতে হয় না। খাদীজাটা হয়ে যায় ছেলে বাবু, আর খাদীজার মায়ের জায়গায় ভেসে ওঠে অন্য কেউ। চোখ রগড়ে টের পাওয়া যায় বহু চেনা এক নারীর মুখাবয়ব। একই দৌড়ঝাঁপ, একই

খাবার নিয়ে পিছন পিছন ছোটা, একই রাতজাগা চেহারা, একই চুমু আদর, পোশাক বদল, বুকের সাথে চেপে ধরা। একই স্বপ্ন-আবেগ- ভালোবাসা। হাজার বছরের পুরনো সেই সিনারিও, বার বার, প্রতিদিন, প্রতি ঘরে, প্রতি প্রজন্মে।

নিজের স্ত্রীর পানে চেয়ে আবিষ্কার করা যায় নিজের মা-কে। একই সফটওয়্যার। মানুষ কীভাবে বিয়ের পর বাপমাকে ভুলে যায়, আমার এন্টেনায় ধরে না। বরং বিয়ের পর তো বাপমায়ের প্রতি অনুভূতিগুলো আরও ধারালো হবার কথা। সন্তানের প্রতি স্ত্রীর আচরণ দেখে আমার প্রতি আমার মায়ের আবেগ কেমন ছিল, কষ্ট-শ্রমটা কেমন ছিল এসব তো সহজে বুঝে আসার কথা। আজ আমি যেমন আমার সন্তানটার সাথে খেলি, অর্থহীন কিছু শব্দ আর বাবা ডাক শোনার জন্য আকুলিবিকুলি করি, অফিস থেকে ছুটে ছুটে আসি, বাচ্চার কণ্ঠ শোনার জন্য ফোন দিই, কষ্টার্জিত টাকাগুলো বাচ্চার স্রেফ হাবিজাবি কিনে তৃপ্তি অনুভব করি, একটা খেলনা কিনে কল্পনায় হারিয়ে যাই যে ও পেয়ে কেমন খুশি হবে, আজিব আজিব সব নামে ডাকি- আমার কলিজা, আমার গিলা, আমার মেটে, আমার পাখপাখালি। ঠিক তিরিশ বছর আগে এমনই আরেক টগবগে যুবক আমার জন্যও এমনটাই অনুভব করেছিলেন। আমার ছোট হাত আঙুলে পেঁচিয়ে এই মাটির উপরই হেঁটেছিলেন। নিজের বাচ্চার দিকে চেয়ে এই অনুভূতি যার হয় না, সে তো আলবৎ প্রতিবন্ধী।

সন্তানবৎসল বহু পিতাকে দেখা যায় নিজের বাপমায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে। নিজ বাপকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো লোকটারও সন্তান আছে। আশ্চর্য সব ডাবল স্ট্যান্ডার্ড এই ভোগবাদী সেকুলার পৃথিবীর। পুঁজিবাদের বিষে একপল ভাবার ফুরসত নেই, হিসেব মিলানোর ফুরসত নেই। মানুষ না বায়োবট আমরা? সংসারে স্বামীস্ত্রী পরস্পরের পিতামাতার দিকে, আই মিন আপনাদের শ্বশুর শাশুড়ির দিকে একবার তাকান তো। তাকিয়ে ভাবেন, আপনার ভালোবাসার মানুষটিকে (স্বামী/স্ত্রী) এই মানুষ দুটো (শ্বশুর/শাশুড়ী) ঠিক আপনারই মত করে ভালেবেসেছে, আগলে

রেখেছে, আহ্লাদ মিটিয়েছে, বড় করেছে ‘আপনার মনের মত’ করে; যেমনটি আপনি আজ আপনার সন্তানের জন্য করছেন। পাগলের মত ভালবেসে আজ আপনার হাতে তুলে দিয়েছে। তাঁদের মনের অব্যক্ত সেইসব অনুভূতি ফীল করার চেষ্টা করুন তো। অনুভূতি লিখে বুঝানো যায় না, অনুভূতিকে অনুভবেই বুঝতে হয়।

তো আসলে যেটা বলতে চেয়েছিলাম আপনাদের। খাদীজাকে আমি ডায়পার পরালে ওর মা বলে-হয়নি। খুলে আবার নিজে পরায়, আবার খুলে আবার পরায়, রাবারগুলো আঙুলে টেনে ঠিক করে, আবার কোমরের কাছে আঙুল ঢুকিয়ে মাপে যথেষ্ট টাইট এবং একই সাথে যথেষ্ট লুজ আছে কি না। স্ট্র্যাপগুলো একদম সোজা, আমি লাগাইসিলাম তেড়াব্যাকা করে। আবার আমি প্যান্ট পরালে বলে- হয়নি। পাজামার মাঝের সেলাইটা একপাশে সরে আছে, বাচ্চা কষ্ট পাচ্ছে। সরিয়ে আবার মাঝামাঝি নেয়, আবার একটু তাকিয়ে দেখে ঠিকমত পজিশন হয়েছে কি না। খাবার বানানোর টাইমে আজিব আজিব সব রেসিপি তার মাথায় আসে, কেকা আপুও ফেল। সেরেলাকের মধ্যে ডিমের কুসুমের ভর্তা, এই টাইপ। মাথা নষ্ট। পায় কই এসব আইডিয়া? আবার খাওয়ানোর সময় আরেক সার্কাস। এই ভাউ আসলো, এই দাদীআপু লাঠি নিয়ে আসলো, এই দেখ বেবিটা খায়। এক লোকমা মুখে নিলে মায়ের চোখেমুখে কী খুশি, যেন ঈদ। পরের লোকমা বের করে দিল, পরেরটাও। আবার শুরু হল, এই ভাউ, এই পা (পাখি)। রাগে আবার চিৎকার করে ওঠে কখনো- ইয়া বিনতি। খাওয়ানোর সময় যেগুলো বলে তার সবচেয়ে কম আজগুবিগুলো আপনাদের বললাম। আমি আম্মুর কাছে শুনেছি, আমি ছোটবেলায় খাবার নিয়ে গালের একপাশে রেখে দিতাম। কখনো ওভাবেই ঘুমিয়ে যেতাম, লালা পড়ে বিছানাবালিশ নষ্ট হত। আম্মা বসে বসে ‘গেলো রে’ ‘চাবাও রে' করত, আঙুল দিলে গালে ঘষে চাবানোর চেষ্টা করত, ঘণ্টা পেরোতো। খাদীজার খাওয়া দেখতে দেখতে মন ভিজে ওঠে। রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা। আবার গোসলের সময় আমাকে পানি ঢালতে দেয় না। বাচ্চার পেটে চলে যাবে, দম আটকে যাবে। মাথায় পানি ঢেলেই চেহারার উপরের পানিটুকু সাপটে নামিয়ে দেয়। হাগুর শুচুর তোয়ালে আলাদা, গোসলের তোয়ালে

আলাদা। গোসলের পর মুছে, ক্রীমট্রীম মেখে ফিটফাট বানিয়ে এবার ঘুম।
আমি শিল্পীর কাজ দেখি। পৃথিবীর সবচেয়ে নিপুণতম শিল্প।
মানবশিল্প।

পশ্চিমা পুঁজিবাদ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে, ঘরে থাকো মানে তুমি অকম্মা, বেকার। তোমার স্ত্রী কী করে? কিছু করে না, হাউজওয়াইফ। গর্দভ, তোমার স্ত্রী শিল্পী, মানবশিল্পী। পুঁজি কামানো-জমানো, বস্তু কেনা, ভোগ করাই জীবনের অর্থ-সার্থকতা-মন্ত্র; এই দাসত্বের চশমা খোল, আর দুনিয়া দেখ। যে টাকা কামায় সে কম্মা, আর যে টাকা বাঁচায় সে অকম্মা, কিছু করে না। এই ছাগল প্রজাতির সাইকোলজি থেকে বের হন ভাইজান। আপনার স্ত্রীর কারণে আপনার সন্তানের টিচার খরচ, ডাক্তার খরচ, ডেকেয়ার খরচ, আরও কত খরচ বেঁচে যায় সেটা চোখে পড়ে না? মাস শেষে যে টাকাটা আপনি ব্যাংকে রেখে স্বপ্নের জাল বোনেন, ওটাই আপনার স্ত্রীর ইনকাম। মানবশিল্পের পিছনে বেঁচে যাওয়া মূল্যটাই জমানোর মওকা মেলে আপনার।

চিনি শিল্প, লৌহ শিল্প, জাহাজ শিল্প, রেশম শিল্প, তামাক শিল্প। একটা কাঁচামালকে আরও দামী আরও ব্যবহারযোগ্য পণ্যে পরিণত করাটাই তো শিল্প, তাই না? একটা র' মানবসন্তানকে মেহনত করে একজন সচেতন সুস্থ বিবেকবান সুনাগরিক মনুষ্যত্বওয়ালা দামী মানুষ বানানোর শিল্প এটা। মানবকে মানুষ বানানোর শিল্প। মানবশিল্প। মানুষ গড়ার শিল্প। আজ থেকে গৃহিণী- হাউজওয়াইফ-হোমমেকার সব বাকওয়াস বাদ। বোনেরা গলা চড়িয়ে নিজের পরিচয় দেবেন, আমি মানবশিল্পী। আর ভাইয়েরা নিজেদের স্ত্রীদের পরিচয় দেবেন বুক চাপড়ে, আমার বউ মানবশিল্পী। তোমার বউ পশ্চিমা পুঁজিবাদের দাসী? আর আমার বউ শিল্পী। ডোন্ট মাইন্ড।

আমার দীনী চিন্তার বয়স কম। তাই গল্পগুলো রিপিট হয়। রাগ হয়েন না।
মেডিকেলের এক ম্যাডাম ছিলেন, সাত ভাইবোন। কেউ ডাক্তার-ইনজিনিয়ার-

আমলা-শিল্পপতি। ওনার মা ‘রত্নগর্ভা’ অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত। ম্যাডাম একদিন ক্লাসে শোনাচ্ছিলেন। আমার মনে উঁকি দিচ্ছিল একটাই প্রশ্ন-ম্যাডাম, আপনি কি কখনো পারবেন রত্নগর্ভা হতে। ওনার মা ছিলেন মানবশিল্পী। সাত সাতটা শিল্প তৈরি করেছেন ঘুমিয়ে- না ঘুমিয়ে, খেয়ে-না খেয়ে। ম্যাডাম তো আর পারবেন না। পুঁজিবাদ কেড়ে নিয়েছে তাঁর শিল্পীসত্তা। তাঁকে কেবলই চাকুরিজীবী বানিয়েছে, পুঁজির দাসী বানিয়েছে, উনি শিল্পী হওয়াকে আজ ছোট মনে করেন। সৃষ্টিশীলতাকেই, শিল্পকেই আজ পরাধীনতা মনে করেন। আর ৯টা- ৫টা গোলামির মাঝে হাতড়ে বেড়ান স্বাধীনতা আর সম্মান। ওয়াহ বিবেক ওয়াহ।

তাহলে কি আমি নারীর চাকুরি-ব্যবসার বিরুদ্ধে? প্লিজ ‘মা খাদীজাহ তো ব্যবসায়ী ছিলেন’, এই দলিল দেবেন না। মুসলিম হবার আগে কী করেছেন, এসব দলিল না। ইসলাম আসার পর নারীর জীবিকা অর্জনের হাদিস, ঘটনা ও পরবর্তী ইতিহাসগুলো সামনে নিলে ইন জেনারেল যে পিকচার উঠে আসে তা হল, নারীকে পেশা নেবার অনুমোদন ইসলাম দেয়। তবে সে পেশা অফিসে পুরুষ কলিগদের সাথে ৯টা-৫টা দাসত্ব নয়। সেটা ঘরোয়া পরিবেশে, স্বাধীন ভাবে, ইচ্ছেমত, যেদিন ভালো লাগে পেশা করলাম, যেদিন ভালো লাগছে না করলাম না। এবং সৃষ্টিশীল কাজ, ডাটা এন্ট্রি বা কেরানিগিরি না। ঐ হাদিসটা তো খুব পরিচিত, এক সাহাবী এসে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমার খুব অভাব। নবীজী বলেন, বিয়ে কর। আবার এসে বলে, আমার খুব অভাব; নবীজী আবার বললেন, বিয়ে কর। এভাবে ৪ টা বিয়ের পর ৪ নম্বর বউ ছিলেন সূচিশিল্পে পারদর্শী। তার থেকে বাকি ৩ বিবি শিখে নিলেন। এবার ঘরই হয়ে গেল ফ্যাক্টরি। মহিলা সাহাবী-তাবেঈনদের মাঝে শিক্ষকতা পেশা বেশ প্রচলিত ছিল। হাদিস-ফিকাহ ছাড়াও ভাষা ও সাহিত্য, গণিত ও হিসাববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যার ক্লাস নিতেন তাঁরা নিজেদের ঘরেই। আর নার্সিং ও প্রসূতি সার্ভিস তো ছিলই। পর্দার হুকুম আসার আগে তো আর্মি মেডিকেল কোর মহিলা সাহাবীগণই সামলাতেন। উমাইয়া আর আব্বাসী খিলাফতে মেয়েরা আরেকটা পেশা খুব নিতেন— ক্যালিগ্রাফি,

হস্তলিখনশিল্প। নারীর পেশা গ্রহণের জন্য ইসলাম কয়েকটা শর্ত দিয়েছে বলে ‘আমার মনে হয়েছে’। পর্দা যেন লংঘন না হয়, আর স্বামী- সন্তানের হক যেন নষ্ট না হয়, মানে মানবশিল্পের যেন ক্ষতি না হয়। পর্দার বিষয়টা একদম কঠিন না, আজকের দিনে গার্লস-অনলি স্কুল বা কলেজ বা ইউনিভার্সিটি করা কোন ব্যাপারই না। হাসপাতালের একটা ফ্লোর উইমেন-অনলি করা কোন ব্যাপারই না (খিদমাহ হাসপাতাল একটা উদাহরণ মিনিমাম মিক্সিং-এর)। গার্মেন্টসের একটা-দুটো ফ্লোর গার্লস-অনলি করা কোন বড় ইস্যুই না। তাহলেই পর্দা সহজ হয়ে যায়, কর্মক্ষেত্র আর বাসার মাঝের রাস্তাটুকু শুধু বোরকা পরে যাওয়া লাগে। আর এখন অনলাইনের যুগে নারীর পেশা কত সহজ হয়ে গেছে— অনলাইন ব্যবসা করা যায় ফুড আইটেম বা পোশাকের, ফ্রীল্যান্সিং। আসলে সদিচ্ছা আর আল্লাহর ভয়টাই আসল। পুঁজিবাদী কর্পোরেট কেরানিগিরি নারীর জন্য না, ৯টা-৫টা বাধ্যশ্রম নারীর নাজুক শরীরের জন্য না, যে শরীরকে বিশেষভাবে বানানো হয়েছে মানবশিল্পের জন্য, কর্পোরেট কালচারের ক্যারিয়ার উদ্বেগ-টেনশন নারীর মন-আবেগের সাথে যায় না, যে মনকে আবেগকে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে মানবশিল্পের জন্য। বিস্তারিত নিয়ে একটা বই হচ্ছে ইনশাআল্লাহ, শুধু বোনদের প্রশ্ন নিয়ে। মোদ্দাকথা, ‘তোমাদের’ সারভাইভালের জন্য প্রজন্মকে ফিটেস্ট করে গড়ে তোলার শিল্পী কারা? নারীরা।

‘আমার মতে’, আজকে নারীবাদী এজেন্ডাগুলোতে মুসলিম মেয়েরা পা দেবার মূল কারণ আমরা পুরুষরাই। আমার মনে হয়, আমার তো কতকিছুই মনে হয়। পারিবারিক ইনসিকিউরিটি, সমাজের পুঁজিবাদী মূল্যবোধ আর নারীর প্রতি মুসলিম পুরুষের অনৈসলামিক আচরণ-ই তাদেরকে পুঁজিবাদের সহজ শিকারে পরিণত করেছে। মেয়েদের বুঝানো হয়, তুমি তো পরিবারে স্বামীর কাছে নিরাপদ না, স্বামী বের করে দিলে তুমি কী করবে? নারীর ক্ষমতায়ন হলে, তুমি চাকরি করলে তোমার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে, অবদান বাড়বে, তখন স্বামী তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না, তোমাকে বের করে দিলেও তুমি তো স্বাবলম্বী, বা স্বামী খারাপ আচরণ করলে ডিভোর্স

দেয়া তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে। সমাজ ভাবে, যে টাকা আনে না সে অকম্মা। আমার স্ত্রী অমুক চাকরি করে, বলার মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তি আছে। বা আমি টাকা কামাই করি, বস্তুবাদী দুনিয়ায় আমার বস্তু কেনার সামর্থ্য আছে, আমার ক্যারিয়ার আছে, এর মধ্যে আত্মতৃপ্তি খুঁজে ফেরে আমাদের মেয়েরা। আমরা পুরুষেরা যদি তাদের পারিবারিক অবস্থানটা তাদের দিতাম, যেটা ইসলাম তাদেরকে দেয়, আজ হয়তো বাঁধন ছেঁড়ার জন্য তারা এতটা ব্যাকুল না-ও হতে পারত। হাজার হাজার নির্লজ্জ বেদীন মুসলিম পুরুষের যৌতুকের দাবি, টাকা চেয়ে প্রহার, লবণ কম হওয়ায় প্রহার, নারীর শ্রমের মূল্যায়ন না করা, প্রাপ্য আচরণটুকু না করার খেসারত আজ দিতে হচ্ছে। নিজ স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ হোন। আজ আপনি যে ‘আপনি’, তার পিছনে একজন শিল্পীর বছরের পর বছরের শ্রম আছে, বিনিদ্র রাত আছে, মেশানো মমতা আছে, নিপুণ কারিগরি আছে। সেই শিল্পীকে ‘মা’ বলা হয়। আপনার ‘ব্যক্তি’ স্ত্রীর প্রতি না হোক, কমপক্ষে এই হাজার বছরের শিল্পের প্রতি কৃতজ্ঞ হোন। এই শিল্পের খাতিরে আপনার স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধানত হোন। আপনার স্ত্রী একজন রক্ত-মাংসের মানুষ নন শুধু, একজন শিল্পী, হাজার বছরের পুরনো সেই শিল্পের অসংখ্য কারিগরের একজন গর্বিতা কারিগর, আপনার বিবি একজন ‘মা’। এবার তাকান তো আপনার স্ত্রীর দিকে।

আর বোনেরা, ক্যারিয়ারের দাসত্ব কখনোই এই ঐতিহ্যবাহী নিপুণতম শিল্পের চেয়ে আরাধ্য হতে পারে না। পুঁজিবাদ আপনাদেরকে পুরুষের প্রতিযোগী বানিয়ে জবমার্কেটে যোগান বাড়াতে চায়। যোগান বাড়লে চাহিদা কমে, ফলে দাম কমে। পুঁজিবাদের লাভ হয়। আপনারা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন না, পুঁজিপতিদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন। যাতে কম পারিশ্রমিক দেয়া লাগে, মুনাফা বেশি থাকে ‘জেন্ডার সমতা’র নামে সেই চালই চেলেছে ক্যাপিটালিজম। এটা আপনি যত সহজে বুঝে নিবেন, তত আপনার জীবন মসৃণ হবে, আনন্দদায়ক হবে। নয়তো ক্যারিয়ারিজমের যাঁতাকলে আপনিই পিষবেন। নিজ শিল্পীসত্তাকে অশিক্ষিত বুয়ার হাতে তুলে দিয়ে, আপনি আনফিট একটা প্রজন্মের জন্ম

দিয়ে যাচ্ছেন, আর কিছুই না। আয় করা আর ক্যারিয়ারিজমের বিষ এক না, ইসলাম আপনাকে আয় করতে নিষেধ করে না। কিন্তু ইসলাম নিজ শিল্পীসত্তাকে ব্যবহার করে মনের আনন্দে আপনাকে আয় করতে বলে, ঘরোয়া নিরাপত্তার সাথে। ইসলাম আপনার থেকে ৯টা-৫টা বাধ্যশ্রম নিতে চায় না। কেবল এই মানবশিল্পের খাতিরেই আপনাকে ইসলাম অব্যাহতি দিয়েছে রোজগারের বাধ্যবাধকতা থেকে, যুদ্ধের দায়িত্ব, শাসনের গুরুভার থেকে। মাকাসেদে শরীয়া বা ইসলামী সিস্টেমের ৫টা মৌলিক উদ্দেশ্যের একটা ‘আন-নছল’ বা ‘প্রজন্ম’, অর্থাৎ মানবশিল্প। ইসলাম মানব চায় না, মানুষ চায়। আর সেই মানুষ গড়ার শিল্পের শিল্পীরা কীভাবে জবাবিহি করবে আসন্ন নষ্ট প্রজন্মের কাছে সেটাই দেখার বিষয়।

পৃথিবীর সকল মানবশিল্পীদের আমার সেলাম।

দ্বিতীয় ভাবনা
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·TUESDAY, NOVEMBER 6, 2018

অনেকে আমার লেখা পড়ে মনে করতে পারেন, এই ব্যাটা খালি নিজের ঢোল পিটায়, আমি এই করেছি, আমার অমুক এই করে। আসলে ব্যাপারটা হল, আমি আমার সাথে ঘটা প্রতিটা ঘটনা নিয়ে ভাবি। তা থেকে আমি নিজে যে শিক্ষা নিই, তাই লিখি, কারো যদি কাজে আসে, এজন্য। এজন্য আমার অমুক, আমার তমুকের কথা চলে আসে। ঐ সিনারিওটা বলে শিক্ষাটা উপস্থাপন করি যাতে আপনাদের চোখের সামনে একটা চিত্রকল্প ভেসে ওঠে। ফলে আপনারাও অনুভব করতে পারেন শিক্ষাটা আমারই মত করে। অনেকে বিরক্ত হন, ইনিয়ে বিনিয়ে এতো কথা না লিখে জিস্ট অংশটা লিখলেই তো হয়, বাপু। আসলে আমি আপনাদের কোন শিক্ষা দিতে চাই না, সে যোগ্যতাও আমার নেই, আমি শুধু ভাবাতে চাই, অনুভব করাতে চাই। কোন নীতিকথা শেখানোর জন্য লিখি না, বিষয়গুলো আমি যেভাবে ফীল করি, আপনাদেরকেও করাতে চাই, তাই ইনিয়ে বিনিয়ে এতো কথা লিখতে হয়।

২০১৩ এর অক্টোবর মাস, খুলনার রূপসা থানা। ৪০ দিনের জামাত পাঠানো হয়েছে কাকরাইল থেকে। মালয়েশিয়ানদের সাথে ২৫ দিন দিনাজপুরে কাটানোর পর আমাকে এই জামাতের জিম্মাদার বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। সৌদি প্রবাসী ৪/৫ জন, বরিশালিয়ান বাপবেটা, ভোলার মুরুব্বি ৩/৪ জন, আর ঢাকাইয়া ৩/৪ জন, মোট ১৮/১৯ জন। একজন বাইপোলার ডিজর্ডারের রুগী ছিল, সে কয়েকদিনের মাথায়ই এক মুরুব্বিকে মেরেটেরে চলে গেছে। সবচেয়ে শুকরিয়ার বিষয় ছিল জামাতে সুনামগঞ্জের এক হাফেজ, আর দুইজন আলিম ছিলেন, একজন আবার মুফতি। আবার সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিল, আমি- মুফতি সাহেব আর মাওলানা সাহেব ৩ জনই ছিলাম সমবয়েসী, ১/২ বছরের ছোটবড়। যাক, রেখে ঢেকে লাভ নেই, প্রেজেন্টিং বিফোর ইউ বন্ধুবর মাওলানা Khalil Ahmed ফরিদাবাদী এবং মুফতি Abdur Rakib দিনাজী হাফিযাহুমাল্লাহ-কে। আসলে আলিমদের এতো কাছে আগে কখনো আসা হয়নি, আগের জামাতে আমীর সাহেব ছিলেন পীরজী হুজুর রহ. এর নাতি মাওলানা শরীফ সাহেব। আর এবারকার মাওলানা খলীল ছিলেন হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর নাতি, মোবারক সোহবত। এই জামাতের মত মেহনত আর মজা আর শেখা আর কোন জামাতে হয়নি আমার এখনও। খলীল সাহেবের তত্ত্বাবধানে সূরা ইয়াসীন মুখস্ত করি, প্রতিদিন ছবক দিয়ে দিয়ে। দুইজন মাওলানা মুফতী পেয়ে সাথীরা ভরপুর কুরআন সহীহ করেছে, আর দুজনাকে নিঙড়ে মাসয়ালা জেনে নিয়েছে। ওনারা আলিম হয়েও আমার মত মূরুক্ষকে যেভাবে মেনে চলেছেন, যেন আমি উনাদের কোন উস্তাদ। জামাতে এক মসজিদে গিয়ে সাথীদের ভাগ করে আশেপাশের ৩ মসজিদে পাঠিয়ে দিতাম। উনারা দুপুরের পর থেকে সেখানে গাশত করে মাগরিবের পর বয়ান করে মসজিদ আবাদ বুঝিয়ে ৩ দিনের জন্য তৈরি করতেন, শেষের দিন কাছায়ে কুছায়ে আনার চেষ্টা করতেন। আল্লাহর ফজলে বহু মসজিদে তালিম-পরামর্শ-দাওয়াতের আমল চালু হয় ঐ সফরে, ৩ মসজিদে একসাথে মেহনত হত, সাথীও বেশি ছিল। কয়েক মসজিদ পেরিয়ে গেলে পিছনের মসজিদ থেকে সাথীরা খবর নিয়ে আসত— আমীর সাহেব, আজ আমাদের ফজরে ২ কাতার লোক হয়েছে, আজ তালিমে ৫০ জন বসেছে। আবার রাতেও মসজিদ আবাদ রাখা হত, আমরা দুজন দুজন করে পাহারা আর কিয়ামুল লাইলের আমল করতাম। একজন নামাযে দাঁড়াত ১ ঘণ্টা, আরেকজন পাহারা

দিত, ভাইস ভার্সা। ২ ঘন্টা হয়ে গেলে এরা ঘুমাতে যেত, অন্য দুজনকে ঘুম থেকে তুলে দিত। সারা রাত মসজিদে কেউ না কেউ কাঁদত। সাথীরা সবাই, আলিম দু’জনও নিজেদের মিটিয়ে দিয়ে মেনেছেন আমাকে।

প্যাঁচাল শেষ। একদিন আমরা স্থানীয় এক মাদরাসা যিয়ারতে গেলেম। মাদরাসার লাইব্রেরি দেখে আমার খুব শখ হল, আমি বড় হলে নিজে একটা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করব। এক আড্ডায়, শেয়ার করলাম সবার সাথে স্বপ্নটা। দীনের বুঝ এলে কে না চায় একটা মাদরাসা করে কবরে বসে বসে সওয়াব কামাতে। অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করল। কিন্তু স্থিতধী ও চুপচাপ মাওলানা খলীল দিলেন ভিন্ন চিন্তার খোরাক। সেটাই আজ শোনাব আপনাদের। উনার সারবক্তব্যটা ছিল এমনঃ

মাদরাসাগুলোর উদ্দেশ্য দীনের হিফাজত। আল্লাহ তাআলার রহমতে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান-বাংলাদেশ মিলে এখন যে পরিমাণ মাদরাসা আছে, তাতে দীন ও দীনের চর্চা যে পরিমাণে হচ্ছে, তাতে সহসা দীন মিটে যাওয়া অসম্ভব, আল্লাহর ইচ্ছায়। তবে এখন সমাজে ২টা সমাজ-বিভাজন প্রকট। একটা অংশ দীন মানতে চায়, দীন মানার উপযোগী পরিবেশ চায়। আরেকটা অংশ দীন সম্পর্কে বেখেয়াল, দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী, দুনিয়া কামাইয়ের প্রয়োজনে যা দরকার তা-ই করতে ব্রতী। ১ম অংশের সাথে ২য় অংশের যোগাযোগ, ভাবের লেনদেন আশংকাজনকভাবে কম। একমাত্র তাবলীগ জামাতের কিছু কার্যক্রম ছাড়া (থাকলেও আমি জানি না) বাকি সকল কার্যক্রম ১ম অংশের ভেতরেই ঘুরপাক খায়। দীন যাদের কাছে গুরুত্ববহ কিছু না, বা অতটা না; তারা জুমআর বয়ানও শোনে না, খুতবার আগে আসে। দীনী বইপত্র বছরে একটাও পড়ে না। এই অংশটাই সমাজে বেশি। এদের উপর অনলাইন অফলাইন কোন মেহনতই কার্যকর না, একমাত্র এদের কাছে যাওয়া ছাড়া, তাদের বিরক্তি উৎপাদন করে ডেকে দীনের কথা শুনানো ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই শুনানোর। তাই এখন মাদরাসার চেয়ে বেশি প্রয়োজন সেই জিনিসের যেগুলো এই বেখেয়াল অংশটা ব্যবহার করে। দীনী স্কুল, দীনী

কলেজ, দীনী বিশ্ববিদ্যালয়ের। দীনী হাসপাতাল, দীনী গার্মেন্টস-ফ্যাক্টরির।

আপনি একটা প্রাইমারি স্কুল করেন, যেখানে সরকারি কারিকুলামের পাশাপাশি দুই-তিনটা ছোট বই থাকবে কুরআন-হাদিস-আকীদার। সেখানে শেখাবেন নাজেরা পড়া, ৫ বছরে কুরআন পড়িয়ে খতম দেওয়াতে হবে জরুরি না। ৫ বছরে আমপারাটা ঝরঝরা পড়া শিখে ফেলুক, ৪০ টা হাদিস শিখে ফেলুক, আকীদার মোটা মোটা কথাগুলো জেনে নিক, দৈনন্দিন কাজগুলোর সুন্নাত দুয়াগুলো মুখস্ত হয়ে যাক। একটা থাকুক হিফজ উইং, যারা আগ্রহী তাদের জন্য। গভর্নিং বডি আর শিক্ষকদের মাঝে থাকুক উলামায়ে কিরাম আর দীনদার মানুষ। দীনী প্রতিষ্ঠান থেকে শুধু আলেমই তৈরি করতে হবে, তা তো শর্ত না। দীনদার মানুষ তৈরির প্রতিষ্ঠানও কি দীনী খিদমাত না, আল্লাহর কাছে বদলা কম হয়ে যাবে, তাই কি? স্কুল বলে সবাই সন্তানকে দেবে। আরও যদি একবার পিএসসির রেজাল্ট ভালো দেখাতে পারেন, তাহলে বিখ্যাত হয়ে যাবে প্রতিষ্ঠান। আর আলিম উস্তাদগণ বাচ্চাদের হাতের লেখার এক্সট্রা কেয়ার নেন, ফলে রেজাল্ট ভালো করার একটা সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে। আচ্ছা, এবার উদাহরণ দিই। বখশিবাজারে ‘বীকন’স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল’ নামে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে দেখে আসতে পারেন। আমার কর্মস্থলে একটা মাদানী নেসাব মাদরাসা আছে প্রত্যন্ত গ্রামে। সেখানে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়ায় মাদরাসা কারিকুলামের সাথে, পরে সেখানকার প্রাইমারি স্কুলগুলোই বন্ধ হবার উপক্রম। এই নিয়ে দেনদরবার শেষে সিদ্ধান্ত হল, ছাত্রগুলো স্কুলেই পরীক্ষা দেবে, কেবল পড়াবে ঐ মাদ্রাসার উস্তাদরা। এছাড়াও আবু তাহের মিসবাহ সাহেব হুজুরের ‘নূরানী প্রাইমারি স্কুল’ নামে একটা কনসেপ্ট আছে, জেনে নিতে পারেন। কওমের অর্থায়নে মাদরাসা হতে পারলে স্কুল তো আরও বেশি হতে পারে।

একটা হাইস্কুল। যেখানে উস্তাদরা সবাই কমবেশি সুন্নাতের উপর আছেন। যুহরের নামায বাধ্যতামূলক (আইডিয়ালের মত)। ছাত্রদের

স্কুলড্রেস সুন্নাতী। আইডিয়ালের ড্রেস হল শার্টপ্যান্টের সাথে মাথায় টুপি। আমার ছোটভাই আইডিয়ালে পড়ত, ওদের আরবি শেখার একটা বই ছিল— লাম এ লাবানুন, খা তে খুবজুন, গাইনে গুরাবুন। দরকার নেই তা-ও, আপনার স্কুলে সরকারি কারিকুলামের বাইরে পাতলা পাতলা ৩ টা বই— মাসয়ালা, হাদিস, কুরআন। ৫ বছরে কেবল ৩০ তম পারার তাফসীরটা, আর শ’দুয়েক তারগীবী হাদিস, আর যা যা সরকারি ধর্মবইয়ে নেই। আর উস্তাদরা সুন্নাতের পাবন্দ হলে, তাদের আখলাক ছাত্রদেরকে প্রভাবিত করবে। সরকারি কারিকুলামে আকীদা/দীনবিরোধী কিছু থাকলে উস্তাদরা সেগুলোও সংশোধন করে পড়ালেন। জেএসসি, এসএসসির রেজাল্ট ভালোই হবে আশা করা যায়, কেননা উস্তাদেরা কোচিং-এর ধান্ধা করছেন না, হক আদায় করে কেয়ার নিচ্ছেন। খুলনায় এমন একটা প্রতিষ্ঠানের কথা শুনেছিলাম, ঢাকার বড়বাগে গাউছিয়া মসজিদের ইমাম সাহেবের শ্বশুর বা মামার এমন একটা স্কুল আছে, খুলনায় রেজাল্ট বেশ মশহুর। কওমের অর্থায়নে যদি মাদরাসাগুলো হতে পারে, এমন স্কুল কেন হতে পারে না।

আর মাদরাসাগুলোতেও ‘অনাবাসিক’ উইং চালু করা দরকার। দরকার ছিল আরও আগেই। যারা আলিম হবে তারা আবাসিক থেকে পড়বে। আর যারা আলিম হবে না, তারা অনাবাসিক ক্লাস করবে ক্লাস ফোর পর্যন্ত। ফাইভে গিয়ে স্কুলে রেজিস্ট্রেশান করে নিবে। মিনিমাম দীনী তালিমটা হয়ে গেল। দীনের দূর্গ থেকে শুধু আলিম-ই বের হবে না, বের হবে দীনদার আওয়াম-ও। প্লিজ বলবেন না যে, সবকিছু এতো সহজ না।

এমনি করে একটা কলেজ হতে পারে, একটা প্রাইভেট ভার্সিটিও হতে পারে। যা সমাজের ২য় অংশের চাহিদাও ভালোভাবেই মেটাবে, আবার দুনিয়ার মোড়কে গিলিয়েও দেবে দীন। দীনকে হিফাজতের সাথে দীনকে প্রদর্শনের এই প্রতিষ্ঠানগুলোও দীনী খিদমাত বলে আল্লাহর দরবারে কবুল হবে কি না? একটা হাসপাতাল চিন্তা করেন। যেমন খিদমাহ হাসপাতালে আমি নিজে চাকরি করেছি। পরিচালনা পর্ষদে সবাই তাবলীগের সাথী এবং উলামায়ে কিরাম। ডায়াগনোস্টিক অংশে নারী-পুরুষ আলাদা ব্যবস্থা। কেবল

অর্থোপেডিক (হাড়হাড্ডি) ছাড়া সব বিষয়ে নারী ডাক্তার। অপারেশান থিয়েটার আলাদা। ফ্লোর আলাদা, ওয়ার্ড আলাদা। বেসমেন্ট মসজিদে ৫ ওয়াক্ত সালাত হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী মসজিদের ১৫ মিনিট পর জামাত, কর্মচারীরা কেউ আগে কেউ পরে জামাতে সালাত পড়ছেন। পুরুষ ওয়ার্ডে ডিউটি ডাক্তার, নার্স-ও পুরুষ। আরেকটা হাসপাতাল আছে ‘আল-মুতমাইন্নাহ’, রাজারবাগ পীর সাহেবের। বিস্তারিত জানি না, আহলিয়াকে নিয়ে গিয়েছিলাম চোখ দেখাতে। ‘আদ-দীন’ হাসপাতালের অবস্থা পুরোটা না হলেও কাছাকাছি। এরকম আরো হাসপাতাল-ক্লিনিক হতে পারে কি না, ব্যক্তিগত বা কওমের অর্থায়নে, উলামায়ে কিরামের অংশগ্রহণে ও তত্ত্বাবধানে। শুধু মাদরাসা করাই দীনের খেদমত, এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, কারণ অলরেডি অনেক মাদরাসা হয়ে গেছে। আরো ব্যবহারিক আরও দীন-প্রদর্শনমূলক (Demonstrative) অবকাঠামোতে যাওয়া দরকার এখন। আবার আমাকে ‘মাদরাসাবিরোধী’ ট্যাগ মেরে দিয়েন না।

বিভিন্ন মসজিদের নিচে মার্কেট থাকে না? এরকম একটা মসজিদ-মার্কেট কমপ্লেক্স। কিংবা শুধু মার্কেট বা শপিং মল-ই হোক। শর্ত হল, দোকান যারা নেবে সবাই ১/২ মাসের একটা কোর্স করবে। ইসলামী ব্যবসা-র উপর। পুরুষ- নারী সেকশন আলাদা। এখন তো ফিক্সড প্রাইসের যুগ। পুরুষ-মহিলা আইটেম আলাদা করে সেলসম্যান আলাদা করে দেয়া কোন ব্যাপারই না। মনে রাখবেন, আমরা পুরোটা পারব না, কিন্তু মিনিমাম মিক্সিং তো করাই যায়। আল্লাহ তো দেখবেন আমাদের অন্তর। আলবৎ লাভজনক হবে, মেয়ে ক্রেতা আপনি বাঁধ দিয়েও আটকাতে পারবেন না। ভাল জিনিস, প্রতারণা নাই, মেয়েরা ইচ্ছেমত ঘুরে ফিরে কিনতে পারছে, দামাদামির ঝামেলা নাই, রিজনেবল প্রাইস। ইসলামী ব্যবসা কতটা সুন্দর দেখানো হবে।

একটা গার্মেন্টস। ফ্লোর আলাদা, সুপারভাইজারও নারী। হ্যাঁ, পুরুষ ভিজিটর বা বস ভিজিট করার সময় সবাই পর্দায় থাকবে। বাকি সময় ফ্রী হয়ে ইচ্ছেমত কাজ করবে। নারী-পুরুষ মিক্সিং কমিয়ে আনাটা উদ্দেশ্য।

নামাযের সময় নামায, কিছুটা কিতাবের তালিম/ ১০ মিনিট লেকচার, আবার কাজ। কাজ শেষে বের হবে আগে-পরে। হিম্মত করলেই আল্লাহ আরও সহজ করে দেন। সম্ভব না, এটা মনে করা যাবে না। যতটুকু সম্ভব আপনি ততটুকু করেন না। বাকিটুকুর জন্য তো জিজ্ঞাসিত হবেন না।

আমাদের একটা টেন্ডেন্সি আছে। কারও কিছু পয়সা হলে, যদি দীনী কোন খিদমাত করতে ইচ্ছে হয়, মসজিদ আর মাদরাসা। কাছে মসজিদ আছে তো কি হয়েছে, আমার একটা মসজিদ। মসজিদ-মাদরাসা তো সুস্পষ্ট দীনী খিদমাত নিঃসন্দেহে। কিন্তু উপরেরগুলোও কী দীনী খিদমাত নয়? এমন একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করালে আল্লাহ কি আমাকে বদলা কম দিবেন? দীনের হিফাজত ‘প্রচারে’। অ্যাটাকিং ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স। দীন টিকিয়ে রাখা অনেক হয়েছে, মাদরাসায় হোক গবেষণা, শুধু সংরক্ষণ না। আর এসব জেনারেল প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে হোক, এখানে হোক দীন প্রদর্শন। মনে রাখবেন, আলিম তৈরি করা ফরজে কিফায়া, আর ইলম অর্জন ফরজে আইন। মাআরেফুল কুরআনে আছে, যা ফরজ তার দাওয়াতও ফরজ। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলো উম্মাতের বৃহত্তর ২য় অংশটায় ব্যাপকভাবে দীনের প্রতি আগ্রহ তৈরি করবে নিঃসন্দেহে। আলিম তৈরি হোক, আরও বেশি তৈরি হোক দীনদার মানুষ। ইনশা-আল্লাহ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সমান বদলাই পাবেন।

মওলানার কথা শুনে সেদিন পছন্দ হয়নি আমার। নিজে আলিম হয়ে এগুলো কী বলে। আজ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি তাঁর কথার সত্যতা। কওমী সনদের সরকারি স্বীকৃতির অনেক পজেটিভ দিকের এটাও একটা। আলিমগণকে এখন ব্যাপকভাবে সবক্ষেত্রে অংশ নিতে হবে, পাওয়া যাবে। স্কুল-কলেজ-ব্যবসা- গভর্নিং বডি। তাদেরকে পেয়ে ২য় অংশটা দীন চিনে নেবে, দীনের প্রতি আগ্রহী হবে। তবে এজন্য একটা জিনিসই লক্ষ্য রাখতে হবে, থাকতে হবে খুব সতর্ক। তাঁরা যেন দীনটার আসল রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেন নিজেদের মাঝে, তাহলেই হবে। যেন ‘ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়’— এটা আবার হয়ে না যায়।

পাঠকদের মাঝে যারা মালওয়ালা আছেন , অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে দীনের খিদমাত করবেন ভাবছেন। কিংবা হাসপাতাল ব্যবসা করবেন ভাবছেন। বা শিল্পপতি / গার্মেন্টস মালিকদের সাথে উঠাবসা আছে , তাদের কাছে দীনের দাওয়াত নিয়ে যেতে পারেন। এমন সবার প্রতি আহবান -- 'দ্বিতীয় ভাবনার '।

সত্য বলতে লজ্জা নেই

SHAMSUL AREFIN SHAKTI·SUNDAY, DECEMBER 30, 2018

এই অংশটুকু শেয়ার করা জরুরি মনে করলাম। মরি কি বাঁচি ঠিক নেই। আর সবাই তো বইটা কিনবেনও না। দরকারও নেই এসব আজেবাজে বই কেনার। তাই এইটুকু শেয়ার করলাম বইমেলায় আসন্ন 'মানসাংক ও সমাধান ' বই থেকে ।

পুরুষ যেন নারীর প্রতি আকর্ষিত হয় , এভাবেই নারীকে সৃজন করা হয়েছে। নারীদেহের গড়নের প্রতি পুরুষের দুর্বলতা আছে। পুরুষের গড়নের প্রতিও নারীর দুর্বলতা আছে , এটা সিস্টেম। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে আপনাকে একটা মেয়ে আঁকতে দিলে আপনি শরীরের বাকি অংশের চেয়ে কোমর সরু করে আঁকবেন। বয়ঃসন্ধিকালে নারীর ডিম্বাশয় থেকে ইস্ট্রোজেন হরমোন বেরিয়ে পুরো দেহে নানান জায়গায় প্রভাব ফেলা শুরু করে। ফলে কন্ঠস্বর চিকন হয় , ত্বকের নিচে চর্বিস্তর জমে শরীর নরম -মোলায়েম হয়, ত্বক মসৃণ হয় , স্তন -নিতম্ব -উরুতে অতিরিক্ত চর্বি জমা হয়ে 'নারীসুলভ ' আকার (Feminine Contour) চলে আসে। এবং এই উঁচুনিচু জিওগ্রাফি পুরুষকে আকর্ষণ করে , তাদের কাছে ভালো লাগে।

গবেষকরা বলেছেন , চেহারার সৌন্দর্যের চেয়ে পুরুষ বেশি গুরুত্ব দেয় ফিগারকে। বিশেষ করে 'বালুঘড়ি 'র মত গড়ন (hourglass figures)। এবং এই অনুভূতি হতে পুরুষের মগজ সময় নেয় সেকেন্ডেরও কম সময়। মানে সেকেন্ডের কম সময়ে [৬] একজন পুরুষ একটা মেয়ের ফিগার দেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় , মেয়েটি আকর্ষণীয় কি না। তাদের মতে , মেয়েদের

নিতম্ব ও কোমরের অনুপাত (waist-to-hip ratio) ০.৭ হলে সেটা হল সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফিগার। এবং এই অনুপাত নারীর সুস্থতা ও উর্বরতার জন্যও ভাল। বিভিন্ন কালচারে এই অনুপাত ০ .৬-০.৮ এর মধ্যে [1]।

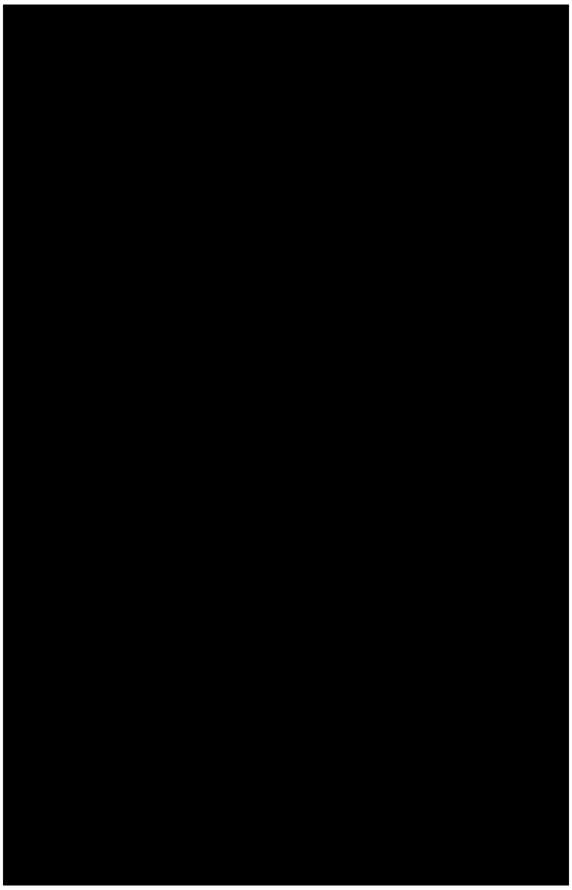

বালিঘড়ি

New Zealand-এর Victoria University of Wellington –এর অধীন School of Biological Sciences এর নৃতাত্ত্বিক Dr Barnaby Dixson এর নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণাটি প্রকাশিত হয় *Archives of Sexual Behaviour* -এর 2011 তে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় (শিরোনাম : Eye-tracking of men's preferences for waist-to-hip ratio and breast size of women.) [2]। একই নারীর ছবিতে বুক , কোমর ও নিতম্বের মাপকে বাড়িয়ে কমিয়ে ভলান্টিয়ারদের দেখানো হয়। ইনফ্রারেড ক্যামেরার দ্বারা তাদের চোখ কোথায় কতবার আটকাচ্ছে দেখা হয় (numbers of visual fixations), কতক্ষণ

কোথায় আটকে আছে তা দেখা হয় (dwell times), প্রথমবারেই কোথায় আটকাচ্ছে (initial fixations) তাও দেখা হয়। তারা পেলেন, সব পুরুষের চোখ প্রথমেই নারীর যে অঙ্গে আটকায় তা হল বুক আর কোমর। সবচেয়ে বেশি সময় আটকে থাকেও এই দুই জায়গায়। তবে বার বার তাকিয়েছে এবং বেশিক্ষণ ধরে তাকিয়েছে বুকের দিকে, কোমর-হিপের মাপ যাই হোক। আর মার্কিং করার সময় বেশি আকর্ষণীয় হিসেবে মার্ক দিয়েছে চিকন কোমর ও ‘বালুঘড়ি’ শেপের ফিগারকে, স্তনের মাপ যাই হোক। ডেইলিমেইল [3] ও টেলিগ্রাফ পত্রিকায়ও এসেছে গবেষণাটি [4]। তাহলে বুঝা গেল, পুরুষের সব আকর্ষণের কেন্দ্র তিনটা জায়গা [ঢ]। বয়সন্ধিকালে ইস্ট্রোজেন হরমোনের কারণে যে নারীসুলভ প্যাটার্নে চর্বি জমে (Female distribution of fat) তার ফলেই তৈরি হয় এই নারীসুলভ গড়ন। কেউ যদি অধিকাংশ পুরুষের দৃষ্টির উদ্দীপক হতে না চায়, অলক্ষ্যে থাকতে চায় তাহলে এমন পোশাক পরিধান করতে হবে যাতে এই টিপিক্যাল ‘বালিঘড়ি’ শেপ অস্পষ্ট হয়ে যায়, নারীদেহের উঁচুনিচু যেন বুঝা না যায়।

এবার ৭ জন মেয়েকে প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়। তাদের ওজন না কমিয়ে কেবল কোমরের চর্বি কেটে নিতম্বে লাগিয়ে দেয়া হয়, সুন্দর শেপ দেয়ার জন্য। এবার এই মেয়েগুলোর সার্জারির আগের ছবি আর সার্জারির পরের ছবি দেখানো হয় বছর পঁচিশেক বয়েসের ১৪ টা ছেলেকে। তাদের ব্রেইন স্ক্যান করে পাওয়া গেল কী জানেন? আমাদের ব্রেইনে ‘Reward Center’ নামে একটা কেন্দ্র আছে। দেখে নেন, ১ নং জায়গাটার নাম VTA (Ventral Tegmental Area), ২ নং জায়গাটার নাম (nucleus accumbens) , আর ৩ নং জায়গাটা হল ফ্রন্টাল কর্টেক্স যা আমাদের ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। এই তীর চিহ্নিত রাস্তার নাম ‘Dopamin Pathway’। এই জায়গাগুলোতে যে নার্ভকোষ থাকে তারা ‘ডোপামিন’ নামক

রিওয়ার্ড সেন্টার

নিউরোহরমোন ক্ষরণ করে ৩ নং জায়গায় উত্তেজনা তৈরি করে। আর ২ নং জায়গাটা আসক্তি সৃষ্টির জায়গা (highly sensitive to rewards and is the seat of addictive behavior)। আমাদের মগজ সব ধরনের আনন্দের অনুভূতি এভাবে তৈরি করে, সেটা বেতন-বোনাস-লটারী জেতাই হোক, যৌনমিলন হোক, কিংবা হোক নান্নার কাচ্চি, অথবা নেশাদ্রব্য [5]। তবে ড্রাগ এ এলাকায় ডোপামিনের বন্যা বইয়ে দেয়, ফলে এত আনন্দ হয় যেটা আসক্ত লোক আবার পেতে চায়। এভাবে নেশা বা আসক্তি হয় [6]। এই ১৪ টা ছেলের ব্রেইন স্ক্যান করে পাওয়া গেল, সার্জারি করার পরের ছবি দেখে (এবং কোমর নিতম্বের অনুপাত ০.৭ এর কাছাকাছি) ওদের এই এলাকাগুলো উত্তেজিত হচ্ছে। [ণ] সুতরাং, পর্নোগ্রাফি একটা নেশা। (প্রমাণিত)

আমেরিকার Georgia রাজ্যে Gwinnett College-এর Neuroscientist Steven M. Platek সাহেবের এই গবেষণা প্রকাশিত হয় PLoS One জার্নালে 5 ফেব্রুয়ারি, 2010 সংখ্যায় *Optimal waist-to-hip ratios in women activate neural reward centers in men* শিরোনামে [7]। তিনি *Livescience* ম্যাগাজিনকে বলেন, পর্নোআসক্তি এবং আসক্ত লোকের পর্নো ছাড়া যে erectile dysfunction (উত্থানরহিত) হয় তার একটা ক্লু হতে পারে এই গবেষণাটি [8]।

আমরা দেখলাম, নারীর ফিগার দেখাটা নেশার মত, স্রেফ দেখাটাই [ড+ণ]। সেক্স উত্তেজিত করবে Reward Center-কে এটা তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু স্রেফ দেখাটাও একজন পুরুষে ড্রাগের মত অনুভূতি তৈরি করছে, বিষয়টা একটু লোমহর্ষক না? এবং কারো ফিগার মূল্যায়ন হয়ে এই অনুভূতি তৈরি হতে সময় নিচ্ছে সেকেন্ডেরও কম সময়, এমন না যে একটানা তাকিয়ে দেখার পর এমন হচ্ছে। এবার এর সাথে আপনি মিলিয়ে নিন [ট] University of Arizona-র প্রফেসর Mary P. Koss- এর কথাটা, ধর্ষণ ব্যাপারটা অনেকটা মাত্রা-নির্ভর (Dose).[9] তাহলে আমাদের এই ফিটিং ফ্যাশন, স্বচ্ছ ওড়না, ফিতাওয়ালা বোরকা, উরুর অবয়ব প্রকাশ করে দেয়া লেগিংস কী এক ফোঁটাও দায়ী নয়? একটুও দায়ী নয়? এখন আপনিই হিসেব করুন, আপনি কতজনের কত নম্বর ডোজ হয়েছেন? আপনি কতজনের নেশাদ্রব্য হয়েছেন এ যাবত? আপনার Optimal waist-to-hip ratio কত অগণিত পুরুষের neural reward center-কে ডোপামিনে ভাসিয়েছে? ভিকটিমের পোশাক হয়ত সরাসরি দায়ী নয়, তবে আর যে হাজার হাজার নারী ধর্ষকটার সামনে দিয়ে হেঁটেছে বেসামালভাবে, তাদের ফিটিং স্বচ্ছ পোশাকের দায়, প্রকাশমান দেহাবয়বের দায় তো এড়ানো যাবে না। গবেষণাগুলোর ইঙ্গিত তো তাই বলছে, না কি?

আমরা এই পর্যায়ে একটু জেনে নেব, আমরা কীভাবে দেখি। যেমন ধরেন, একটা লাল আপেল। ঘরটা অন্ধকার, আপেলের উপর কোন আলো পড়ছে না, তাই অন্ধকার ঘরে আপনি আপেলটা দেখতে পাচ্ছেন না। এবার লাইট জ্বালালেন। ঝলমল করে উঠল ঘর। আলোর কিছুটা আপেলের উপরও পড়ল। আপনারা হয়ত জেনে থাকবেন, সাদা আলো আসলে সাদা না, ৭ রঙা আলোর মিশেল।

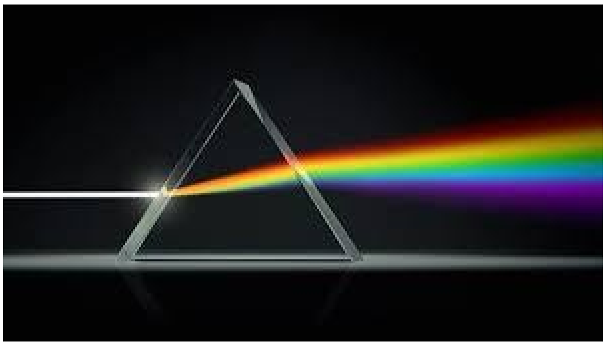

সাত রঙ

বেনীআসহকলা- বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল। এই ৭ রঙ মিলেমিশে হয় সাদা রঙের আলো। এই লাল আপেলে যখন আলোটা পড়ল, আপেলটা সবগুলো রঙকে শুষে নিল, শুধু লাল আলোটাকে ফিরিয়ে দিল, প্রতিফলন করে দিল। এই ফিরিয়ে দেয়া লাল আলোটুকু আপনার চোখের মণির ভিতর দিয়ে চলে গেল চোখের পিছনে। সেখানে কিছু স্পেশাল কোষ আছে যারা আলো পড়লে বিদ্যুত তৈরি করে। লাল আলো গিয়ে ওদেরকে উত্তেজিত করল, তারা বিদ্যুত তৈরি করে মাথার পিছনে পাঠাল। আর আপনার আপেলাকারের লাল কিছু একটা দেখার অনুভূতি হল। বিঃদ্রঃ কালো কিন্তু কোন আলো না, কোন রঙের আলো না থাকলে কালো দেখা যায়। কালো জিনিস সব রঙকে শুষে নেয়। তাই কালো দেখায়।

আপনি আপেলটা দেখছেন, আপেলের পাশে জগ-গ্লাস-অন্যান্য জিনিসও আপনি দেখছেন, কিন্তু আপেলটাকে বাকিগুলোর চেয়ে একটু বেশি দেখছেন। মানে আপেলের আলোগুলো গিয়ে জায়গামত পড়েছে, ঐ বিন্দুতে। ব্যাপারটা এমন—

ফোকাস ননফোকাস

আর সামনে তাকালে আপনি পাশের অনেককিছুও দেখেন কিন্তু। ফোকাস ছাড়া বাকি যতদূর মাথা স্থির রেখে আপনার নজরে আসে, পুরোটাকে বলে দৃষ্টিক্ষেত্র বা Visual Field. এই ফিল্ডে যা থাকবে, সব আপনার নজরে আছে, ফিল্ডের বাইরে আমরা দেখি না।

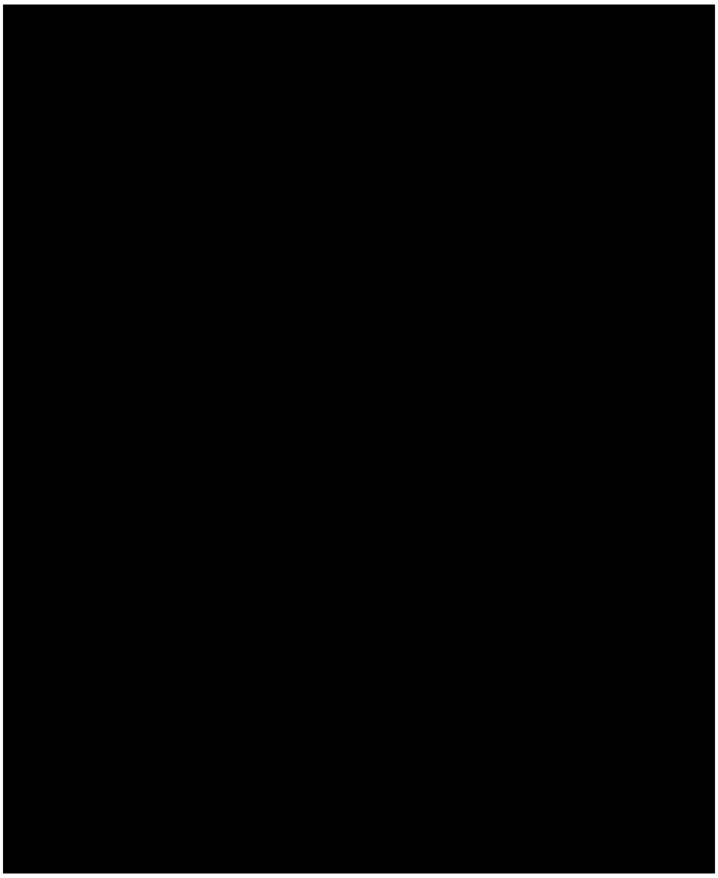

ভিজুয়াল ফিল্ড

সাধারণত কোন একটা জিনিস ফোকাস করলে আমরা আরেকটা ফোকাসে যাই যখন আমাদের ভিজুয়াল ফিল্ডে কোন কিছু আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। যেমন ফিল্ডের মধ্যে কোনকিছু নড়ে উঠল [ত] বা উজ্জ্বল হয়ে উঠল [থ], তখন আমরা আগের ফোকাস চেঞ্জ করে ঐ আন্দোলিত বা উজ্জ্বল বস্তুকে ফোকাস করি। নিজে নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন।

উদ্দীপকের সমাধান ১:

রাস্তায় যে হাজারো পুরুষ ঘুরে বেড়ায়, তাদের প্রত্যেকের ইউনিক মনোজগতকে জানা এমনকি অনুমান করাও অসম্ভব। আলোচনার আগে আমি আপনাদের স্মরণ করার অনুরোধ করছি ‘সিম্বোলিজম’ অধ্যায়টা। কত কিছু

আমাদের যৌন-উদ্দীপনার কেন্দ্র হতে পারে। প্রয়োজনে আরেকবার পড়ে নেয়া যেতে পারে। একটা মেয়ের শরীরের প্রতিটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদাভাবে ও সামষ্টিকভাবে সিম্বলিক হতে পারে। আপনার কলিগ বা সহপাঠীদের মাঝে এমন কেউ আছে কি না যে আপনার হাতের সৌন্দর্য নিয়ে ফ্যান্টাসিতে আছে, তা আপনি আসলেই জানেন না। কেউ চুল নিয়ে, কেউ চোখ নিয়ে, বা কেউ পুরো আপনাকেই নিয়েই অন্ধকুঠূরিতে কোন পর্যায়ে আছে, তা জানার কোন উপায়ই নেই। তাই আপনি যদি যেকোন মানসিকতার পুরুষের কাছে উদ্দীপক না হতে চান তাহলে সর্বপ্রথম [ঢ] পুরুষের আকর্ষণের কেন্দ্রীয় তিন অংশ আপনাকে ঢেকে ফেলতে হবে, ‘বালিঘড়ি’ শেপকে ও waist-to-hip ratio-কে অস্পষ্ট করে দিতে হবে। এমন একটা পোষাক গায়ে চড়াতে হবে যাতে কোন উঁচুনিচু বুঝা না যায়। কুরআন আমাদের তা-ই জানাচ্ছে:

হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আল আহযাব: ৫৯)

বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি কে নত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের মাথার কাপড় দ্বারা বক্ষস্থল আবৃত রাখে। এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগন, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (নূরঃ ৩১)

এখন আপনি কেমন আবরণ দ্বারা নিজেকে আবৃত করবেন। আচ্ছাদন কেমন হলে তা আপনাকে উদ্দীপকের ভূমিকা নেয়া থেকে সুরক্ষা দেবে। এখন আমরা যে আলোচনায় যাচ্ছি, এর সাথে ফিকহের কোন সম্পর্ক নেই। এই আলোচনা গ্রহণ বা বর্জন আপনার নিজের ইচ্ছে। ইসলাম আমাদের নিচের সিদ্ধান্তের অনেক কিছুরই অনুমোদন দেয়, নিষেধ করে না। আমরা আমাদের এতক্ষণের

বৈজ্ঞানিক আলোচনার রেশ ধরে যে ফলাফলে পৌঁছবো সেগুলোর সবই অননুমোদিত তা কিন্তু নয়। আমরা আমাদের আলোচনা যেখানে আমাদের নিয়ে যায় সেখানে চলে যাব।

১. বোরকা অনুজ্জ্বল রঙের হবে। কালো বেস্ট। কারণ কালো রঙ আলোর পুরোটুকু শুষে নেয়। তাই কালো বস্তু থেকে দর্শকের চোখে আলো আসে না। নজর কাড়ে না। কালো না হলেও কালো জাতীয় (নেভী ব্লু, ধূসর)। মোটকথা ম্যাদামারা রঙের হওয়া চাই। উজ্জ্বল রঙ হলুদ-লাল-নীল-গোলাপী রঙ ভিজুয়াল ফিল্ডে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। এমন রঙের বোরকা ‘বোরকার উদ্দেশ্য’ পূরণ করে না। [ত]

২. প্রচলিত বোরকার কাপড় একটা আছে সিল্কের মত চকচকে। কালো হলেও চকচকে জিনিস আলো প্রতিফলন করে। তাই, ভিজুয়াল ফিল্ডে যেকোন চকচকে বস্তু নজর কাড়ে। এমন কাপড়ের বোরকায়ও উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। [ত]

৩. একটা কাপড়ের নাম বিএমডব্লিউ, হালে বেশ জনপ্রিয়। এই কাপড়ের সমস্যা হল বেশি আন্দোলিত হয়। ভিজুয়াল ফিল্ডে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি নড়াচড়ার দিকে দৃষ্টি চলে যায়। ফলে উদ্দীপকতা কমাতে বা নিজেকে দৃষ্টির অলক্ষ্যে রাখতে এজাতীয় বোরকাও অনুপযোগী। [থ]

৪. বোরকার উদ্দেশ্য হল, আপনার নিচের সুন্দর পোশাক, যেটা আপনার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিচ্ছে বহুগুণে- সেটা ঢাকা। যাতে আপনি কারো দৃষ্টি আকর্ষক না হন। যেহেতু কে আপনাকে দেখে কি ভাবছে, কী ডোজ নিচ্ছে, কী কল্পনা করছে আপনি জানেন না। ডিজাইনওয়ালা আর নানান ফ্যাশনেবল বোরকা তো সেই সৌন্দর্য্যবর্ধকই হয়ে গেল। তাহলে শুধু শুধু ডবল পোশাক পরে কী লাভ হল? কেউ যদি আপনাকে বলে- বাহ এই বোরকায় তো তোমাকে দারুণ মানিয়েছে। বা, চমৎকার লাগছে তোমাকে। তাহলে সেই বোরকা পরা অনর্থক। কারণ আপনি তো সুন্দর লাগার জন্য বোরকা পরছেন না, বরং সৌন্দর্য্য ঢাকার জন্যই সেটা পরার কথা।

৫. অর্ধসচ্ছ শিফন/জর্জেট জাতীয় কাপড়ের বোরকা পরার চেয়ে না পরাই তো ভাল। শুধু শুধু গরমে দুই স্তর সিনথেটিক কাপড় পরার কী দরকার। পর্দার উদ্দেশ্যও পুরা হল না, আবার গরমে কষ্টও হল। আর মানুষের স্বভাব হল কৌতূহল। যা স্পষ্ট দেখা যায়, তার চেয়ে যা আবছা দেখা যায়, তার প্রতি কৌতূহল বেশি কাজ করে। ফলে অর্ধস্বচ্ছ বোরকা আপনাকে আরও বেশি নজর আহ্বানকারী করে তুলবে।

৬. বোরকার কোমরের কাছে ফিতা যদি বেঁধে নেন, তবে বোরকা পরার উদ্দেশ্য ব্যাহত হল। বোরকার উদ্দেশ্য ছিল আপনার দেহকাঠামোকে অস্পষ্ট করে দেয়া। ফিতা বেঁধে কোমরের মাপকে প্রকাশ করে সেই গড়নকে আপনি স্পষ্ট করে দিলেন।

৭. হাল আমলের বোরকার ফ্যাশন হল ঘের অনেক বেশি রাখে গাউনের মত। সেদিন এক ফেসবুক পেইজ যারা দাবি করে যে তারা শারঈ বোরকা বিক্রি করেন। দেখলাম লিখেছে, “ঘের অনেক বেশি...You will feel like a princess”। মানে হল, রাজকন্যারা যেমন গাউন পরে সেরকম। বেশ, নিজেকে নিজে রাজকন্যা মনে হলে তো সমস্যা নেই। কিন্তু রাস্তার লোকে রাজকন্যা মনে করে চেয়ে থাকলে তো সমস্যা। পর্দার উদ্দেশ্য পুরা হল না। আর অতিরিক্ত কাপড় থাকলে তা হাঁটার সময় আন্দোলিত হবে বেশি [থ], ফলে ফোকাস টানবে বেশি।

৮. আর একটা ফেব্রিক সম্পর্কে বলে আমাদের এই আলোচনা শেষ করব, যেটা এখন ব্যাপক জনপ্রিয়। লন কাপড় পরতে আরামদায়ক হলেও শরীরের সাথে লেপ্টে থাকে বেশি। ফলে বাইরে থেকে শরীরের অবয়ব স্পষ্ট ফুটে ওঠে। যদিও আপনার পোশাকটা ফিটিং না, বা স্বচ্ছ না। আপনি ভাবছেন সব তো ঢাকাই, আসলে কাপড় লেপ্টে থেকে সব অবয়ব বুঝিয়ে দিচ্ছে।

আবু ইয়াযীদ মুযানী রাহ. বলেন, হযরত ওমর রা. মহিলাদেরকে কাবাতী (মিসরে প্রস্ত্ততকৃত এক ধরনের সাদা কাপড়) পরতে নিষেধ করতেন। লোকেরা বলল, এই কাপড়ে তো

ত্বক দেখা যায় না। তিনি বললেন, ত্বক দেখা না গেলেও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুটে ওঠে।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস: ২৫২৮৮

তাহলে কেমন বোরকা পরলে উদ্দীপক হিসেবে আমার ভূমিকা মিনিমাম হবে?

১. নিকাবসহ কালো বা কালো জাতীয় রঙের

২. সুতি ধরনের কাপড় যা অতিরিক্ত দুলবে না, লেপ্টে থাকবে না। বরং কিছুটা ফুলে থাকবে, বডি শেপকে অস্পষ্ট করে দেবে। কাপড় সুতি হলে সিনথেটিক এসব কাপড়ের চেয়ে আরামও পাবেন বেশি। আরেকটা ব্যাপার আছে। সুতি কাপড় ইস্ত্রি নষ্ট হয়ে পরিপাটিভাব থাকে না, ফলে আপনার দিকে কেউ লক্ষ্যই করবে না, চোখ পড়লেও অনীহাভরে সরিয়ে নেবে। বোরকা পরার মূল উদ্দেশ্য সবচেয়ে সুন্দরভাবে পূরণ হবে।

[চলবে ইনশাআল্লাহ, বইয়ে বিস্তারিত থাকছে]

রেফারেন্সঃ

[1] চীনে ও তানজানিয়ায় ০.৬, ইন্ডিয়ান ও ককেশীয় আমেরিকানদের ০.৭ ও ক্যামেরুনে ০.৮ পাওয়া গেছে।

Dixson, A.F. (2012) Primate Sexuality: Comparative Studies of the Prosimians, Monkeys, Apes and Human Beings (Second Edition). Oxford: Oxford University Press. এর বরাতে
https://www.psychologytoday.com/us/blog/how-we-do-it/201507/waists-hips-and-the-sexy-hourglass-shape

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19688590

[3] https://www.dailymail.co.uk/femail/article-1306012/Beauty-summed-To-tell-womans-really-attractive-figures.html

[4] https://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/7965211/Women-with-hourglass-figures-and-perfect-waists-most-attractive-study-finds.html

[5] Harvard Mental Health Letter, *How addiction hijacks the brain*

https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/how-addiction-hijacks-the-brain

[6] *The Brain on Drugs: From Reward to Addiction*, Nora D.Volkow [illegible] Marisela Morales, National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892, USA [illegible] *Cell* (Volume 162, Issue 4, 13 August 2015, Pages 712-725)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867415009629

[7] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20140088

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2918777/ (*Curvaceous female bodies activate neural reward centers in men*)

[8] https://www.livescience.com/9834-hourglass-figures-affect-men-brains-drug.html

[9] https://www.nytimes.com/2017/10/30/health/men-rape-sexual-assault.html

[illegible]

SHAMSUL AREFIN SHAKTI·WEDNESDAY, JANUARY 2, 2019

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে লাগিয়েছিলেন। কত দেশের কত নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচয়। একেকটা মানুষ মনে হয় একেকটা কিতাব, কয়েকখণ্ডে সমাপ্ত। একজন মানুষের ভিতরেই কত কিছু জানার, কত কিছু শেখার। আপনি বই পড়ে একটা হাদিস শিখতে পারেন, কিছু মাসয়ালা শিখে নিতে পারেন। কিন্তু কিছু জিনিস আপনাকে কেউ শিখাতে পারে না, দুনিয়ার কেউ বলতে পারবে না আমি এসব শিখাতে পারি। তাকওয়া কিভাবে করে, তাওয়াক্কুল কীভাবে করতে হয়, শোকর-সবর, বিনয়, নামাযের ধ্যান, আমলে লেগে থাকা— এগুলো কোন কিতাব শিখাতে পারে না। এসব আল্লাহ তাআলা খোদ শিখান। হার্ডওয়্যার দোকানে পাবেন, কিন্তু সফটওয়্যার উপর থেকে ডাউনলোড করতে হয়। এজন্য আত্মশুদ্ধির একটা মাধ্যম হল— ‘কুনু মাআস সদিক্বীন’, নেককার লোকদের সোহবত। তাবলীগের মাধ্যমে পরিচিত এই শত শত মানুষের কেউ আমার তাকওয়ার শিক্ষক, কাউকে দেখে শিখেছি তাওয়াক্কুল কাকে বলে, কেউ আমাকে শিখিয়েছে ‘রিদ্বা- শোকর-সবর’ কাহাকে বলে, কত প্রকার ও কি কি। কারো বিনয় দেখে নিজেরও ইচ্ছে হয়েছে এমন বিনীত আর সরল যদি হতাম। কারো নামায আমাকে নতুন করে ভাবিয়েছে ধ্যান কী জিনিস। এক সাথী মাঝরাতে প্রতিদিন একই সময় উঠে কাঁদত, একই সময় টানা ৪০ দিন, কীভাবে পারো ম্যান। আল্লাহর শুকরিয়া যে আল্লাহ আমাকে এসব লোক দেখিয়েছেন।

দাওয়াতের হিকমাহও একটা শেখার জিনিস। কিশোরগঞ্জ সফরে আমির সাহেব সাজ্জাদ ভাই, বন্ধু মানুষ। যেকোন মুরুব্বি বয়েসী কারো কাছে গাশতে (দাওয়াতে) গেলে সালাম মুসাফাহা দাওয়াতী কথাবার্তার পর বা আগেই বা মাঝে কোন মওকায় মুরুব্বির হাতটা নিয়ে নিজের মাথায় রেখে বলতো, চাচা, আমার জন্য দুআ করবেন। মুরব্বি ঠিক ঠিক সাজ্জাদ ভাইকে আবার দেখতে পরের কোন ওয়াক্তে মসজিদে চলে আসত, অন্তর গলে যেত। এই সামান্য ‘হাত মাথায় নেয়া’ও শিখার চীজ? শাইখ ইলিয়াস রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, আমার এই মেহনত ‘খুবিয়োঁ কা লেনদেন হ্যাঁয়’, গুণের আদানপ্রদান। প্রতিটি মানুষের মাঝে গুণ তালাশ করলে ঐ গুণ আমারও পেতে ইচ্ছে হবে। আর দোষ খোঁজার পিছনে পড়লে ঐ দোষ আমার ভিতরেও এসে

যাবে। এজন্য জ্ঞানের অন্যতম এক মাধ্যম হল— সফর। সালাফগণ জ্ঞানের জন্য সফর করাকে সাধারণ আমল হিসেবে নিয়েছিলেন। ভূমিকা শেষ, এবার আসল কথা পাড়ি।

সন্তানের শিক্ষার তো অনেক ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দীক্ষাটা হবে কীভাবে? শিক্ষা দেবার জন্য অনেকে আছে। কিন্তু দীক্ষার জন্য আসলেই আপনি ছাড়া আর কেউ নেই, খেয়াল করে দেখেন। আমার এক আত্মীয় তার ৪ বছরের বাচ্চা নিয়ে খুব চিন্তিত, কোন স্কুলে দেবে, কোন কিন্ডারগার্টেন ভাল, ইত্যাদি। তো তাকে বললাম, ভাই, আপনার বাচ্চা এই যে কিন্ডারগার্টেনে ঢুকবে, হোমওয়ার্কে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আর এই ব্যস্ততা থেকে সে অবসর হবে যখন তার বয়েস হবে ৫৯, রিটায়ারমেন্টের সময়। এর মাঝে আর অবসর নেই। সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হল, যা তার বাবা তাকে দেয়। এখন স্কুলে না দিয়ে আপনি নিজে তাকে সময় দেন, নিজে শেখান। স্কুল তাকে ঐ জিনিস শেখাবে না যা আপনি তাকে শেখাবেন। আর যা তাকে আপনি এখন শেখাবেন সেটাই সে সারাজীবন লালন করবে, সেটাই তার ব্যক্তিত্ব গঠন করবে, সেটাই হবে ‘সে’। তাই এই সময় তাকে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে না দিয়ে আপনি তাকে শেখান। একই উপদেশ দিয়েছি আরেক আত্মীয়কে, সে গল্প করতে এসেছিল যে, তার ক্লাস ২ এর ছেলেকে পড়ানোর জন্য ম্যালা ট্যাকা দিয়ে বুয়েটের স্টুডেন্টকে রাখা হয়েছে। চান্সে তাকেও কিছু ফ্রী কনসাল্টেশান দিয়েছি, মিঞা নিজে সময় দেন, নিজে শেখান। প্লিজ বইলেন না, সময় পাইনা। আপনি সময় না পাওয়ার অর্থ হল, আপনার প্রায়োরিটি লিস্টে এটা নেই। ‘সন্তানকে সময় দেয়া’-কে প্রায়োরিটি দিবেন না, আবার বুড়াকালে অভিযোগ করবেন— আমার ছেলে আমাকে সময় দেয় না, বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এসেছে। এগুলো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড।

জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিজের সন্তানকে শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া এক ‘সা’ পরিমাণ বস্তু দান-খাইরাত করার চেয়েও উত্তম।

আইউব রহঃ আপন পিতা থেকে, তিনি আপন দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন পিতা আপন সন্তানদেরকে উত্তম শিক্ষা ও আদব দান করার চেয়ে উত্তম কোন উপহার দেয়নি।

১৫ দিনের জামাতে টাঙ্গাইলে ছিলাম। মহিলারা কোন পর্দাঘেরা বাসায়, আর পুরুষগুলো মসজিদে। যে ঘর দেয়, সে সহ ঐ ঘরের সব বালেগ পুরুষ থাকবে মসজিদে। পুরুষরা মহল্লায় দাওয়াত দিয়ে সব পুরুষকে বলবে যেন ঐ বাসায় তাদের মহিলাদের পাঠায়। মহল্লার সব মহিলাদের আনাগোনায় ভরে ওঠে ঐ বাসাটা, আর জামাতের মহিলারা দাওয়াত, মেহমানদারির আমল করেন উনাদের উপর। উনারা নিজ চোখে দেখে নেন দীনী জীবন, দীনী আচরণ, দীন মানার চেষ্টা কেমন করে করছে মানুষ। দেখে নিজেদের মধ্যে দীনপালনের আগ্রহ আসে। প্রতি বাসায় ২ দিন করে থাকা হয়। তো এই পনের দিনে ৮ টা পরিবারের সাথে সময় দেয়া হলো। একেক পরিবার থেকে কত কিছু শেখার। কোন পরিবারে বাচ্চাকে কীভাবে মানুষ করছে, এগুলোও আল্লাহ দেখিয়েছেন।

পল্লবীতে এক বাসায় ৫ বছরের মারইয়াম কোন পুরুষের সামনে আসবে না। শুধু মা যার যার সামনে যায়, সে-ও তার তার সামনে যায়। আমার ছোটবোন তাকে টেনে হিঁচড়ে আমার সামনে আনার চেষ্টা করছে। আর সে বলছে, ‘ছেলেদের সামনে যেতে হয় না, যেতে হয় না’। বাচ্চাদের শেখাই হোক আর এডাল্ট লার্নিং-ই হোক, দেখে আমরা যা শিখি বা মনে রাখি, শুনে বা পড়ে তা শেখা দুষ্কর। হাদিসেও তো নফল নামায ঘরে পড়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে, বাচ্চারা দেখে শিখবে। আমার খাদীজা ১ বছর বয়েসে দেখতাম সিজদা করে, বুকে হাত বেঁধে মুখ বিড়বিড় করে। মাকে দেখে দেখে শিখেছে। তারপর কোন আকাম করার পর, যেমন ঘরে পানি ফেলেছে বা ইত্যাদি, মাথায় হাত দিয়ে ‘আল্লাহ’ ‘আল্লাহ’ করে মাকে ডাকতে যেত, পুতুল কোলে নিয়ে আল্লাহ আল্লাহ বলে ঘুম পাড়াতো। এখন অবশ্য এসব আর

করে না। শিশুরা ভয়ংকর রকম অনুকরণপ্রিয়। আপনি যা করবেন ও তাই শিখবে। তাই সর্বপ্রথম বাবাকে, আরও বেশি মা-কে সুন্নাতের পাবন্দ হতে হবে। ডান হাতে খাওয়া, বাম পায়ের জুতো আগে খোলা, ডান কাতে ঘুমানো এসব ও আপনাকে দেখেই শিখবে। আপনাকে দেখে দেখেই সুন্নাতের গুরুত্ব আর ভালোবাসা, সেই সাথে অভ্যাস এসে যাবে ওর ছোট্ট মনে।

তাবলীগের মুরুব্বি ইঞ্জিনিয়ার হাজী আবদুল মুক্বিত রাহিমাহুল্লাহর একটা ঘটনা শুনেছিলাম। উনার সদ্যপ্রসূত নাতনীকে একটা পাতলা সাদা কাপড়ে ঢাকা দেখে একজন জিগ্যেস করল, হুজুর, এত ছোট বাচ্চা ঢেকে রেখেছেন গরমে। উনি বললেন, একটা ছোট বাচ্চার তো তাই আছে যা একজন বড় মানুষের থাকে। তারও সতর আছে। ছোট থেকেই বাচ্চাদের হাফপ্যান্ট ইত্যাদি পরানো অনুচিত। বরং ছোট থেকেই সুন্নাতী পোশাকে অভ্যস্ত করানো চাই। এক সাথীর ৩ বছরের ছেলে বাচ্চা হুটোপুটি করতে গিয়ে আমার সামনেই উরুতে মারাত্মক ব্যাথা পেল। আমি এতো দেখতে চাইলাম উরুতে কেটে ছড়ে গেছে কি না, পায়জামা উঠাতেই দিলো না। বাপ বলল, হাঁটুর উপরে কাপড় উঠাতে লজ্জা পায়। সুন্নাতকে যেন আপন, আর অন্যান্য তরিকাকে যেন পর মনে করা শেখে। ইউরোপীয় কাটিং-এর পোশাককে যেন ‘অস্বস্তিকর’ মনে করতে শেখে। আমার ভায়রার ৪ বছরের মেয়েটা, আমি খালু হই, আমার কোলেও আসে না। শুধু বাপ-মা-খালা-চাচা ছাড়া কারো কোলে যাবে না। একবার এক দারওয়ান তাড়াতাড়ির মধ্যে কোলে করে বাসায় উঠিয়ে দিয়েছিল বলে কী রাগ। আমার সামনে আসবে, কিন্তু উঁহু, কোলে নেয়া যাবে না।

বাসায় প্রতিদিন কিছু সময় সম্মিলিত তা’লিম করবেন। উমার রা. তাঁর বোনের তালিমের হালাকায় গিয়েই হিদায়াত পেয়েছিলেন। বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব, বোনাই সাঈদ রা. আর উস্তাদ খাব্বাব ইবনে আরাত রা. কুরআনের তা’লিম করছিলেন। রোজানা বাসায় আধঘণ্টা বা সুবিধামত তা’লিম করা দরকার। সব হাদিসের কিতাব তা’লিমের জন্য উপযুক্ত না। আদাবুল মুফরাদ, রিয়াদুস সালিহীন, মুন্তাখাব হাদিস, বা আলিমগণের

পরামর্শমত অন্য কোন কিতাব থেকে চ্যাপ্টার ধরে ধরে দুটো-একটা করে হাদিস পড়লে আনন্দের সাথে মনোযোগ ধরে রাখা যাবে। বিরক্তি না আসে যাতে, যেহেতু প্রতিদিন করা হবে। এজন্য লাভ-ফযীলত বেশি থাকলে মজা পাওয়া যাবে। এসব হালাকায় বাচ্চাদের নিয়ে বসতে হবে, এমনকি দুধের শিশুও। কেননা এসব দীনী হালাকায় সাকিনাহ নামক বিশেষ রহমত নাযিল হয়, যা থেকে বাচ্চাও যাতে বঞ্চিত না হয়। শাইখ উমায়ের কোব্বাদি হাফিজাহুল্লাহ বলেছিলেন, বাসায় দৈনন্দিন যিকির-আযকারের সময় একটু উচ্চৈঃস্বরে জিকির করবেন মাঝে মধ্যে, বাচ্চারা মজা পাবে, জিকিরের আগ্রহ পাবে, তারও অভ্যাস গড়ে উঠবে।

বাচ্চাকে কাছে নিয়ে খেলাচ্ছলে তার আকীদা গড়ে তুলতে হবে। তুমি কে? আমি কে? আল্লাহ কে? রাসূল কে? খাওয়ায় কে? পালন করে কে? এক জামাতের আমীর সাহেব ছিলেন, তাকে দেখতাম বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে মসজিদে আসা শিশুদেরকে দাওয়াত দিতেন। তোমার এই জামাটা কে দিয়েছে? বাচ্চা মানুষ; বলল, আব্বা কিনে দিয়েছে। তখন তিনি তাকে বাচ্চা বাচ্চা ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন, না, তোমার আব্বা তো কিনে এনেছে, কিন্তু দোকান পর্যন্ত এনে দিয়েছেন আল্লাহ। আম্মা খাওয়াননি তোমাকে, আম্মা তো তাই রেঁধেছেন, যা আল্লাহ পাঠিয়েছেন। আমরা দাওয়াত দেবার জন্য বড় মানুষ খুঁজতাম, আর উনি দেখতাম বাচ্চাদের নিয়ে ঈমানী হালাকা দিচ্ছেন।

একজন সালাফের শৈশব খুব আলোচনায় আসত বার বার। আমি কোন এক বইয়ে সেই সালাফের নামও পড়েছি, এখন মনে করতে পারছি না। ছোটবেলায় ঘরে এসে যখন খাবার চাইতেন, মা বলতেন, খাওয়ান তো আল্লাহ; তুমি দুই রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে চাও। ছেলে নামাযে দাঁড়াত, আর মা খানা গুছিয়ে দিতেন। ছেলে এসে দেখত খানা রেডি। এভাবে প্রতিদিন ছেলে মক্তব থেকে এসে দু’রাকাত পড়ত, খানা পেত। একদিন মা কাজের ডামাডোলে ঠিকসময়ে এসে পৌঁছতে পারলেন না। মা পেরেশান হয়ে গেলেন, আজ আমার সন্তানের ইয়াকীন নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন, ইয়া

আল্লাহ, আমি ছোটবেলা থেকে আপনার প্রতি আমার ছেলের ইয়াকীন তৈরি করেছি। আজ আপনিই তার ঈমানের হেফাজত করুন। বাড়ি এসে জিগ্যেস করলেন, বেটা খানা খেয়েছো? ছেলে জবাব দিল, আম্মা, আজকের খানা তো এতো সুস্বাদু ছিল যে এত স্বাদের খানা আমি কোনোদিন খাইনি।

শাইখ আবদুল কাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর ঘটনাটাও খুব আলোচনা হত। বাগদাদে পড়তে যাবার সময় কাফেলা লুট হল। শিশু জামার ভিতরে সেলাই করা গোপন পকেট থেকে দিনার বের করে দিয়ে দিল। ডাকাত বলল, তুমি কেন দিলে, আমরা তো খুঁজে পেতাম না। তিনি বললেন, আমার মা আমাকে মিথ্যে বলতে নিষেধ করেছেন। তোমরা না জানলেও আল্লাহ তো জানবেন যে আমি মিথ্যে বলেছি। ছোটবাচ্চার এই তাকওয়া দেখে ডাকাতদল তাওবা করল। আকীদা শেখানোর জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ হাদিসটাকে সামনে রাখতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন নাবালক চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে আকীদা শেখাচ্ছেন: [1]

- হে বালক, আল্লাহকে হেফাজত কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন।

- আল্লাহকে হেফাজত কর, তাহলে তাঁকে তোমার সাথেই পাবে।

- স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে চিনো, তাহলে বিপদের সময় তিনি তোমাকে চিনবেন।

- যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে।

- যখন সাহায্য লাগবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে।

- যা যা ঘটবে, তা লেখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে।

- সমগ্র সৃষ্টিজগত যদি একত্র হয়ে তোমার এমন কোন উপকার করতে চায়, যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তাহলে তারা তা করতে সমর্থ হবে না।

- আর তারা যদি তোমার এমন কোন ক্ষতি করতে চায়, যা আল্লাহ নির্ধারণ করেননি, তাহলে তারা সে ক্ষতি করতে পারবে না। জেনে রেখো, অপছন্দনীয় জিনিস ধৈর্যের মাধ্যমে সহ্য করার মাঝে আছে মহাকল্যাণ।

- বিজয় রয়েছে ধৈর্যের মধ্যে; কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি; আর কঠিন অবস্থার সাথে রয়েছে সহজতা।

কিংবা সূরা লোকমানে বর্ণিত লোকমান হাকিমের উপদেশ সামনে নিয়েও সন্তানকে কোলের মধ্যে করে শেখাতে পারেন:

- হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়।

- হে বৎস, কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।

- হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।

- অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না।
নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

- পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কন্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

এক সাথীভাই বাচ্চা কোন ভুল করলে বলতেন, যাও দু’রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাও। ছোট থেকেই আল্লাহভীতি গড়ে উঠবে এভাবে। মিথ্যা বলা, মারামারি, কোন কিছু ভেঙে ফেলা— সব কিছুর একই শাস্তি, আল্লাহর কাছে মাফ চাও।

হায় কত বাচ্চা বলিঊডের খানদের চেনে, চার খলিফাকে চেনে না। এক সাথীভাই তার ছোট চাচাতো ভাইকে বলছে, কালিমা পড়ো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ৫ বছরের বাচ্চা বলছে, কেন পড়ব, এটা তো ফকিরদের গান।

সেই ভাই শেখানোর চেষ্টা করতেই, বাপমা বলে ওঠে, এতো বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। অথচ ‘ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশীপ’ বা ‘টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল’ ইত্যাদি অর্থহীন কবিতা এমনকি অপরাধী গান পর্যন্ত আমরা বাচ্চাদের মুখস্ত করাই। বাবা, আঙ্কেলকে একটা কবিতা শোনাও তো। তার মানে সূরা শেখালে তাও পারতো। উচ্ছে গাছ লাগিয়ে আমের স্বপ্ন দেখার উম্মাত আমরা। এই বাচ্চাই বড় হয়ে বাপমাকে না জানিয়ে প্রেম করে বিয়ে করলে, গায়ে হাত তুললে আবার কত কান্নাকাটি। মুফতি মনসুরুল হক হাফিজাহুল্লাহ এক বয়ানে বলেছিলেন, সে সন্তান আল্লাহকে চেনে না, আল্লাহর রাসূলকে চেনে না, সে বাপমাকে কি চিনবে, বাপমায়ের হক কী বুঝবে। এজন্য যদি আলিম নাও বানাতে চান, প্রথম দু’য়েক ক্লাস মাদরাসায় পড়ানো উচিত। এমন পরিবারও আমরা পেয়েছি, ৫ বছরের বাচ্চা ছোট ছোট সূরাগুলো মুখস্ত, ঘুমের দুআ-খাওয়ার দুআ এসব ছোট ছোট দুআগুলো মুখস্ত, এমনকি অনর্গল দাওয়াতের মূল কথাগুলোও বলে দিচ্ছে। এটা ব্রেন ডেভেলপমেন্টের সময়, যা শেখাবেন, যে সফটওয়্যার ইন্সটল দেবেন, তা পার্মানেন্ট হয়ে যাবে।

যতটা সম্ভব ইউটিউবের কার্টুন ইত্যাদি থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা চাই। আল্লাহ আমাকে তাওফীক দিন। তবে আমার ভায়রাকে দেখেছি আলাদা করে ডাউনলোড করে রাখতেন মিউজিক ছাড়া আরবি কার্টুন। ওগুলো দেখে আরবি আরও চোস্ত হয়েছে। তবে মিউজিকের খারাপ প্রভাব থেকে বাঁচানো খুব জরুরি। অন্তরের নূর নষ্ট হয়ে যায়। বাচ্চার খানা যিকিরের সাথে পাক করা চাই। দুধের বাচ্চাকে খাওয়ানোর সময় সর্বদা ডানপাশ থেকে শুরু করা, বামেরটা খাওয়ানো উদ্দেশ্য হলেও ডান থেকে শুরুটা হওয়া দরকার। কোন বুজুর্গের মায়ের ঘটনা যেন শুনেছিলাম, সবসময় দুধপান করাতেন অযু অবস্থায়। মাইন্ড ইট, এই সন্তান আপনার ‘আমল’, যেটা আপনি দুনিয়াতে রেখে যাবেন। এখন কবরে বসে নেকী পেতে চান, না কি গুনাহ কামাতে চান, সে ফয়সালা এখনই করতে হবে, টাইম কম।

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “এই উম্মাতের শেষের দিকে যে লোকেরা আসবে, তাদের সংশোধন সেই পর্যন্ত হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তারা প্রথম যুগের সংশোধনের পন্থাকে গ্রহণ না করবে”। দীনকে শুধু মসজিদ আর মাদরাসায় সীমাবদ্ধ না রেখে ঘরে নিয়ে আসতে হবে। ঘরে নফল নামাযের দ্বারা মসজিদের পরিবেশ, যিকিরের দ্বারা খানকাহের পরিবেশ, আর তা’লিমের দ্বারা মাদরাসার পরিবেশ প্রতীকীভাবে কায়েম করতে হবে। তাহলে এই ঘর থেকেও ‘কুরআনের পাখি’ না শুধু; ‘কুরআনের বাঘ’ ‘কুরআনের সিংহ’ বের হবে ইনশাআল্লাহ। পরিবেশ বানান, যেমন পরিবেশ বানাবেন, তেমন প্রোডাক্ট বের হবে। এখন সালাহউদ্দীন আইউবী চান, না ব্রয়লার মুরগী চান, এ সিদ্ধান্ত আপনার।

আল্লাহ আমাদের ঘরগুলোকে মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ হিসেবে কবুল করুন।

ঘরে ঘরে নেক সন্তান দান করুন।

[1] মুসনাদে আহমাদ, নং ২৮০৩; সহীহ। এই একটা হাদিস নিয়ে একটা কিতাব আছে ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রহ. এর— ‘নূরুল ইকতিবাস’। বইটি ‘নবীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ’ নামে সীরাত পাবলিকেশান থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

সন্তানের শিক্ষা
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·THURSDAY, JANUARY 3, 2019

জরুরি কিছু বাদ পড়ে গেল কি না, যা আলোচনার দরকার ছিল। এগুলো বইয়ে থাকবে। আমি আলোচনাগুলো আরও কমপ্লিট করার জন্য ফেবুতে দিচ্ছি। আগের নোটগুলোতেও সংশোধন থাকলে
আপনারা জানাবেন। আল্লাহ জাযা দিবেন ইনশাআল্লাহ।

দীনী কমিউনিটির মা-বাবাদের একটা অন্যতম পেরেশানির বিষয় হচ্ছে সন্তানের শিক্ষা। অনেকেই ইনবক্সে বা বিভিন্ন সাক্ষাতে সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই অংশটা এক্সক্লুসিভলি জেনারেল শিক্ষিত, কোন আলিমকে কখনো এটা নিয়ে পেরেশান হতে শুনিওনি, দেখিওনি। কেননা দীন বুঝার পর জেনারেল শিক্ষার উপর, এর ফরম্যাট-কারিকুলাম-সহশিক্ষা-কোচিং বাণিজ্য এসবের উপর থেকে মন উঠে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। যে শিক্ষা আমাকে এতোদিন আল্লাহকে চিনতে দেয়নি, দীন বুঝতে দেয়নি, কুফফার কালচার-জীবনযাত্রার দিকে আকৃষ্ট করেছে, আমি স্বাভাবিকভাবেই চাইব না আমার সন্তানও একই প্রসেসে ঢুকুক। আবার বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে যে নামটা আসে সেটা হল, কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা। আমি শিক্ষাধারা বলতে মোটাদাগে এই দুটো ধারার কথাই বলব। কেননা, আলিয়া, ভোকেশনাল এসবকে জেনারেল শিক্ষাধারা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই ধারাটার উদ্দেশ্য-ফরম্যাট-আউটপুট অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থক্য করার মত নয়, ব্যতিক্রম ছাড়া। উদ্দেশ্য-ফরম্যাট-আউটপুট দেখলে ভিন্ন একটা ধারাই নজরে আসে, কওমী ধারা। দীনপালনে আগ্রহী জেনারেল শিক্ষিত অংশটার কাছে এই কওমী ধারাটা খুব একটা পরিচিত নয়। যাদের কাছে পরিচিত তাদের একটা বড় অংশের কাছে সন্তানের ভবিষ্যত ক্যারিয়ারের চিন্তাটা একটা প্রতিবন্ধকতা ছিল, যা স্বীকৃতির পর অনেকটাই সমাধান হয়ে গেছে। আরও বেশি সংখ্যক মা-বাবা এখন সন্তানকে কওমীতে দেবার ব্যাপারে আগে যে দ্বিধায় ভুগত, তা কেটে গেছে বলেই আমার মনে হয়। এখন আরেকটা সমস্যা হল, হিফজখানায় ছোট বাচ্চাকে আবাসিক দিয়ে দেয়া, বা কিতাবখানার ছোট ক্লাসে বাচ্চাকে এতো আগেই আবাসিক দেয়া অনেক জেনারেল অভিভাবকের জন্যই কষ্টকর। আমি জাহেল মানুষ এসব নিয়ে কথা না বলাই ভালো। বরং আজ প্রি-স্কুল সন্তানের শিক্ষাটা কেমন হতে পারে, বা স্কুল-মাদ্রাসা যেখানেই দেন না কেন, বাসায় তার সাইড-শিক্ষাটা কেমন হতে পারে তার একটা আউটলাইনে পৌঁছতে চেষ্টা করা যাক।

আমি আমার শ্বশুরের ৩ নং জামাই। ‘৩ নাম্বার’ শুনলে কেমন কেমন লাগলেও, আমি কিন্তু খুব আদরের জামাই। তবে জামাইদের মধ্যে সবচেয়ে আদরের মনে হয় আমার মেজ ভায়রা। কারণ হল, উনি খুবই বৈষয়িক, মানে এবং হাইলি র্যাশনাল। শ্বশুর বৈষয়িক নানা বিষয়ে ওনার মতামত নেন এবং আমার কাছে মতামত চেয়ে লাভ নেই এটাও উনি জানেন। এক্স-বুয়েট সিএসই, আর এক্স-ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ। জার্মানি আর ব্রিটেনে ডাবল এমএস করা। আমি নিজের সীমাবদ্ধতাগুলো খুব ভালো করে জানি। কে যেন বলেছিল, আমি কী পারি এটা জানাটা জ্ঞান না, বরং আমি কী পারি না, এটা জানাটাই প্রকৃত জ্ঞান। সেদিক থেকে দেখলে আমি আসলে বেশ জ্ঞানী। লেখালেখি করার আগেও খুবই বেখেয়াল ভাবালু ছিলাম, এখন আরও বেড়েছে। এ কারণে আমি পেশাগত জীবনে একজনের সাথে লেজ হিসেবে লেগে গেছি। সে যখন যা করে আমিও তাই করি, আমার কলিগ ডা. শামীম রেজা, কষ্টিপাথর বইয়ে তার নাম আছে। সে যখন ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দেয়, আমিও দেই। সে যখন ফাউণ্ডেশন ট্রেনিং-এ যায়, প্রভিডেন্ট ফান্ড খোলে, আয়কর রিটার্ন দেয়, আমিও সাথে সাথে করি। কারণ আমি জানি, স্বাধীনভাবে করতে গেলে আমার খেয়াল থাকবে না। তেমনি পরিবার ও শ্বশুরবাড়ির বিষয়গুলোতে আমি আমার মেজ ভায়রার সাথে নৌকা বেঁধে দিয়েছি। উনি যা করে, আমিও তাই করি। সন্তানের পড়াশুনার ব্যাপারেও ঠিক করেছি উনি যা করবেন, তাই করবো। ওনার মেয়েটার বয়স ৫ বছর, ছেলেটা
৩। বাচ্চাদের মায়ের শিক্ষা আরবি মিডিয়াম, তারপরও উনি নিজেও আরবি শিখেছেন। বাচ্চাদুটো নিজেদের মধ্যে অনর্গল আরবি বলে এই বয়সেই। মেয়েটাকে কোথায় দেবেন এই চিন্তায় চিন্তায় ৪/৫ টা স্কুল-মাদ্রাসা দেখা শেষ।

ওনার একটা কথা আমি খুব গেঁথে নিয়েছি। শুনবেন? সেটা হলো, বিদেশীরা যখন আমাদের স্কলারশিপ দেয়, তখন আমাদের সিজিপিএ মানে ‘সাবজেক্ট কতটা জানি’ এটা বেশ গৌণই হয়ে যায়। ওরা প্রধানত দুটো জিনিস দেখে—

১. ভাষার উপর কতটা দখল?

২. এনালাইসিস বা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা কতটুকু?

বিদেশীরা স্রেফ এটুকুই দেখে আপনি ভাষায় কতটা পারদর্শী আর আপনার বিশ্লেষণী ক্ষমতা কতটুকু। উনি উদাহরণ হিসেবে SAT আর GRE-র কথা বললেন, আমার অবিশ্যি খুব বেশি ধারণা নেই। তবে আমি এটূকু জানি আমাদের IBA-র ভর্তি পরীক্ষা ঐ ধাঁচেরই। আর নিজে ISSB দিয়েছিলাম, আর্মিরাও এই দুটোই দেখে। আপনি আপনার সন্তানের এই দুটো স্কিল একটু কষ্ট করে গড়ে দিতে পারলে সে যে সাবজেক্টেই পড়ুক, ভালো করবে। সে যদি, ‘তকদীরের ফেড়ে’ সবচেয়ে নিম্নমানের সাবজেক্টও পায়, সে ঐ সাবজেক্টেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে, উদ্ভাবনী দক্ষতার মাধ্যমে। আমরা একটু পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আলোচনা করি, তাই না? তাহলে বুঝে চর্চা করতে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। যেহেতু ‘দীন মানতে চাওয়া' মা-বাবাদের উদ্দেশ্যে লিখছি। অন্যরা পড়ে দ্বিমত করা ছাড়া বেশি উপকার পাবেন না।

১. ভাষাগত পারদর্শিতা

আপনারা তো জানেনই, যেকোন ভাষায় পারদর্শিতা বলতে ৪টা জিনিসকে বুঝায়, পড়তে পারা, লিখতে পারা, শুনে বুঝা আর বলতে পারা।

বাংলা:

মাতৃভাষা। আপনি যদি নাও চান, তারপরও বাচ্চা বাংলা শিখে যাবে। সুতরাং বাংলা বলা-শোনা নিয়ে বেশি চিন্তা করার দরকার নেই। এমনি এমনিই শিখবে। তবে লেখা ও পড়া নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে।

• সন্তানের সাথে ও সামনে বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলুন। করসি-খাইসি- করতেসো ইত্যাদি ট্রেন্ডি উচ্চারণ বাদ দিন। করেছি, গিয়েছি, করছো।

বাজে বাংলা শেখাবেন না। কুষ্টিয়া বাড়ি হলেও, আমার ভাষায় কিছুটা পাবনার টোন আছে, ম্যালা কষ্টে বাসায় ভাষা কসরত করি। অবশ্য বাচ্চার মা বিশুদ্ধভাষী, ঐটুকুই ভরসা।

• সব বাচ্চা একই বয়সে কথা শেখে না। কথা ফুটতে দেরি হলেই মহাভারত ‘শুদ্ধ’ হবে না, রূপকথা রূপকথাই থাকবে। বরং যতদিন আধো আধো কথা বলে, শুনে আনন্দ নিন।

• বাচ্চার সাথে বেশি বেশি কথা বলুন। যৌথ পরিবারের বাচ্চা একক পরিবারের বাচ্চার চেয়ে দ্রুত কথা শেখে। কথা বলার লোক বেশি পায় বলে।

• বুয়ার ভাষা যখন মাতৃভাষা হয়, তখন আর কার কী করার আছে।

• আমার বাবা পয়লা স্লেটে, এরপর আমাকে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়েছেন। বাসায় একটা ছোট ব্ল্যাকবোর্ড ছিল। হোয়াইট বোর্ড ভাল, ধূলামুক্ত। এতে অক্ষরের প্যাঁচগুলো সুন্দর হবে। কারণ মুছে মুছে লেখা অনুশীলনের সুযোগ থাকবে। এরপর দিবেন পেন্সিল। আমার বাবা একটা দারুণ কাজ করেছিলেন। পেন্সিলের পর বলপয়েন্ট না দিয়ে দিয়েছিলেন ফাউন্টেনপেন। আমার মনে আছে, প্রায়ই স্কুলড্রেসে কালি লাগায়ে আনতাম। এতে যেটা হবে। ফাউন্টেনপেন বা জেলপেনে লেখাগুলো ঝকঝকে হয়। সুন্দর করে লেখতে ইচ্ছে করে। দেখতেও সুন্দর লাগে, একটা সেলফ-মোটিভেশন কাজ করে। এরপর দিবেন বলপেন।

• বানান করে পড়তে শিখলে বাচ্চার জন্য গল্পের বই কিনে দিন, বয়স অনুপাতে। এতে করে সে পড়ে মজা পাবে, আরো পড়বে। মজার গল্প হলে একই বই বার বার পড়বে। শব্দগুলো পরিচিত হবে। এতে পড়া ঝরঝরা হবে। যেমন ধরেন আমার এই লেখাটা কিন্তু আপনি বানান করে পড়ছেন না। আপনি শব্দের দিকে তাকিয়েই বুঝে নিচ্ছেন শব্দটা। কারণ শব্দটা আপনার পরিচিত। এই

‘পরিচিত’ শব্দটা আপনার পরিচিত, তাই বানান করে পড়ার দরকার হয়নি। এভাবেই পড়া ঝরঝরা হবে। স্কুলের চেয়ে মাদরাসায় সুন্দর হাতের লেখা আর দ্রুতপঠনে বেশি জোর দেয়া হয়। মাদরাসার ছাত্রদের গড় হাতের লেখা জেনারেল ছাত্রদের গড় হাতের লেখার চেয়ে সুন্দর। এর একটা কারণ উস্তাদদের এই বিষয়ে আলাদা কেয়ার, আরেকটা কারণ ব্ল্যাকবোর্ডে অভ্যাস করানো। এজন্য প্রথম দু’এক ক্লাস মাদরাসায় পড়ানো একটা সুন্দর ডিসিশান (যদি আলিম না-ও বানাতে চান)।

আরবি:

দীনী কমিউনিটির জন্য অবশ্যই সন্তানের ‘সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ’ এর পছন্দ হওয়া উচিত আরবি। শুধু আখিরাতের জন্য কাজে আসবে তাই না, বরং মনে রাখবেন, আরবি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। ফলে তার ক্যারিয়ারেও এটা কাজে আসবে না, তা নয়। আমরা কিন্তু প্রি-প্রাইমারি মানে ক্লাস ওয়ানের আগের পড়াশুনা নিয়ে আলোচনা করছি।

• নিজে আরবি শিখতে পারেন। সন্তানকে শেখানোর জন্য।

সন্তানের সাথে আরবিতে কথা বলুন, টুকিটাকি। আরবিতে লেকচার দিতে বলা হয়নি। আমার ভায়রার বাচ্চাগুলো ৪/৫ বছর বয়েসে পটাপট আরবি বলে। এতো সুন্দর লাগে শুনতে—

- আবী উনজুর, নেমের। (বাবা দেখো, বাঘ)

- আইনা? (কোথায়)

- হুনাক (ঐখানে)

- আবী, আনা হুনা (বাবা, আমি এখানে)

এরকম ছোট ছোট কথাবার্তা। এখন অবশ্য আরও ভালো বলে।

• শব্দগুলো শেখান, আরবি ভোকাবুলারি বাড়িয়ে দেন। ভায়রার বাচ্চাগুলো যে শব্দের আরবি জানে না, মাঝখানে একটা বাংলা শব্দ চালিয়ে দেয়। হা হা, কিন্তু মা-খালাদের সাথে আরবিতেই কথা বলে কম-বেশ। হিম্মত করে শুরু করেন ইনশাআল্লাহ।

• ‘এসো আরবি শিখি’ বইটা একা একা পড়লেও বেশ বুঝা যায়, পড়েন আর বাচ্চার সাথে কথা চালান। না বুঝা জায়গা গুলো মার্ক করে কোন আলিম থেকে জেনে নিলেন। খুব সহজ।

• আমরা যেমন আগে বাংলা কথা শিখি, পরে গ্রামার শিখি। তেমন করে আগে আরবি কথা শিখিয়ে দেন। পরে মাদ্রাসায় গ্রামার শিখে নেবে।

• ৫ বছর বয়সে বাসায় আরবি টীচার রাখতে পারেন। জাস্ট নাজেরা পড়াবে, ১ বছর।

ইংরেজি:

ইংরেজি একটা সহজ ভাষা, তরল। খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না, বলে আমার মনে হয়। যদি জেনারেল শিক্ষাকেই পছন্দ করেন, তবে কারিকুলামের সাথে সাথেই শিখে যাবে কাজ চালানোর মত ইংরেজি। তবে প্রি-প্রাইমারি লেভেলে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। শুধু প্রি-প্রাইমারি না, প্রতি বছরই স্কুলের উপর নির্ভর না করে ইংরেজি গ্রামারের একটা অংশ, যেমন কোনো বছর টেন্স, কোনো বছর ভয়েস, এভাবে।

• যদি চান বাচ্চার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হোক ইংরেজি। তাহলে ‘আরবি’ অনুচ্ছেদটায় ‘আরবি’ শব্দে ‘ইংরেজি’ বসিয়ে আবার পড়ুন। আর যদি চান থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হোক, তাহলে কারিকুলামের উপর ছেড়ে দেন, আর নিজে একটু একটু করে বসুন।

• আর যাঁরা সন্তানকে মাদরাসায় দিতে চান, তারা ইংরেজির আলাদা যত্ন নিবেন, যখন মাদরাসা বন্ধ থাকবে। ব্যস হয়ে গেলো।

এই সুযোগে নিজের ঢোল পিটিয়ে নিই। ঢোলের ব্যাকগ্রাউণ্ডে...

ক) প্রাইমারি স্কুলে একবার আমার স্যাররা আব্বাকে ডেকে আমার সব সাবজেক্টের খাতা দেখালেন। এটা দেখানোর জন্য যে, আপনার ছেলে কিছু জায়গায় নাম্বার কম পেলেও, কোন সাবজেক্টে কোন জায়গায় বানান ভুল নাই।

খ) স্কুল কলেজে বাংলা-ইংলিশ বানান প্রতিযোগিতায় প্রাইজ ছাড়া খুব কম ফিরতাম।

গ) আব্বুর কাছে শুনেছি, আমি-ছোটভাই-আমার বোন ৩ জনই ক্লাস ওয়ানে থাকতে পেপার পড়তাম ঝরঝরা।

ঘ) ক্লাস ৬ থেকে আর প্যারাগ্রাফ কিংবা রচনা মুখস্ত করতাম না।
ইংলিশ ফ্রী হ্যান্ড প্যারাগ্রাফ-এসে, বাংলা রচনা লিখতাম বানিয়ে বানিয়ে।

যে কারণে নিজের ঢোলে এতগুলান বাড়ি দিলাম। অফিস শেষে আব্বু নিজে আমাদের ভাইবোনকে পড়াতেন। বাজারের ব্যাকরণ পড়াতেন না শুরুতে। একটা ডায়রিতে নিজে লিখে লিখে বই বানাতেন, আর নিজের টেকনিকে পড়াতেন। গ্রামার ধরার আগেই ভাষা ধরা শেষ, বানানের নিয়মকানুন বোঝা শেষ। এই বইগুলো চাইল্ড সাইকোলজির ‘থিওরি’ না, আব্বুর

প্র্যাকটিক্যাল, যার প্রমাণ আমরা তিন ভাইবোন। বাংলা ইংরেজি দুটোতেই আব্বু নিজস্ব কৌশলে আমাদের গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী সাজিয়ে সাজিয়ে ডায়েরি লিখেছেন। যারা 'এসো আরবি শিখি' পড়েছেন, কিছুটা মিল খুঁজে পেয়েছি আমি কৌশলে।

ডায়রি দুটো বই আকারে আনার কাজ শুরু হয়েছে। তিন মাস তিন মাস ছয় মাসে আপনার সন্তানকে বই দুটো পড়িয়ে দিতে পারলে তার তাকাতে হবে না ইনশাআল্লাহ। সাথে দীনী ভাবধারা যোগ হচ্ছে বাচ্চাদের মত করে, থাকছে শিক্ষক নির্দেশনা, কিছু গ্রাফিক্সের কাজ। বাক্য রচনা বা ট্রান্সলেশনগুলোতে দীনী পরিচিতি আনা হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ। আমার বাচ্চাকে কী পড়াব টেনশানে ছিলাম। দুআ করবেন সবাই, যেন তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়।

২. বিশ্লেষণী ক্ষমতা

এটাই মূলত মানসিক দক্ষতার নির্দেশক। ISSB, BCS, IBA, ভার্সিটির কিছু কিছু ভর্তি পরীক্ষায় (IER ইত্যাদি) এই টেস্ট ব্যাপকভাবে নেয়া হয়। কয়েক ধরনের হয় এগুলো:

- জানা সূত্র থেকে অজানা কিছু বের করা

- জানা কিছু জিনিস থেকে সূত্র বের করে অজানা কিছু নির্ণয় করা

- মিল-অমিল বের করা

- ভাষার মারপ্যাঁচ বুঝা

- দেয়া তথ্য থেকে সমাধান বের করা

যদি পরিচিত শব্দে বুঝাতে চাই, ‘কিয়াস’ করার দক্ষতা। পশ্চিমা বিশ্বে পরীক্ষার সিস্টেমগুলো এরকমই বলে শুনেছি। ওদের অনুকরণেই আমাদের দেশে ‘সৃজনশীল’ নামে উদ্ভট এক জিনিস চালু হয়েছিল। নাম সৃজনশীল হলেও, প্রশ্নগুলো আর সৃজনশীল থাকেনি। দক্ষ প্রশ্নকারীর অভাবে সেই মুখস্ত প্রশ্নই চলে এসেছে ঘুরেফিরে।

এই ক্ষমতাটাই মানুষের এক্সক্লুসিভ ক্ষমতা, এজন্যই আমরা মানুষ। বানর-শিম্পাঞ্জীতে সামান্য কিছুটা পাওয়া যায়। আল্লাহ এই ক্ষমতাটা দিয়েই আমাদের টেস্ট নিচ্ছেন। সৃষ্টি দেখে স্রষ্টাকে চেনার পরীক্ষা। কিছু জানা জিনিস বিশ্লেষণ করে অজানা অদেখা বিষয় উপলব্ধি করে একটা সিদ্ধান্তে আসার পরীক্ষা।

• বাচ্চারা এগুলো কিছুটা নিজে নিজেই শিখে আর এপ্লাই করে। আপনি কিছু বস্তু সরবরাহ করবেন।

- যেমন, বিল্ডিং সেট। এগুলোর সাথে যে ছবিগুলো দেয়া থাকে, হুবহু অমন বানাতে বলবেন।
পারলে পুরস্কার দিবেন। তাহলে ও মনে রাখবে, আরও মনোসংযোগ করবে।

- কিংবা ‘প্লেইং ডৌ’, বিভিন্ন কালারের আটার খামিরের মত পাওয়া যায়। বেশি ছোট বাচ্চাকে দিয়েন না, খেয়ে ফেলবে। এগুলো দিয়ে সাথে দেয়া ডিজাইনের মত বানাতে বলবেন।
পুরস্কার দিতে ভুলবেন না।

• সম্পর্কগুলো বোঝে কি না। আমি তোমার বাবা, তোমার দাদা আমার বাবা।
তোমার দাদী আমার মা। আবার তোমার দাদী তোমার ফুপিরও মা। তাহলে তুমি আর হামযা যেমন ভাইবোন, আমি আর তোমার ফুপিও ভাই-বোন।

• সিম্পল যোগবিয়োগ, কয়েন গোণা, কোন খাবার ভাগ করা। এই জাতীয় হাবিজাবি আর কি। এগুলো যত চর্চা করা হবে তত শাণিত হবে। বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়বে।

• কোন কাজ একবার দেখিয়ে দিয়ে পরের বার তার হাতে ছেড়ে দেখবেন করতে পারছে কি না। যেমন একটা কেক ভাগ করা সমান ভাগে। কিছু একটা এঁকে তাকে আঁকতে বললেন।

বিবিধ:

আমার মনে আছে, আমি যখন ওয়ান বা টু- তে পড়ি, আব্বু আমাকে একটা ম্যাপের বই কিনে দিয়েছিলেন। ইন্ডিয়ান প্রিন্ট। আর শিখিয়েছিলেন প্রণালী-মালভূমি-পর্বত-অন্তরীপ-দ্বীপ কাকে বলে। আমি খুব মজা নিয়ে দেখতাম, কত্তবড় দুনিয়া, কত্তবড় সাগর-মহাসাগর। ক্লাস ফাইভের দিকে আমাকে যে কোন দেশ বের করতে বললেই করে দিতাম, যেকোন পাহাড়-হ্রদ-প্রণালী-উপসাগর দেখিয়ে দিতাম, প্রায় অর্ধেকের বেশি দেশের রাজধানী মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল ম্যাপ দেখে দেখে। নিজের খুশিতে দেখতাম। আব্বু আমাকে কেবল মজাটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

আরেকটা জিনিস আব্বু করেছিলেন। বইয়ের সাথে ভালোবাসা তৈরি করে দিয়েছিলেন। তখন নওগাঁয় থাকতাম আমরা। অফিসের কাজে ঢাকা এলে ফেরার সময় আমার জন্য ২০-৩০ টা করে বই নিয়ে আসতেন। রূপকথা থেকে শুরু করে বিজ্ঞানবিষয়ক, ডাইনোসর, নানান দেশের লোককাহিনী, ইতিহাস, জীবনী, রহস্য, ধর্মীয়— সব। তবে কোনদিন কিনে দেননি কমিক্স আর বন্দুক-পিস্তল। সাথে করে নিয়ে জেলা বইমেলায় নিয়ে যেতেন, বই কিনে দিতেন। খাওয়ার সময়ও ঐসব বই পড়তাম।

ডায়েরি লেখার অভ্যাস করে দিয়েছিলেন। সম্ভবত ক্লাস থ্রি থেকে ডায়েরি লিখতাম। রোজনামচা ধরনের না, হাবিজাবি। পেপার, ম্যাগাজিন, বইয়ে ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে টুকে রাখতাম। যেমন ধরেন, সেসময় ‘আকবর

দি গ্রেট’ হত টিভিতে। মোঘল বাদশাহদের পুরো নাম বলত, মজা পেয়েছিলাম।

জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর

নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন

জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর

এরপর সিরিয়াল গেল বন্ধ হয়ে। বাকিগুলো কই পাই। বাসায় একটা বই ছিল ‘ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের ইতিহাস’। তখন এসব বই পড়ার আগ্রহ বা বুঝ কোনটাই ছিলনা। খুঁজে খুঁজে বাকি নামগুলো বের করে টুকে বই রেখে দিলাম বইয়ের জায়গায়।

নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ শাহজাহান

মহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব, খালাস।

আমাদের তিন ভাইবোনেরই ডায়েরি লেখার অভ্যাস করেছিলেন আব্বু। এখনকার বাচ্চারা সময়ই পায় না দম ফেলার। বাচ্চাকে দম নেবার সময় দিয়েন। ওর নিজের মত কিছু সময়। আর কিছু না হলেও খেলার সময়টুকু ম্যানেজ করে দিয়েন। গা ঘামিয়ে খেলা। জায়গা না থাকলে ব্যাডমিন্টন বা টেবিল টেনিস ভালো অপশান। বিশেষ করে টেবিল টেনিস তো খুবই ভালো অপশান।

আর ওর কলিজাটা বড় করে দিবেন। দুনিয়াটা বিশাল করে দিবেন। তোমাকে এটাই হতে হবে, এটাই করতে হবে। এভাবে আটকে দিবেন না। আমার মনে আছে, আব্বু আমাকে বলতেন, থ্রি বা ফোরে পড়ি তখন। একটা বাগান ছিল, বাগানে আব্বুর সাথে কাজ করতাম। টমেটো, লালশাক, কুমড়ো লাগাতেন। আব্বু

বলতেন, নোবেল প্রাইজ তো মানুষেই পায়, তুমিও পেতে পারো। বিশ্বাস করবেন না, মেডিকেলে ভর্তির আগ পর্যন্ত আমার মধ্যে এটা কাজ করত।
ওটা তো মানুষেই পায়, আমিও পেতে পারি। তবে তখন আমাদের দীনের বুঝ ছিল না। এখন আমার সন্তানদের টার্গেট হল, তোমরা ‘সাহাবী’ হবে। ওনারা পানির উপর ঘোড়া চালিয়ে পার হয়েছেন, তোমরাও পারবে। আম্মাজান আয়িশা রা. এর মত বড় ফকীহ হবে। খালিদ রা. এর মত সমরবিদ হবে। সাহাবীরা যেমন নবীজীর অনুকরণ করেছেন, ওনারাও মানুষ, পেরেছেন, তোমরাও পারবে। মানুষই পারে। কলিজা বড় করে দিব, তবে ফোকাস থাকবে আখিরাত।

আরও কিছু জিনিস শেখাতে ভুলবেন না। সাঁতার আর সাইকেল চালানো। শিশু শ্রেণীতে আব্বু আমাকে একক-দশক-শতক-হাজার-অযুত-লক্ষ-নিযুত-কোটি শিখিয়েছিলেন। মেঝেতে গোল করে চারপাশ দিয়ে চক দিয়ে লিখতেন এগুলো। আর আমার একটা খেলনা মটর সাইকেল ছিল, একটু যেত, আবার পিছে আসত, আবার যেত। ঐ খেলনাটা মাঝে রাখতেন। মটরসাইকেল যেখানে গিয়ে থামত, বলো এটা কি? সোল্লাসে বলতাম একোওওওক, অযুউউউত। আপনাকে গবেষক হতে হবে।
বাচ্চাকে বাচ্চা হয়ে শেখাতে হবে। শেখানোর টেকনিক বের করতে হবে।
আনন্দ তৈরি করে দিতে হবে। এটা স্কুল-কলেজের ব্যবসায়ীরা করবে না। আপনি বাবা, আপনি করবেন।

আর সন্তানকে অভিশাপ দেবেন না, ডিমরালাইজ করবেন না। তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না— এসব বলবেন না। দুআ করবেন, পিতামাতার দুআ সন্তানের জন্য কবুল। ২০০৭ সালে আব্বু-আম্মু হজ্জ করে আসেন। আমি তখন কষে ছাত্রলীগ করি। বাবা-মাকে পেরেশান করার জন্য একটা ছেলে যা যা করতে পারে, প্রায় সবই করি। আমাকে প্রতিদিন নামাযের কথা বলতেন দু’জনে। একদিন খুব করে বললেন নামায না পড়ার জন্য। রেগে মেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম, চলে গেলাম হোস্টেলে। কয়েকদিন আর ওমুখো হলাম না। আমি কি বুঝি না, কাদের দুআ আমাকে আজ এত সুন্দর একটা জীবন দিয়েছে? রাব্বিরহামহুমা কামা রব্বাইয়ানী সাগীরা।

এখন আমি টের পাই, ‘বাবা’ (জনক না কেবল) হবার মধ্যে কী সুখ। নোবেল প্রাইজ পাবার সুখ কি আরো বেশি? হলে হোক, আমার তাতে কী?

শেষ রশি
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2019

বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে বলে আবারও লিখতেসি। আসলে মনের ভিতর খুব চলে ফিরে বেড়াচ্ছে বিষয়টা। আমি নিজে জাহিল, আমার মত জাহিলদের জন্য লিখি, কাজ করি। আমাদের নিয়ে ভাবি। এই পোস্টে কথাবাত্রা- সম্বোধন আমরা আমরাই। উলামা হযরতগণের জন্য প্রযোজ্য না। কিছু বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে এই পোস্ট। বিতর্ক করার্লাইজ্ঞা না পড়ার দরখাস্ত।

আমরা দীনী বিষয়গুলোতে পুরোপুরি উলামায়ে কিরামের প্রতি নির্ভরশীল। শতভাগ। তবে তাঁদের সীমাবদ্ধতার কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। অনেকে সব বিষয়েই ঢালাওভাবে আলিমদের দোষারোপ করে, এটা এক তো কোনো সমাধান না, সেই সাথে গুনাহেরও কাজ। মুসনাদে আবু হানিফায় সহীহ সনদে এসেছে, আল্লাহ কাল হাশরে আলিমগণকে একত্র করবেন, এবং বলবেন: আমি নিজ ইলম থেকে তোমাদেরকে ইলম দান করেছি, আজ নিজ গুণে তোমাদের মাফ করে দিলাম। ওনারা যাই করুক, যদি উদাসীনও থাকেন (যদিও তা নয়), তবু তাঁদের গ্যারান্টি আছে শুধু ইলমের কারণে। আমাদের কিন্তুক সেই কার্ড নেই। এজন্য উনারা উনাদের মত করে বহু পারিপার্শ্বিক চাপ সহ্য করে যতটুকু সম্ভব তালিম, তাযকিয়া, ওয়াজের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব দীন পৌঁছে দিচ্ছেন, এবং আমি হাদিস থেকে আশাবাদী এতে তাঁরা দায়মুক্তও হয়ে যাবেন।

উনারা দীন পৌঁছাতে যতখানি না বাধ্য, আমরা দীন শিখতে তার চেয়ে বেশি বাধ্য। ইলম তলব ফরজে আইন, ইলম শেখানো আইন না। নিজ মহল্লায় মাদরাসা আছে, ইমাম আছেন, উলামা আছেন। বা নাগালে আছেন। আমার উপর তাঁর কাছে

গিয়ে শেখা ফরজ। এ সংক্রান্ত একটা মাসআলাও ঘুরে বেড়াচ্ছিল ফেসবুকে যে, কতটুকুর মাঝে আলিম থাকলে সেই এলাকার লোকেদের জন্য ইলম শেখা ফরজ হয়ে যায়। আলিমগণ উনাদের পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনে যতটুকু করছেন, তাতে উনারা পার পাবেন। কিন্তু যতটুকু পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণে পেরে উঠছেন না সেটুকুর জন্য তাঁরা নিঃসন্দেহে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। তবে আমাদের সেটুকু শেখা মাপ হয়ে যায়নি বলে আমার মনে হয়। বহু মসজিদ কমিটিতে ব্যাঙ্কার আছে, সুদ-ব্যাংকের বয়ান দিলে পরের দিন চাকরি নাই হয়ে যায়, মাদরাসার চাকরি নাই হয়ে যায়। সহশিক্ষা, নারীশিক্ষার বয়ান দিলেও তাই। আরও কিছু দীনী বুনিয়াদী বিষয় আছে, মুখ না খোলাটাই এ অবস্থায় হিকমাহ, কিছুই করার্নাইক্যা। এটাই বাস্তবতা, এবং এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহর দরবারে মাফ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আলোচনা নেই বলে এ সংক্রান্ত ইলম হাসিল করা কি আমাদের মাফ হয়ে গেল? উহু, আমার খুব দৃঢ়ভাবে মনে হয় 'না'। সব ফরজ হুকুমের ইলম জানা ফরজ, চাই আলোচনা থাক বা না থাক। সব হারামের ইলম জানা ফরজ, চাই আলোচনা থাক বা না থাক।ইলমের তলব ফরজ।

বেরেকের পর ফিরে এলাম আমি শামসুল আরেফীন। তো যা বলসিলাম। ইলমের ফরজ আমাদের জিম্মায় আছে, হারামের ইলম, ফরজের ইলম। সেটা আলিমগণ পৌঁছাতে পারুন আর না পারুন।

সব আলোচনা বন্ধ হয়ে গেলে আমরা শিখব কার থেকে? বয়ানে নেই, ওয়াজে নেই। কুরআনে তো আছে। হাদিসে তো আছে। সব বন্ধ হয়ে গেলেও কুরআন আমাদের কাছে আছে। আম্রিকার কাছে চাহে লক্ষ এটমবোম থাকুক, আমাদের কাছে আছে অপার্থিব কুরআন, এই দুনিয়ার না। আল্লাহর সত্তার অংশ হল ইলম, সেই ইলমের অংশ হল কুরআন, গায়ের মাখলুক। চিন্তা করেন একবার কী পরিমাণ পাওয়ারফুল জিনিস আমাদের কাছে। এরপরও আমরা মার খাই, কারণ এই জিনিস থেকে আমরা দূরে।

এজন্য কুরআনে ফিরতে হবে। আমরা বাধ্য, আর সব রাস্তা বন্ধ যে। একজন আলিম থেকে রোজানা আধাঘণ্টা সময় নেন। ওনারা সবাই তাফসীর পড়েই পাশ দিয়েছেন। কঠিন কিছু না। আধাঘণ্টা আমাদের ওনার জানা জিনিসই জানিয়ে দিবেন। মহল্লায় মহল্লায় সাপ্তাহিক তাফসীর যথেষ্ট না। মহল্লার কিছু যুবক একত্রিত হয়ে রোজ ওনার কাছে আধঘণ্টা বসেন। ওনার শেখা কথাগুলোই আমাদের শেখাবেন। আরবি জানা বা শেখার দরকার নেই, বাংলা তাফসীর নিয়েই বসেন, এরপর বাংলা বুখারী নিয়েই বসেন। একজন পড়েন ওনার সামনে আর বাকিরা শোনেন, নোট করেন উস্তাযের কথাগুলো। এভাবে শেখা হোক অপার্থিব প্রচণ্ড কিতাব।

আমরা কুরআন শেখা বলতে নাজেরা শেখা বা সন্তানকে নাজেরা পড়ানো বুঝি। না, কুরআন শেখার সংজ্ঞা বদলান। নাজেরা শেষে একটা তাফসীর উস্তা্যের কাছে পড়াকে বলা হবে 'কুরআন শেখা', এখন থেকে সংজ্ঞা চেনজ। আমরা তো আলিম হতে চাচ্ছি না, কুরআন শিখতে চাচ্ছি। তাই আরবি জেনে উর্দু জেনে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পড়তে হবে, এটা জরুরি না। বাংলা তাফসীরই পড়েন আলিমের নেগরানিতে। দেখেন কাজ বহুত এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আর উলামায়ে কেরামের প্রতি আরজ, পিওর কুরআন পিওর হাদিস আওয়ামের হাতে পড়লে গোমরাহ হয়ে যাবে, এটা থেকে বের হবার সময় এখনও কি হয়নি? অলরেডি আওয়াম তো এগুলো পড়ছেই, ঠেকানো তো আর যাচ্ছে না। বরং আপনারা ওদের আধঘন্টা করে সময় দিলে ভালই হবে। আপনি দরসে যা শিখেছেন ওগুলোই শিখিয়ে দেবেন। লাগামহীন পড়াকে আপনাদের নেগরানিতে নিয়ে নিলেন। কেমন হয়? ঠেকানো তো যাচ্ছে না, এর চেয়ে এটা ভালো না। বাংলা তাফসীর পড়ুক, বাংলা বুখারী, রিয়াজুস সলিহীন, মুসলিম, আদাবুল মুফরাদ, তিরমিযী, মিশকাত। চলুক না, বাংলায়ই। আলিম না হোক, দীন শিখুক।

আমাকে যদি প্রাথমিক একটা তাফসীরের নাম বলতে বলেন, তাহলে আমি বলব 'তাফসীরে উসমানী'। কেন? খুব সহজ, সাবলীল। আরেকটা কারণ আছে। এই

তরজমা এবং সূরা নিসা অব্দি তাফসীর করেছেন দেওবন্দের প্রথম ছাত্র, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান রহঃ মাল্টার জেলখানায় বসে বসে। একজন মজলুম মুজাহিদের লেখা তরজমা, যার পাতায় পাতায় উম্মাহর উত্তোরণের সমাধান খুঁজার ব্যাকুলতা। ছত্রে ছত্রে জেলজীবনে মাওলার সান্নিধ্যের নূর। বর্ণে বর্ণে আধুনিক বাতিলের (সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ) যাঁতাকলে মুসলমানদের কী করণীয় সেই পথনির্দেশের আভাস। অস্থির। আমি পড়ছিলাম আর বর্তমানের সাথে মিলাচ্ছিলাম। ভাষা শেষ। বাকিটুকু পড়ে নিয়েন।

ব্যাচেলার মানুষ, অন ডিউটি। রাত বিরেতে কী মনে আসে না আসে। আমাকে বেশি পাত্তা দেয়ার্দর্কার্নেই।

আস্থার সংকট ও কাদিয়ানি বিষয়ে আকীদা
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·MONDAY, FEBRUARY 11, 2019

ভাবার জন্য পইড়েন। আমারে দুটা গালি দিলে তো দেয়াই যায়, ওতে ফায়দা নেই। আমাকে আনফলো- আনফ্রেন্ড করে দেন।

এসব লিখতে চাইনি। তবু লিখতে হচ্ছে। ফেসবুকে অনেক বিপুল সংখ্যক মানুষ ‘কাদিয়ানীরা’ কাফির কি না— এটা নিয়ে সংশয়ে পড়ে গেছে। অনেকে ফিকহী মতপার্থক্য মনে করছে, কেউ আবার আকীদার ‘ব্যাখ্যা’ লেভেলের সূক্ষ্ম মতপার্থক্য মনে করছে। এজন্য লিখছি। কারও পছন্দ হবে, কারও হবে না। ফেসবুকে রাজনীতি করতে আসিনি যে, আমার পিছনে বিপুল জনসমর্থন লাগবে। বই আল্লাহ লিখিয়েছেন, তার মধ্যে হেদায়েতের কিছু থাকলে আল্লাহই পৌঁছে দিবেন। আমাকে পছন্দ না হলে আমার বই পড়ার জন্য আপনি বাধ্য না।

তখন কেবল ৩ চিল্লা শেষ করে এসেছি। রক্ত আগুন হয়ে আছে। সব পরিবর্তন করে ফেলব, সব ভেঙে নতুন করে গড়ে তুলব। দীনের জন্য সর্বোচ্চ কুরবানি দিয়ে দেব। আলিমদের জন্য দিল দিওয়ানা। ধারে কাছে যেখানে তাফসীর হচ্ছে, মাহফিল হচ্ছে, ডিউটির ফাঁক পেলেই দৌড়। পারলে দু’চারজনকে সাথে নিয়ে। ইজতিমার মাঠে বর্তমানে ‘গোমরাহ’ এক আলিমের মুখে যখনই শুনলাম ‘উলামায়ে কিরামের মজলিসে বসাকে গণিমত (সম্পদ) মনে কোরো, উলামায়ে কিরামের যিয়ারতকে ইবাদাত মনে কোরো’। আর পায় কে? সোহরাওয়ার্দীর ধারে কাছে যত আলিমদের মাহফিল, প্রায় সবগুলোতে থাকার চেষ্টা করতাম, তবে অবশ্যই দেওবন্দী কওমী আলিমদের। যেহেতু বাকিরা আলিম না, ভ্রান্ত।

তাবলীগের নিয়ম ছিল, চিল্লার ভিতর কোনো মতবিরোধপূর্ণ মাসয়ালা আলোচনা হবে না। সেই হিসেবে এসব আলোচনাই ছিল না। শায়খ যাকারিয়া রহ: লিখেছিলেন, ‘তাবলীগ হল আমলের পিপাসা তৈরি করে দিবে। এরপর আহলে হাদিসরা যাবে আহলে হাদিস আলিমের কাছে পিপাসা মিটাতে, হানাফীরা হানাফী আলিমের কাছে গিয়ে মিটাবে, শাফেঈরা শাফেঈ আলিমের কাছে’। তাবলীগ থেকে এসে যখন ওলামাদের মাহফিলে যাওয়া শুরু হল, তখন চিনলাম জাকির নায়েক গোমরাহ, ইহুদিদের দালাল। আব্বুর সাথে কতবার জাকির নায়েককে নিয়ে তর্ক করেছি, আহলে হাদিসরা যে আসলেই ইহুদিদের এজেন্ট প্রমাণ করতে চেয়েছি। আব্বু পীসটিভি দেখতেন, সেটা বন্ধ করার জন্য কত ঝগড়া করেছি। এগুলোর কোনোটাই তাবলীগ আমাকে শেখায়নি।

হোস্টেলে আহলে হাদিসের ছেলেরা বাইরের এক আলিমকে নিয়ে এসে আরবি শিখবে, অনুমতি দিইনি। হোস্টেল থেকে বের করে দেবার ভয় দেখিয়েছি। তাবলীগের কোনো ছেলেকে ওরা যেন ওদের সাথে না নেয়, কড়া করে বলে দিয়েছি। ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের মাহফিলে ইয়ামিনের সাথে তাবলীগের এক ছেলে যেত। তাই ঐ ছেলেটাকে যে কি না তাবলীগের জন্য বরাদ্দ রুমে থাকত, তাকে রুম থেকে বের করে দিতে চেয়েছি। কারণ ওরা বিভ্রান্ত, ইহুদীদের দালাল। আমার প্রিয় আলিমগণ বলেছেন। আমার

প্রিয় আলিম তখন শায়খুত তাফসির ওলিপুরি হাফিজাহুল্লাহ। অবাক জীবন্ত বিস্ময় আমার কাছে উনি। আহলে হাদিসদের বিরুদ্ধে যত দলিলাদি সব সংগ্রহ করে ফেলেছি। নিয়মিত হোস্টেলে তর্ক বিতর্ক করছি।

একবার কাকরাইলে ডা. রফিক স্যারের সাথে পরামর্শ করলাম গিয়ে, স্যার, আমাদের হোস্টেলে আমরা মেহনত করে করে যে ছেলেগুলোকে দীনের উপর উঠাই, আহলে হাদিসরা সেগুলোকে মেহনত থেকে সরিয়ে আহলে হাদিস বানিয়ে ফেলে। কী করব? বের করে দেব? স্যার জানালেন, তোমরা হকের মেহনত করতে থাকো। আল্লাহ চাইলে তারাও তোমাদের সাথে দাওয়াতে অংশ নেবে। এরপর আমরা শান্ত হলাম। ঠিকই আমাদের আহলে হাদিস ছোটভাই ইয়ামিন ফাইনালের পর ২৮ দিন সময় দিয়ে এলো চিল্লায়। এমন শত্রুভাবাপন্ন আমাকে তাবলীগ বানায়নি। কিন্তু তারপরও আমি ডা. জাকিরকে ইহুদীদের দালালই ভাবতাম, যদিও তাঁর ৮০% ইংরেজি লেকচার আমার তাবলীগের আগেই শোনা। সালাফীদেরকে ইহুদীদের দালাল ভাবতাম। এতো পরিমাণে শুনেছি। অবশ্য আহলে হাদিস আলিমরাও প্রথমদিকে মাজহাব ও আবু হানিফাকে নিয়ে যা শুরু করেছিল তাতে দেওবন্দী আলিমদেরও দোষারোপ কেউ করতে পারবে না, যদিও এখন অনেকটাই শান্ত পরিস্থিত।

এরপর আরও বইপত্র পড়া শুরু করলাম। হাতের কাছে যা পেলাম। বুঝলাম, আহলে হাদিসরা আসলে অনুসরণ করে সৌদি সালাফী আলিমদের। এবং তারা যা করে এবং যে আকীদা আল্লাহর ব্যাপারে রাখে, সেটাও ইসলামেরই আরেকটা মত। এতদিন ইসলাম বলে যেটুকু জেনেছি, ইসলাম এর চেয়ে বিশাল। তারা ইহুদীদের দালাল না, বরং তারাও মুসলিম আমারই মত। এতদিন নামায যেভাবে পড়েছি, এটা সহীহ। সেই সাথে আরও অনেকরকম নামায পড়া যায়, সেগুলোও সহীহ। তাদের আমলগুলো নিয়ে হাসাহাসি করেছি, এগুলোও ইসলামের আলিমগণেরই আরেকটা মত, গোমরাহী না, আহলুস সুন্নাহ থেকে বাইরে না। তাহলে এতদিন কী শুনলাম, কী জানলাম?

জামাআতে ইসলামীকে পুরোপুরি ভ্রান্ত জেনেছি। জামাতী কারো সাথে মেয়ে বিয়ে দেয়া যাবে না। জামাতী ইমামের পিছে নামায পড়তামনা। শিবিরের যে দু’একটা ছেলে হোস্টেলে থাকত ছদ্মবেশে তর্কে লিপ্ত হতাম। ছাত্রলীগ আগেই হোস্টেল থেকে শিবির বের করে দিয়েছিল। কিছু ছেলেকে তাবলীগের শেল্টারে হলে রাখতে পারতাম, করিনি। ওরা ভ্রান্ত মওদূদীর অনুসারী। তাফহীমুল কুরআনের এক পারা বাসা থেকে সরিয়ে ফেলেছিলাম। মওদূদী আলিম না, গোমরাহ, সাহাবাবিদ্বেষী, নবীবিদ্বেষী। এখন পড়েশুনে দেখি, ঘটনা তো যেমন শুনেছি তেমন তো না। তাঁর ইলমের সনদও আছে, এক মাদ্রাসা থেকে না, ভিন্ন ভিন্ন উস্তাদের কাছে। নবীদের সম্পর্কে তিনি সগীরা গুনাহ-সহই তাঁদেরকে নিষ্পাপ মনে করতেন। এটাও একটা মত যে, নবীরা মাঝে মাঝে সগীরা গুনাহ বা সিদ্ধান্তগত ভুল করেছেন (তাঁরা ফেরেশতাদের মত নির্ভুল নন), আল্লাহ তাঁদের সেইটুকু মাফ করে দিয়েছেন, এগুলো সহই তাঁরা মাসুম। তাহলে এই আকীদার জন্য তিনি গোমরাহ হবেন কেন? এটা তো আহলুস সুন্নাহরই আরেকটা আকীদা। মুয়াবিয়া রা. এর শানে বেয়াদবির জন্য তিনি গোমরাহ? রাজতন্ত্র তো ইসলামে জায়েয, যেমন আমরা পরবর্তী খলিফাদের ক্ষেত্রে দেখেছি। তিনি ইজতেহাদী ভাবে নিজ ছেলেকে মনোনীত করেছে। তিনি তো নাজায়েয কোন কাজ করেননি। আর শিক্ষার নির্যাস গ্রহণের জন্য সাহাবাদের কর্মপদ্ধতি নেগেতিভ-পজেটিভ আলোচনা করার কি অনুমতি নেই? ইজতেহাদী ভুল সহই সাহাবারা উম্মাহর আদলের মাপকাঠি। এটা বিশ্বাস করার জন্য কেউ গোমরাহ, তাদের পিছনে নামায হবে না? তাহলে এতদিন ওয়াজ-মাহফিলে কী শুনলাম, আর এখন কী পড়ছি?

এখন ওয়াজ মাহফিলে আরেকজনের নাম খুব উঠে আসছে। আমি একজন জাহেল হিসেবে, মূর্খ হিসেবে হাতের কাছে যা যা পেয়েছি, প্রত্যেকটাতে ওনাদের অভিযোগ অসত্য পাচ্ছি। আপনাদের যাদের যাচাইয়ের যতটুকু ক্ষমতা আছে, আপনারা যাচাই করুন। বাংলায় অনূদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশানের আসহাবে কাহাফের ইতিবৃত্ত বইয়ে আমি পেয়েছি।

মাআরেফুল কুরআনে আমি পেয়েছি। যতটুকু বাংলায় অনুবাদ হয়েছে, ততটুকু তো দেখুন। হতে পারে সেই ব্যক্তি এদেশে প্রচলিত ব্যাখ্যা রেখে ভিন্ন কোন ব্যাখ্যার কথা বলছে। কিন্তু সেটাও তো আহলুস সুন্নাহরই আরেকটা মত। এজন্য তো তাকে গোমরাহ আর ইহুদীদের দালাল বলা যায় না। একই অপবাদ, একই লুকোছাপা। যে কেউ ওনাদের কথা শুনে নিজের সাধ্যমত যাচাই করতে গেলেই বুঝে যাবেন, কীভাবে একমাত্র নিজের মতকেই ইসলাম বলে দাবি করে ইসলামেরই আর সব মত আর সব ব্যাখ্যাকে আহলুস সুন্নাহ থেকে বের করে দেয়ার এক প্রবণতা।

শত শত মাহফিলে শুনেছি, মিলাদ বিদআত। কিন্তু খলীল সাহারানপুরী রহঃ এর দেওবন্দী আকীদার মাস্টারপিস ‘আল-মুহান্নাদ’-এ আমি নিজে দেখলাম, মওলুদ শরিফ (নবীজীর জন্মবৃত্তান্ত পাঠ) সওয়াবের কাজ। বেরেলভীদের নূর সম্পর্কিত আরও আকীদা বাজে আছে। কিন্তু তারপরও তো আহলুস সুন্নাহর বাইরে না। এ কেমন এক গোমরাহ গোমরাহ খেলা? আমার মত তো আরও তরুণ আছে যারা দুই দিকের ইনফরমেশান তুলনা করে এমন কনফিউজ হয়ে গেছে। এখন এতোদিন পর আবার উঠে এসেছে কাদিয়ানি ইস্যু, কেউ কেউ যদি এই ব্যাপারে ওনাদের উপর আস্থা রাখতে না পারে, সে দায় কাদের বলুন। একটা সময় তো কাদিয়ানিরা যে কাফির, এ ব্যাপারে কোন সংশয়ই ছিল না। এখন আহলে হাদিস, জামাতী বা সাদপন্থীরা যদি ভাবে যেরকম তাদের আদর্শের সাথে করা হয়েছে, কাদিয়ানিদের সাথেও তা-ই করা হচ্ছে কি না। তখন কী করণীয়। আস্থা আর আগের মত নেই, তাই কী?

কাউকে দোষারোপ না, সে যোগ্যতা নেই। একটা মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করলাম, নিজের প্রেক্ষিতে। জাকির নায়েক, সাইয়েদ মওদূদি আর মাওলানা সাদ— এনাদেরকে পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী চিন্তাধারা ভ্রান্ত মনে করে। পৃথিবীর আরও বহু আহলুস সুন্নাহ চিন্তাধারা তাদের গোমরাহ মনে করে না। সুতরাং আমিও তাদের ভ্রান্ত মনে করি না। তবে কাদিয়ানি ইস্যুটা ভিন্ন। সারা দুনিয়ার বিভিন্ন চিন্তাধারার ইজমায় (সর্বসম্মতিক্রমে) কাদিয়ানিরা কাফির। যারা

কনফিউশানে আছেন, ক্লিয়ার হয়ে নেন। অন্যান্যগুলোর মতো এটা না। সুতরাং ইসলামের নামে মানুষকে কাফির বানানোর এই ষড়যন্ত্র মোকাবিলা শুধু দেওবন্দী উলামায়ে কিরামের দায়িত্ব নয়। আহলে হাদিস, বেরেলভী, জামাআতে ইসলামী, সাদপন্থী সহ প্রত্যেকের উম্মাত হিসেবে দায়িত্ব এদের প্রতিহত করা, যার যার অবস্থানে। আমাদের নবী তো একজনই, তাঁর কাছে কী জবাব দিবেন বলেন?

https://islamqa.info/en/answers/4060/qadianiyyah-in-the-light-of-islam [সালিহ আল-মুনাজ্জিদ]

http://www.muftiselangor.gov.my/en/services/moon-observation/85-fatwa/akidah/88-pindaan-fatwa-tentang-ajaran-ahmadiah-qadiani [malaysia]

http://www.khatmenubuwwat.org/media/File/fatawas/fatwa_al_azhar.pdf [আল-আযহার]

http://alhafeez.org/rashid/rabita.html [রাবেতার সমন্বিত ফতোয়া]

মরচে-পড়া আগুন
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2019

ইতিহাসের সবচে বড় শিক্ষা এটাই যে, ইতিহাস থেকে কেহ শিক্ষা নেয় না। আমরাও নিইনি। আমাদের কিছু অস্ত্র ছিল, ফেলে রেখে রেখে জং পড়ে গেসে-- কুরআন, দুআ, পরামর্শ, ইস্তিখারা; এলাহী মদদ পাওনের লাইগ্যা। ব্যাপকভাবে সমাজ থেকে এসব চলে গেছে। উলামায়ে কেরাম ছাড়া এসব অপ্রচলিত হয়ে গেছে। আরেকটা অস্ত্র আমরা ফেলে রেখেছি বহুকাল।

ইসলামী আদর্শ আর রাব্বের মদদ থেকে আমাদের সরাইতে ক্রুসেডীয় বুদ্ধিজীবীরা আমাদের সমাজে ২ জিনিস ঢুকায়ে দিসে। আখিরাতের

ব্যপারে উদাসীনতা আর দুনিয়ার মহব্বত। আর এই দুটে জিনিস ঢুকানের সিরিঞ্জ হিসেবে ব্যবহার করেছে নিজেদের নারীদের। খলীফাদের উজির টুজির আর লোকাল প্রশাসকদের দেখলে এটা পাবেন আপনি। মদ-মিউজিক-সাদা চামড়ার ককেশীয় নারী। হালের গাদ্দাফিরও নাকি ইউক্রেনীয় সুন্দরী নার্স ফ্যাসিলিটি ছিল। ইয়াসির আরাফাতের বিবি ইহুদী, খোঁজ নিলে দেখলে অনেক মুসলিম শাসকের বা উজির লেভেলের লোকজনের বিবি ইহুদী- খ্রিস্টান পাইবেন। নতুন কিছু না, এগুলো সেই ক্রুসেড পরবর্তী য়ুরোপীয় কৌশল। যেমন উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে উপমহাদেশে আলিমগণ ময়দান থেকে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলার কৌশল নিয়েছেন। ক্রুসেডাররাও পর পর ক্রুসেডে হেরে ডিফেন্সে খেলেছে। ব্যবহার করেছে নিজেদের মেয়েদের। মুসলিমরা ওদের দেশ জয় করেছে, ককেশীয় মেয়েদের দাসী হিসেবে মুসলিম রাজধানী সহ অন্যান্য শহরে নিয়ে গেছে। সংগীত-নৃত্য-কামকলায় পটিয়সী মেয়েগুলো মনোরঞ্জনের মওকায় অথর্ব মুসলিম শাসকদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাদের প্রভাব অন্দরমহল ছেড়ে অফিস পর্যন্ত যখন পৌঁছেছে, তখন রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণেও তার ছাপ পড়েছে। আমরা সব হারিয়েছি।

তাতারীরা যখন মুসলিমদের কচুকাটা করছিল, মুহাদ্দিসদের মাথা দিয়ে টাওয়ার ডেভলপ করছিল। আমাদের মেয়েদের দাসী হিসেবে ভোগ করছিল। ১২১৮ তে শুরু, ১২৬০ এ আইনে জালুত যুদ্ধে তাতারদের পরাজয়। পরাজয়ের কারণ হিসেবে ইতিহাস বলে, তাতারীদের একাংশ আইনে জালুত যুদ্ধে অংশ নেয়নি যারা ছিল বারাকা খানের কমান্ডে। এই বারাকা খান নাকি মুসলিম হিসেবেই বড় হয়েছিল। এমনকি তার পুরো আর্মি ইসলামে প্রবেশ করেছিল আইনে জালুতের আগেই। এবং আইনে জালুতের যুদ্ধে রুকনুদ্দিনের হাতে হালাকু খানের পরাজয়ের ৩ বছর পর এই বারাকা খানের হাতেই ককেশাসে আবারও হালাকু খান পরাজিত হয়। যারা ইসলাম ধ্বংসের জন্য এসেছিল, তারাই ইসলামের রক্ষক বনে গেল। বলেন তো ইসলামের এমন দুর্দশায় কী অস্ত্রে মাত্র ৪০ বছরের মধ্যেই এই অংশের তাতারীরা মুসলিম হয়ে গেল? কোন মেহনতে হালাকু খানেরই বংশধর বারাকা খান অন্দরমহলে বেড়ে

উঠল মুসলিম হয়ে? মাদ্রাসা-খানকাহ-তাবলীগ- কিতাল? কীভাবে তার পুরো আর্মি চলে এলো ইসলামে? ইতিহাস উত্তরে বলে, তাতারীদের ঘরে ঘরে দাসী হিসেবে আমাদের মেয়েরা গিয়ে থেমে থাকে নি। তাতারীদের সন্তানদের উপর মেহনত চালিয়েছে, তাতারীদের কাছে তুলে ধরেছে ইসলামের সৌন্দর্য। তারা ছিল মূল নিয়ামক এদের ইসলামে প্রবেশে। হায়, আমাদের অস্ত্র।

যুগ পরিবর্তনের অস্ত্র এই নারীসমাজ। আমরা চিনতে পারিনি আবারও।

- ইসলামকে স্বর্ণযুগ থেকে টেনে নামিয়েছে কাফিরদের নারীরা,

- তাতারী ধ্বংসস্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মত আবার স্বর্ণযুগের জন্ম দিয়েছে আমাদের নারীরা,

- এখনো পুঁজিবাদী সভ্যতা আমাদের নারীদেরকে কিছু শব্দের টোপে ফাঁদে ফেলে পোষ মানিয়ে দীনের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করছে।

আজ শত বছরের অবহেলায় দীনের এই মহাস্ত্রেও পড়ে গেছে মরচে, হয়ে গেছে ভোঁতা। কুফফারের ফাঁদে পড়া পাখিদের কথা বাদই দিলাম। আমাদের প্র্যাক্টিসিং অংশে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারেও কী আমরা সিরিয়াস? পুঁজিবাদ ‘নারীশিক্ষা’ টোপ দেবার সুযোগ পেল কীভাবে? আমরা আমাদের নারীদের কত শত বছর কেবলমাত্র এবং কেবলমাত্র রান্নাঘরে আটকে রেখেছি? মেয়েদের কেবল কুরআন পড়তে পারা, আর কিছু হিসেবনিকেশ শেখানোর মধ্যেই ক্ষান্ত দিয়েছি। আমাদের দাদীনানীদের দিকে তাকান, যখন পুঁজিবাদের ধোঁকাবাজি এতো ছড়ায়নি, তখনকার মেয়েদের শিক্ষার অবস্থাটা দেখুন। বেগম রোকেয়া সরাসরি অনেক জায়গায় ইসলামকে আক্রমণ করেছে, এতে সন্দেহ নেই। তবে সেসময় নারীদের শিক্ষিত করারা প্রবণতা উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে আসলেই ছিল না, এটা তো আর মিথ্যে না। সেসময়ের যে সমাজচিত্র সে এঁকেছে তা তো মিথ্যে না। এখানেই

পুঁজিবাদ বেগম রোকেয়াকে ব্যবহার করে স্বার্থসিদ্ধি করেছে। খানদানি আলিমদের পরিবারের চিত্র ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত অ-আলিম মুসলিম পরিবারগুলো মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন ছিল, এটা অস্বীকার করার মত না।

ছেলের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে মেয়েদের শিখান। বর্তমান জেনারেল শিক্ষার ফরম্যাট ছেলেদের জন্যই নিরাপদ না। আমি দীন মানতে চাওয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলছি। দীনের কোন মূল্য যাদের কাছে নেই, বা ‘দীনের ক্ষতি হয় হোক, মানুষ যেন ভালো বলে’— জাতীয় চিন্তাভাবনা যারা করি তাঁদের জন্য এই লেখা নয়। আমি আবার বলছি বর্তমান জেনারেল শিক্ষার ফরম্যাট, সিস্টেম ও কারিকুলাম আপনার ছেলের ঈমান-আমলের জন্যই নিরাপদ নয়। আমরা বাঘের মুখ থেকে ফিরেছি, তাই বলে আমাদের সন্তানদেরও বাঘের মুখে পাঠাতে পারি না। আবার সবাই ছেলেকে মাদরাসায় পড়িয়ে আলিম বানাবো, এমন অবস্থায় আমরা যাইনি, সমীচীনও নয়। ছেলেদের শিক্ষা নিয়ে আজ বলবো না, আরেকদিন ইনশাআল্লাহ। এখন মেয়েকে কোথায় পড়াবেন, তাই তো?

ক.

আগেই বলে নিয়েছি, বর্তমান জেনারেল শিক্ষার ফরম্যাট-সিলেবাস-সিস্টেম-পরিবেশ কোনকিছুই আমাদের প্র্যাক্টিসিং মুসলিম পরিবারের মেয়েদের জন্য আমি নিরাপদ মনে করি না। হোক সেটা গার্লস স্কুল-ই, সেখানেও পুরুষ টীচার থাকে, পুরুষের কাছে কোচিং করতে হয়, ব্লা ব্লা। সিলেবাসে পুঁজিবাদ, সেকুলারিজম, নারীবাদ, প্রকৃতিবাদ ঠাসা। কয়েক শর্তে আমরা মেয়েদের জেনারেলে দিতে পারি—

- যদি তেমন ‘নারী ফ্যাকাল্টিওয়ালা’ স্কুল পাওয়া যায়

- যদি কোচিং করতে না হয় পুরুষের কাছে

- যদি নিজে সময় দিয়ে সিলেবাসের বদদীনিটুকু ক্লিয়ার করতে পারেন

- যদি দীনি শিক্ষার ব্যাপারে পরিবারের ভিতর এক্সট্রা কেয়ার নিতে পারেন

- অবশ্যই অনাবাসিক। কেন, সে ব্যাপারে পরে আসছি।

‘মেয়ে বিবাহ-শাদীর আগ পর্যন্ত তার মায়ের চোখ থেকে আড়ালই হবে না’— এক সাথী বলেছিলেন। কোন আলিমের মুখে শুনেই বলেছেন। আমি মানতে পারিনি। আজকে ২ মাসের বাচ্চা থেকে নিয়ে ২৫ বছরের যুবতী ধর্ষণ হচ্ছে। আজকে বুঝে এসেছে সেই কথার বাস্তবতা।

খ.

মাদ্রাসা শিক্ষা আরেকটা অপশন। সমস্যা হল, মাদ্রাসা শিক্ষাটা বিশেষভাবে আবাসিক। সমস্যাগুলো বলছি—

- মেয়েরা প্রচণ্ড পরিমাণে মুতাসসির (প্রভাবিত) হয়। সেটা ভালো হোক, বা খারাপ। ছেলেদের সাইকোলজির ইগো/ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ/পুরুষসুলভ প্রতিযোগী মনোভাব ছেলেদেরকে একটা নির্দিষ্ট লেভেলের পর আর কারও দ্বারা প্রভাবিত হতে দেয় না। আর মেয়েদের স্বভাবসুলভ পরনির্ভরতা/কমনীয়তা/সহযোগী মনোভাবের কারণে তাদের রেজিস্ট্যান্স কম, দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। এজন্য আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থাটা মেয়েদের জন্য নিরাপদ না। একজন মেয়ে বখে গেলে তা দ্রুত আর দশজনকে নষ্ট করে দেয়। এজন্য বহু উলামায়ে কিরামও মেয়েদের আবাসিক মাদ্রাসার বিরুদ্ধে। আমার স্বল্পজ্ঞানে এর বিরুদ্ধে ফতোয়াও আছে। অনেক উলামায়ে কিরামকেও আমি দেখেছি মাদ্রাসাপড়ুয়া মেয়ে বিয়ে করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেছেন। এসব কারণে।

- আরেকটা সমস্যা আমি বেশ ক’জন যুবক আলিমের কাছে শুনেছি, স্বামীকে মানার ব্যাপারে কিছুটা ব্যত্যয় দেখা যায়। এর কারণ হতে পারে সেই ‘ভুল সোহবত’। আরেকটা কারণ এটা হতে পারে, আবাসিক পড়াশুনার ফলে পরিবারে না থাকার কারণে পারিবারিক কৌশল-আবেগ-সংস্কৃতি সম্পর্কে অভ্যস্ত না থাকা। একটা পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে বন্ডিং- সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাওয়া। যদিও এটা ঢালাও কোন কথা নয়। বহু ব্যতিক্রম আছে।

- আরেকটা সমস্যা। আমার ভায়রা তাঁর ৫ বছরের মেয়েকে কোথায় দেবেন খুব পেরেশান ছিলেন। তাঁর প্রধান উদ্বেগ ছিল, মাদরাসায় উস্তাযরা বাচ্চাদের প্রহার করেন। ছেলে বাচ্চাকে প্রহার করায় তাঁর আপত্তি নেই। কারণ ছেলেদের না মারলে আসলে হয় না। কিন্তু মেয়েদের মারার অতটা প্রয়োজন পড়ে না। এমনকি উনি বলেন, আমার মেয়ের গায়ে আমি নিজেই হাত তুলি না, অন্য কেউ কেন তুলবে। আমি একমত, বাবাও মেয়ে শিশুকে প্রহার অনুচিত বলেই আমি মনে করি। অন্য কারণ আছে। আরেকদিন বলব। মেয়েদের তো চোখ গরম করলেই হয়, মারা লাগে না।

আলিমগণ আমাদের জেনারেল শিক্ষিতদের জন্য কী ব্যবস্থা নেন, এজন্য অপেক্ষা করার সময় নেই। উনারা আরও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে নিয়োজিত। ফলে আমাদের সমস্যার সমাধান আমাদেরকেই করতে হবে। আপাতত, অনাবাসিক রেখে যতদিন মেয়েকে মাদ্রাসায় পড়ানো সম্ভব, পড়ান। (উপরের ক্লাস গুলোতে সম্ভব না) নিজে নিয়ে যান, নিয়ে আসেন।

গ.

ঢাকায় অনেক মহল্লায় দীনি ভাইয়েরা এই কাজ করেছেন। নিজেরা একটা বাসা ভাড়া করে, উস্তায নিয়োগ দিয়েছেন। কাছাকাছি বয়েসের মেয়ে বাচ্চারা পড়াশুনা করছে। আমার ভায়রা মুহতারামের বিল্ডিং-এর উপর তলায় একটা মাদ্রাসা করেছেন। সকালে একজল উস্তাযা আসেন, ২ ঘণ্টা

পড়ান। সন্ধ্যায় একজন উস্তায আসেন। ৬-৭ টা বাচ্চা পড়ে। কারিকুলামও নিজেদের মতো করা, খুব সম্ভব সৌদি মাদ্রাসার কারিকুলাম। আপনারাও উলামায়ে কিরামের পরামর্শে এমন সেট-আপ করে নিতে পারেন। ঘরোয়া পরিবেশ হবে না, ফুল একাডেমিক পরিবেশ করে দেবেন। পরিবেশই তো দরকার, দেখতে যেন মনে হয় একটা মাদ্রাসা। সিলেবাস বানান—

বাংলা দ্রুতপঠন, ইংরেজি, আরবি, ফিকাহ, হাদিস, ভূগোল, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, বিজ্ঞান, অংক, স্বাস্থ্যশিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, হিসাবরক্ষণ, বাগাইরা বাগাইরা। দশ-পনের বছরের কোর্স বানান। ঐ ঐ বিষয়ের ছাত্রী পেয়ে যাবেন শিক্ষিকা হিসেবে।

সময় নাই, বলবেন না। সময় নাই মানে আপনার ‘প্রায়োরিটি লিস্টে’ নাই।
এটাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে। এটা সমাজবিপ্লবের অস্ত্র, জং ধরা।
শানাতে হবে। মানুষ করছে পারছে, আপনিও পারবেন, আপনারাও পারবেন।
ইনশাআল্লাহ।

ঘ.

এডাল্ট মেয়েরা যারা দীনের উপর চলতে চায়, তাদের জন্যও ব্যবস্থা চাই। সালাফী ভাইয়েরা ‘অনলাইন ইসলামিক ইউনিভার্সিটি’ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। অনেক বোন-ভাই শিখছেন। উলামায়ে দেওবন্দের পক্ষ থেকেও হোক। জামাআতে ইসলামীর পক্ষ থেকেও হোক। দীন শিখুক।

তাবলীগের ‘মাস্তুরাতের মেহনত’ দারুণ ফলপ্রসূ। এখানে দিনের মোটা মোটা জিনিস শেখার সাথে সাথে দীনী জীবন দেখেও আগ্রহ আসে দীন মানার। কারো মাঝে ‘আগ্রহ’ জাগাতে এটা খুব ইফেক্টিভ। তবে একটা সীমিত লেভেল অব্দি শেখা যায়, বেশি শেখা যায় না।

ছাত্রীসংঘের একটা মজবুত মেহনত ছিল ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে। এখন বন্ধ হয়ে গেছে মনে হয়।

এখন বাংলায় বহু সালাফদের কিতাব অনূদিত হচ্ছে। বাসায় লাইব্রেরি করে ফেলুন। মা-বোনেরা শিখুক। জং সরুক, অস্ত্র শানুক।

ছোট মুখে অনেক বড় বড় কথা বলে ফেললাম। দ্বিমত করা তো খারাপ কিছু না। খারাপ হল আরেক মুসলিমকে কষ্টদায়ক কথা বলা। এতা ফেসবুকে খুব হয়। আরেকজনকে বোল্ড করতে পারলেই রাজা। হন রাজা, আমার গা নেই। আসলে স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি তো। স্বপ্ন দেখে যাই। গোস্তাকি মনে হলে মাফ করে দিবেন। আমার হিদায়াতের জন্য দুআ করবেন। শাইখ আশরাফ আলী থানভী রহঃ বলেন, কিছু সংখ্যক মেয়েকে রীতিমত শিক্ষিত করে তুলতে হবে, যাতে তারা অন্যান্য মেয়েদের শেখাতে পারে। (‘নারী জাতির সংশোধন’ কিতাবে) আর অস্ত্র ফেলে রাইখেন না। আসেন আমাদের মেয়েদের এক একটা উস্তাযা হিসেবে গড়ে তুলি। প্রত্যেকেই যেন নিজ সন্তানদের মুসলিম করে গড়ে তুলতে পারে। আল্লাহ না করুক কোনদিন যদি কাফেরের হাতেও পড়ে, তাতারীদের মত কাফেরও যেন ইসলামের খোঁজ পেয়ে যায়। এরকম করে আসেন আমাদের মেয়েদের শাণিয়ে তুলি। অনেকে ভয় পায়, মেয়েদের বেশি শেখালে বেয়াদব হয়ে যায়। একদম ভুল। । জ্ঞানী-গুণী নারী স্বামী সোহাগিনী এবং বিনীত হবারই কথা। কেননা ‘ফলবান বৃক্ষ তো নতমুখীই হয়’ আর ‘ফাঁকা কলসিই বাজে বেশি’। তাই কলসি ভরিয়ে দেন। ইলমে-জ্ঞানে।

তাহলে আর দেরি কেন, কোমর বেঁধে শান দিতে লেগে যান।

বিপ্লবের মারণাস্ত্রে।

যুগ বদলানোর মহাস্ত্রে।

সমর্পিতার স্বাধীনতা কিংবা স্বাধীনতার সমর্পণ
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·SATURDAY, FEBRUARY 23, 2019

(এক)

মুক্তমনা, মনখানা মুক্ত যার, বাঁধনহারা— কত সুন্দর লাগে শুনতে, পাখির মত উদ্দাম স্বাধীনতা। আচ্ছা পাখি কি স্বাধীন। উড়তে তো দেখি মুক্তভাবেই, কিন্তু পাখি কি মুক্তমনা? খাবার খোঁজা, সন্তানের জন্য বাসায় নেয়া, দিন শেষে ফিরে আসা— এসব চিন্তায় কি ও আবদ্ধ? লক্ষ্যহীন মুক্ত কি ওর জীবন, নাকি বদ্ধ কোন অমোঘ নিয়মে?

ভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারটা ওড়ার মৌসুম। সবাই ওড়ে। পাখা গজায়, ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে ওড়ে। ভিকারুন্নিসার ডাকসাইটে এক্সট্রোভার্ট মেয়ে তিথি-তে বুঁদ হয়ে আছে ঢাবি’র পুরো জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট। উপস্থাপনা, গান, ক্লাস প্রেজেন্টেশন, লেখালেখি, রেজাল্ট। স্যার-ম্যাডামরা পাগল, ক্লাসমেটরা পাগল, আর ভার্সিটির বড়ভাইয়া প্রজাতিটা চিরকাল ধরে পাগলই থাকে। প্রথম দু’তিনটে সেমিস্টার এভাবেই গেল। বন্ধু-আড্ডা-গান, হারিয়ে যাও। তিথি হারিয়ে যায়।

পরিবার বলতে ওর শুধুই বাবা। মা মারা যাবার পর ওর বাবা আর বিয়ে করেননি। রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। তিথি সবার ছোট। ওর বয়স যখন দশ

তখন মা ক্যান্সারে মারা যান, মায়ের স্মৃতিগুলো তাই একটুও ফিকে না। ওর বড়ভাইও আর্মিতে, পোস্টিং রাজেন্দ্রপুর। আর ছোটভাইয়া অস্ট্রেলিয়ায় গেছে পড়তে। আইয়ুব খানের মত গোঁফে বাবাকে কত সুন্দর আর গম্ভীর লাগত, বাঘের মত। ইদানীং বাবা আর শেভ করছেন না, অন্যরকম লাগে। অবশ্য বয়স হয়েছে তো, বয়স হলে মানুষ দাড়ি রাখে, বোরকা পরে, হজে যায়। বিষয়টা স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিল তিথি, কিন্তু বাবা এখন দেখা হলেই,

- তিথি মা, নামায পড়েছিস?

- না, বাবা।

- তিথি মা, এখন কোথায় বের হচ্ছিস? নামায পড়ে বের হ’।

- বাবা, এসে পড়ব।

বাবা ওকে কখনও কিছু বলেছে কি না ওর মনে পড়ে না। মা-মরা মেয়ে। আদরে আদরে মানুষ। বাবা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কিচ্ছু বলে না। মা মারা যাবার পরই বাবা স্বেচ্ছায় অবসরে যান। তিথি আর ছোটভাইয়া তখন আর কতটুকু। বড়ভাইয়া ক্যাডেটে পড়ত বলে বেশি দেখভাল করতে হয়নি। কিন্তু পরের দুটোকে খাওয়ানো, গোসল করানো, পড়ানো, ঘুরতে নিয়ে যাওয়া, কেনাকাটা সব বাবা একলাই করতেন, ওদের দেখাশোনার জন্যই রিটায়ারমেন্ট নিয়েছিলেন। বাবাকে কষ্ট পেতে দেখলে তাই তিথির ভেতরটা চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু কী করবে? নামায পড়তে একদম ইচ্ছা করে না, বাবাকে কষ্ট পেতে দেখলে মনে হয় আজ থেকেই পড়ব, কিন্তু হয়ে ওঠে না। সেদিন তিথি ভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে। গলা খাঁকারির শব্দ।

- তিথি মা, আসবো?

- ‘এসো বাবা’। মায়ের অনেক কিছুই পেয়েছে মেয়েটা, তার মধ্যে একটা হল চুল, এত্ত মোটা একটা বেণী হচ্ছে।

- ‘একটা কথা রাখবি?’ বাবা এমন করে কক্ষনো বলে না, তিথি বাবার সাথে দূরত্ব টের পায়। কতদিন বাবার সাথে একটু গল্প করা হয় না।
ভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর থেকে খাওয়ার টেবিলেও খুব একটা একসাথে হওয়া হয় না।

- বলো বাবা।

- ভার্সিটি থেকে আজ একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারিস? তোকে এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবো।

- ‘কখন যাবে?’ বেড়ানো ওর নেশার মত। যাক এই সুযোগে আব্বুকেও কিছু সময় দেয়া যাবে।

- এই ধর তিনটের দিকে?

- ‘আচ্ছা বাবা,আমি দুপুরের আগেই এসে পড়ব’। অনেক দিন পর বাবার মুখটুকুতে খুশি দেখা গেল।

এ কেমন জায়গায় নিয়ে এলো বাবা ওকে। দুই গলি পরেরই একটা বাসা। কয়েক ফ্লেভারের আইসক্রিম কিনে দিয়ে তিথিকে বাসাটায় ঢুকিয়ে দিল বাবা। দরজা থেকেই ওকে যে দুটো মেয়ে রিসিভ করল, তাদের একজন বিদেশী। সালাম দিয়েই নীল-চোখো মেয়েটা কপালে চুমু দিয়ে তিথিকে বুকে জড়িয়ে নিল। চেনা নেই জানা নেই চুমু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে, যেন কতকালের চেনা। তিথি একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেছে বুঝতে পেরে সাথের দেশি মেয়েটা কমফোর্ট করল,

- ‘ভয় পেও না, ওদের দেশে এটাই নিয়ম, চুমু দেয়া’। অস্বস্তি ভাবটা দূর হয়ে যেতেই মুহূর্তে ওর মনে হল, এই বিদেশী সমবয়েসী মেয়েটাকে ও বহুকাল ধরে চেনে। যেন বহু শতাব্দি আগে কোন পাথুরে নদীর ধারে দুজনা একসাথে হেঁটেছে, পানি ছিটিয়েছে, অজানা কোন ভাষায় কতকাল গল্প করেছে।

- ‘মাসমুহা?’ দেশিনীর দিকে চেয়ে বিদেশিনীর ‘গহীন থেকে উঠে আসা’ প্রশ্ন।

- তোমার নাম কি গো? জিগেস করছে।

- ‘তিথি’। ভারি মজা তো।

- ইসমুহা তিথি।

- ‘তিতি। আনা যেইনাব’। বুকে হাত দিল নীলনয়না।

- ওর নাম যাইনাব, আর আমি নাদিয়া। ভিতরে এসো, আমার আব্বু বলেছিলেন তুমি আসবে।

একটা রুমে পাশাপাশি দুটো জায়গায় গোল হয়ে বসে মহিলারা কথা বলছে নিজেদের ভেতর। একজন বয়স্ক মহিলা বিদেশী ভাষায় কী যেন বলছে, মনে হল আরবি। আর পাশেরটায় একজন বাংলায় সেটা অনুবাদ করছে। তিথিকে নিয়ে যাইনাব বাংলাতেই বসল। পবিত্রতা অর্জনের উপর আলোচনা চলছে, মেয়েদের বিভিন্ন সময় যে পবিত্রতা অর্জন করার দরকার হয় সেগুলো, গোসল, ওযু। তিথি এগুলোতে খুব একটা খেয়াল নেই। ও বিদেশী মহিলাগুলোকে দেখছিল, এত্তোগুলা বিদেশী মানুষ। চোখে চোখ পড়ায় হাসি বিনিময় হল এক আধা নিগ্রো মেয়ের সাথে, অপূর্ব, কালো হলেও কী চোখ-নাক, কী হাসি। যাইনাব আর কালো মেয়েটা ছাড়া বাকিরা মধ্যবয়েসী। আরেকটা জিনিস খেয়াল করলো,

আরবি ভাষাটা বেহদ গর্জিয়াস, বিশেষ করে ‘হা’ আর ‘আইনে’র উচ্চারণ বাজে কানে-- গম্ভীর ও মধু্র, একই সাথে ।

একটু পরেই নাদিয়া ওকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এসেছে আরেক ঘরে।
সেখানে অয়েলক্লথের উপর একগাদা জিনিস— চকলেট, আইসক্রিম, কাজুবাদাম, খেজুর, ফিরনি।

- নাও গো, শুরু কর। বুঝেছি তোমার ভালই বিরক্ত লাগছিল ওখানে।

- না না, একদম না।

- ‘বাসায় বিদেশী জামাত এসেছে বুঝলে। যাইনাব সিরিয়ান। কালো মেয়েটা মারইয়াম সোমালি, আর বাকিরা জর্ডান আর ইয়েমেনের। যাইনাব এসেছে বাবার সাথে, বাকিরা স্বামীদের সাথে। পুরুষেরা আছে মসজিদে’। নাদিয়া পরিচিতদের মত কথা বলছে, ভূমিকা টূমিকা ছাড়া।

- আপনার বাসায় ওনারা মাঝে মাঝেই আসে?

- না না, ওদের সাথে আর কোনদিন দেখাই হবে না। বিদেশী মানুষরা আসে, দেশী মানুষরা আসে। আরে নাও না, তোমাকে তো খেতেই দিচ্ছি না কথা বলে বলে।

নাদিয়া আপু ঢাকা মেডিকেলে পড়ে ফাইনাল ইয়ারে। আপুও এক্স-ভিএনসি। হাবিজাবি প্যাঁচাল পাড়তে পাড়ে খুব। তবে একটা সম্মোহন আছে। খুব আপন হয়ে গেল তিথি। এর মধ্যে যাইনাব এসে একটা বাটিতে রেখে গেল ‘তীন’ ফল । যাইনাব মেয়েটার সাথে খুব কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু ভাষার কারণে বলা যাচ্ছে না। আপুর সাথে আরবিতে কী কী জানি বলে চলে গেল। আচ্ছা ও ইংরেজি পারে না?

- ক্যান ইউ স্পীক ইংলিশ, যাইনাব?

- ‘ইয়েস, বাৎ নৎ দ্যাৎ ফ্লুয়েন্ত, ইউ স্পীক স্লোলি, আই আন্দারস্ত্যান্দ ’। মিডল ইস্টার্ন উচ্চারণ, আল জাজিরায় শোনা যায় প্রায়ই। ইংরেজি অতটা ভালো পারে না, আস্তে আস্তে বললে বোঝে ।

রাজ্যের প্যাঁচাল হল এরপর। ওর বয়েস সতেরো। ওদের দেশে যুদ্ধ চলছে, ওর কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। বান্ধবীদের অনেকেই দেশ ছেড়ে তুর্ক মুলুকে, ইউরোপে চলে গেছে। আর ওরা চলে এসেছে গ্রামে। তিন ভাই আহরার আশ শামে, ওর পরে আরও দুই বোন। বাবা ওকে নিয়ে ২ মাসের জন্য এদেশে এসেছেন। আরেকটা কারণ আছে, যাইনাব অসুস্থ, কিডনীতে কী যেন সমস্যা। বড় ডাক্তার দেখানোও একটা উদ্দেশ্য। নাদিয়া আপুর কাছে শুনলো অসুখটা নাকি সারে না, লুপাস নেফ্রাইটিস বলে। যেতে ইচ্ছে করছে না তিথির, একদম না। মনে হচ্ছে সারারাত গল্প করা যেত মায়াবতী দুটোর সাথে, ভাঙাচুরা ইংরেজিতে।

সোমালি মেয়েটা ইংরেজি একদমই পারে না, শুধু এসে বড় বড় চোখ নিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে নাদিয়া আপুকে কি যেন জিগেস করছে। একমনে তিথি আর যাইনাবের কথা শুনছে, বুঝা যাচ্ছে যে ও কিছু বুঝছে না, শুধু চোখ দিয়ে মায়া বিলাতে এসেছে। ওদের সাথে আসরের নামাযও পড়ল তিথি। মাগরিব পর্যন্ত চলল আড্ডা।

বাবা নিতে এসেছে। নতুন অভিজ্ঞতা হল আজ। বিদেশী কারো সাথে এতক্ষণ কথা হয়নি আগে কখনো। যে কখনও ভিন দেশের ভিন কালচারের সাথে মেশেনি, সে গোঁড়া হয়, আত্মতৃপ্ত হয়। আর যার সুযোগ হয়েছে তার ভাবনা বাড়ে, চিন্তাক্ষেত্র প্রশস্ত হয়, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবার ফুরসত মেলে। আমি ছাড়া দুনিয়ায় আরো মানুষ আছে, যারা সবাই আমার চেয়ে ভিন্ন। তারা কেউই আমার মত করে ভাবে না, তাদের হাসি-কান্না-আবেগ-অনুভব কিছুই আমার মত না। তারাও মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। দুনিয়া ওদেরও, শুধু আমার একার না।

কাল দিনটা ওরা আছে, পরশু চলে যাবে অন্য এলাকায়।

(দুই)

পরদিন আর যাওয়া হয়নি তিথির। খারাপও লাগেনি তেমন একটা। অথচ কাল যতক্ষণ ওখানে ছিল, ছাড়তে ইচ্ছে করছিলো না।

জোবায়েদ ফেরদৌস স্যারের ক্লাস ছিল আজ। ইসলামে নারীর অবস্থান নিয়ে স্যার বেশ কড়া করে কিছু কথা বললেন। ইসলামে নারীর মর্যাদা একটা দাসীর চেয়ে বেশি না। নারীকে পরাধীন করে রেখেছে, নারীকে অশিক্ষিত মূর্খ বানিয়ে রেখেছে যাতে পুরুষ ডোমিনেট করতে পারে। ইসলাম একটা পুরুষতান্ত্রিক ধর্ম, পুরুষের তৈরি ধর্ম, সূরা নিসায় পুরুষকে বলা হয়েছে স্ত্রীকে মার দিতে— এসব। ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরা সিজিপিএ নিয়ে খুব উত্তেজিত থাকে, তাই কেউ প্রতিবাদ করল না। তিথির মনে হল কিছু একটা বলে, আবার মনে হল স্যারের কথায় অবশ্য যুক্তি আছে, ১৪০০ বছর আগে সমাজ তো এমনই ছিল, তাই এটাই তো স্বাভাবিক যে সেখানে আধুনিক নারীমুক্তির কনসেপ্ট থাকবে না, তাই না? মেয়েরা পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে সব ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এটা তো সেসময় চিন্তাই করা যেত না। তাই বিধানগুলোও সেই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়েছে, এ আর এমন কি।

হতে পারে যাইনাব-নাদিয়াদের ওর কাছে মনে হয়েছে- পশ্চাদপদ নারী । ওদের কাছে গেলে সেও পশ্চাদপদ হয়ে পড়বে— এমন কোন ভয় থেকেই পরদিন তিথি গেলো না হয়ত, হয়তো না। পরিবেশ... অনেক বড় জিনিস, না? জেনারেল শিক্ষিত লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে এই ডামাডোলে পড়ে ছটফটায়, স্রেফ পরিবেশের কারণে, স্রেফ পরিবেশ।

তবে স্যারের কথাগুলো যৌক্তিক মনে হলেও ডেলিভারিগুলো পছন্দ হয়নি। মনের ভিতর খচ খচ করছে। আসলে কি স্যার যেমন বলেছেন তেমনই, নাকি স্যার জানেন না বলে এমন বলেছেন, ভিতরে ঘটনা আলাদা। স্যারের তো ইসলাম বিশারদ না, তাই তার কথাগুলো যৌক্তিক মনে হলেও বিশ্বাস করার আগে নিজে যাচাই করা দরকার। কিছু মানুষ আছে, কীসের বিরোধিতা করে তা-ই জানে না। আমি যে একটা জিনিসের বিরুদ্ধে, সেই জিনিসটা সম্পর্কেও তো ক্লিয়ার থাকতে হবে, হাওয়ার বিরোধিতা করে তো লাভ নেই। এরা হলো হুজুগে, ‘প্রচলন’এর বিরুদ্ধে গেলে স্মার্ট হওয়া যায়, মানুষ ঘুরে তাকায়, ওয়াও। স্কুল-কলেজে তিথি তার্কিক হিসেবে যশস্বী ছিল। ভাল তার্কিক প্রতিপক্ষের লজিক-স্ট্যান্ডপয়েন্ট সম্পর্কেও ধারণা রাখে। ভাল বিচারক সে-ই যে দুপক্ষের শুনানি নিয়েই ফয়সালা করে। একপক্ষের কথায় সিদ্ধান্ত নেয়া বেইনসাফী-জুলুম। কেবল নাস্তিকমহলে না, হাইলি প্র্যাক্টিসিং মুসলিমরাও ভিন্ন মতের ক্ষেত্রে এই রোগে আক্রান্ত, কীসের বিরোধিতা করছে জানে না, একপেশে ধারণার উপর সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়। কার কাছে যাওয়া যায়... উমমমম... একজনই আছে... ইয়েস, দ্য নাদিয়া আপু। আপু জবাব দিতে না পারলেও জবাব দেনেওয়ালার খোঁজ দিতে নিশ্চয়ই পারবে।

- ‘স্বাধীনতা। স্বাধীনতা কি? স্ব প্লাস অধীনতা, নিজের অধীন, নিজের মনে যা চায়, যেমন চায় তা-ই করা। একেই স্বাধীনতা বলে। তাই তো?’ কফিতে ছোট করে চুমুক দেয় নাদিয়া। বৃষ্টি আর ধোঁয়া ওঠা কফি, সোহাগায় সোনা।

- ‘হ্যাঁ। আমার জীবন, আমি যেভাবে চাইব সেভাবে কাটবে, সেভাবে চলবে। কারো ইচ্ছেমত আমি আমার জীবন কাটাতে বাধ্য নই। আমি আমার অধীন’।
গলায় উত্তাপ।

- অবশ্যই প্রতিটা মানুষই স্বাধীন। প্রত্যেকের স্বাধীনতার অধিকার আছে। এটা কুরআনেও আছে। ‘ক্বদ তাবাইয়ানার রুশদু মিনাল গয়্যি...’

- ‘কিন্তু এই ইসলামই তো নারীকে পরাধীন করে রেখেছে, পুরুষের ইচ্ছার দাসী বানিয়ে রেখেছে। তাহলে ব্যাপারটা কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে গেলো না?’ আপুদের কাজের মেয়ে স্বর্ণা একটা ঝালমুড়ির বাটি খুট করে রেখেই পালিয়ে যায়, আরও কোন ফরমায়েশের ভয়ে মনে হয়।

- ওকে ফাইন, আই গট ইউ। আছো তো কিছুক্ষণ, না কি?

- ‘হুমমম। বাট মে বি, আপনি কি বলবেন তা আমি জানি’। মুড়ি-মাখানো হয়েছে আচারের তেল দিয়ে। বৃষ্টি-কফি-ঝালমুড়ি... গর্জিয়াসের মধ্যে গর্জিয়াস।

- হয়তো জানো, কিন্তু আমি কিভাবে উপস্থাপন করব তা বোধ হয় জানো না। তোমার বিচ্ছিন্ন জানাগুলোকে হয়ত এক সুতোয় গেঁথে দিব, যেই মালাটা গলায় দিয়ে তুমি ভাববে। আসলে আমরা ভাবি খুব কম। পড়ি, জানি, শুনি, বলি— কিন্তু ভাবি না। বাই দ্য ওয়ে, কুরআন একটা ভাবনার বই।
“চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন”-“তোমরা কি ভাবো না”। কুরআন আমাদের ভাবাতে চায়।

- ইন্টারেস্টিং। শুরু হোক।

- ‘নাও’, নাদিয়া একমুঠো তুলে নেয়, ‘কুরআন খুব স্পেসিফিক একটা জীবন দর্শন দেয়, কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই, গোলকধাঁধা নেই। পয়েন্টগুলো মনে রেখো।

● প্রথমত, বাই ডিফল্ট প্রতিটা মানুষ— সাদা-কালো, নর-নারী, বাচ্চা-বুড়ো সবাই স্বাধীন, স্ব ইচ্ছা অধীন। অনন্ত পরকালের কনসেপ্ট এই ‘ইচ্ছা’ নির্ভর। স্বেচ্ছায় যা করেছো তারই বিচার
হবে।
● দ্বিতীয়ত, কুরআন একটা দীন নিয়ে এসেছে। দীন এর সবচেয়ে
কাছাকাছি অর্থ হল ‘সিস্টেম’। দীনের অর্থ যদি তুমি ‘ধর্ম’ কর, তাহলে ইসলামের ৯০% জিনিস তুমি বুঝবে না, বাকি ১০% জিনিস ভুল বুঝবে। বাথরুমের ভেতর তুমি কি করছ এমন চরম পার্সোনাল লেভেলের

থেকে শুরু করে ফ্যামিলি ইন্টার্যাকশন, সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক, অর্থব্যবস্থা, বিচারিক সিস্টেম, প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। আমাদের পরিচিত নীতিমালা থেকে একদম ভিন্ন নীতির সমন্বয়ে একটা হলিস্টিক বা সামগ্রিক সিস্টেম হল দীন। কুরআন বলছে এই দৃশ্য-অদৃশ্যজগত যিনি বানিয়েছেন, এই জগতের নিয়মকানুনগুলো যাঁর শিল্প, তিনিই এই সিস্টেমটা পাঠিয়েছেন। ক্লিয়ার?’ তিথি ভুরু-টুরু কুঁচকে খুব মন দিয়ে শুনছে। এতো মন দিয়ে ক্লাস করেছে কিনা সন্দেহ। বিশেষ করে ইসলামের এই সংজ্ঞা তো একদমই নতুন। একটা প্রশ্ন আসছে। আপুর ফ্লো নষ্ট করা ঠিক হবে না।
● তৃতীয়ত, সৃষ্টিজগত নিয়মে চলে। তাই না? যেমন ধর তুমি আগুনে
হাত দিলে হাত পুড়বে, লাল হবে, ফোস্কা হবে, ভিতরে পানি জমবে,
ব্যথা হবে, একটা সময় ফোস্কার পানিটা আবার ভিতরে শোষণ হবে,
মরা চামড়াটা উঠে যাবে, একটা দাগ রয়ে যাবে, অনেকদিন পর দাগটা ও মুছে যাবে’, সেই হাতের মুড়িটা কেবল গালে গেল নাদিয়ার।

এই যে আগুনে হাত দেবার পরের সিকোয়েন্সগুলো একটা নিয়ম, বিধান।

তকদীর মানে শুধু ভাগ্য নয়, ভাগ্যের সাথে সাথে এর আরেকটা উপাদান হল

এই— বিধান, রুলস, ন্যাচারাল ল’। এমন ভাবে প্রতিটা ছোট ছোট বড় বড়

বিষয় বিধানমত চলে। যা আমাদের এখতিয়ারে নেই। যিনি এই ছোট ছোট বড় বড়

বিধানগুলো বানিয়েছেন, তিনি সিস্টেম/ দীনটা দিয়েছেন। কাইন্ড অফ

মেশিনপত্রের ম্যানুয়াল, এভাবে চালালে টিকবে বেশিদিন। এবং বলে

দিয়েছেন, কেউ যদি এই সিস্টেম অনুযায়ী চলে তাহলে এই পুরো বিধানমালা

(ন্যাচারাল ল’) তার অনুকূলে থাকবে, যা কিছু তার সাথে হবে ভালোই

হবে। সে এমন রশি ধরল যা ছিন্ন হবার নয়। সে পাবে হায়াতান তাইয়েবা

মানে পবিত্র জীবন, ক্বলবান সালীম বা সুস্থ হৃদয়, নাফসুল

মুত্বমাইন্নাহ বা তৃপ্ত অন্তর, রিযকুন কারীম মানে প্রশস্ত

অনুগ্রহ এবং মৃত্যু পরবর্তী নিঃসীম জীবনে রিদওয়ান, চিরসন্তুষ্টি,

চিরমুক্তি। অর্থাৎ পৃথিবী ও পৃথিবীর পরে সে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনা,

পৃথিবীতেও।

● আর লাস্টলি, প্রতিটা স্বাধীন মানুষ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিবে যে, সে এই সিস্টেমটা নিবে কি না, যা তার জীবনকেই
নিশ্চিন্ত, নির্ভাবনা করবে। নাকি সে এই সিস্টেমটা নিবে না,

ফলে তার জীবনও কঠিন হবে, পরজীবন হবে আরও কঠিন। সে কি
স্বাধীনভাবে নিজেকে পরাধীন করবে, নাকি সে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছার অধীনেই থাকবে। তাহলে কি কি পয়েন্ট বললাম?’

- সবাই বাই ডিফল্ট স্বাধীন। সবাইকে স্বাধীনভাবে একটা সিস্টেমে আসতে বলা হচ্ছে, একটা সিস্টেমের অধীন হতে বলা হচ্ছে। যেটা এসেছে এমন একজনের কাছে থেকে যিনি ন্যাচারাল ল’গুলোর স্রষ্টা। এবং বলা হচ্ছে যে এই সিস্টেমের অধীনে যদি তুমি চলে আসো তার মানে তুমি ন্যাচারাল ল’ এর অনুকূলে আসছো, যা তোমার পার্থিব জীবনের জন্য মঙ্গলজনক। এবং মৃত্যুর পরেও মঙ্গল আর মঙ্গল। আমি কেমন শ্রোতা?

- দারুণ। গত সেমিস্টারে ফার্স্ট হয়েছো তো? মিষ্টি পাওনা থাকলাম।

- কিভাবে জানলেন, আমি বলেছি?

- না, আন্দাজে ঢিল মারলাম, লেগে গেছে? বাহ। এনিওয়ে, আগে বাড়ি। ইসলাম পুরোপুরিভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রমোট করে। এবং এই ব্যক্তিস্বাধীনতাটুকুরই হিসাব নেয়া হবে হাশরের মাঠে।
প্রত্যেকেই তার নিজ কর্মের জন্য দায়ী হবে যা সে স্বেচ্ছায় করেছে।
যা অনিচ্ছায় করেছে তার জন্য ক্ষমা। সেদিন বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না, কেউ বলতে পারবেই না আল্লাহ আপনি বিচারে জুলুম করেছেন।
কেননা সে মেনেই নিবে যার জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তা সে স্বাধীনভাবেই বেছে নিয়েছিল। ইচ্ছে করেই করেছিল।

- হুমমম, মিলছে।

- ছন্দের মত, দুয়ে দুয়ে চার। কুরআন কেন নাযিল হয়েছে জানো তো।
মুফাসসিরগণ লিখেছেন, সূরা ফাতিহায় মানুষ আল্লাহর কাছে আবেদন জানাচ্ছে— ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকীম। আল্লাহ, আপনি আমাদের

আপনার কাছে পৌঁছবার ‘সরল পথ’ দেখান যে পথে অলরেডি সফল মানুষরা গুজরে গেছেন। এই দুআর জবাব হিসেবে আল্লাহ বাকি কুরআন নাযিল করেছেন। তোমরা যে ‘সরল পথে’র সন্ধান চেয়েছো, এই নাও। আলিফ-লাম-মীম। এই কিতাবে কোন সন্দেহ নেই, এটা মুত্তাকীদের জন্য, তাওহীদের আদর্শবাদীদের জন্য সরল পথের দিশা, হুদাল লিল মুত্তাকীন। যে সরল পথ পেতে চায়, এটা তার জন্য। এখন যে চায় না, এটা তার জন্য না। তুমি স্বাধীন, পছন্দ না হলে তুমি যা ইচ্ছে কর, নিজের জীবন নিজে কাটাও, হিসাব পরে নেব।

- তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, যে ইসলাম একটা নীতিমালা, সেট অব নর্মস। যে বোরকা পরে গরমের দিনে, এটা এজন্য না যে ঘরের পুরুষ তাকে পরতে বাধ্য করেছে। বরং সে নিজেই এই অধীনতাকে, এই নীতিমালাকে বেছে নিয়েছে স্বাধীনভাবে। এটা তার স্বাধীন চয়েস।

- রাইট, এই অধীনতা পুরুষের অধীনতা না। পুরুষ নিজেও অধীন, নারী- পুরুষ সবাই তাঁর অধীন।.... সে স্বাধীনভাবেই নিজেকে আল্লাহর অধীন করে দিয়েছে। আত্মসমর্পণ করেছে, ইসলাম। তুমি নিজের দেখাকে আমার দেখার কাছে সমর্পণ কর, তোমার শোনাকে আমার শোনার কাছে মিটিয়ে দাও, তোমার জ্ঞানকে আমার জ্ঞানের কাছে বিলীন কর। কারণ, আমি যা জানি তা তুমি জানো না।

- মানে দাঁড়াল, ইসলাম নারীকে পুরুষের অধীন করে দেয় না, ইসলাম নারী- পুরুষ উভয়কে সর্বজ্ঞ আল্লাহর অধীন করে দেয়।

- ঠিক তাই, আর আল্লাহ সিস্টেম বানিয়েছেন; কখনো নারীর হাতে পুরুষের নাটাই তুলে দেন, আবার কখনো পুরুষকে নারীর উপর কর্তৃত্ব দেন, ব্যালেন্স করেন। একটু বসো । মা ডাকছে কেন শুনে আসি।

জোবায়েদ স্যারের কথা শুনে যেমন লাগছিল, এখন তো তেমন লাগছে না। কত সুন্দর একটা ব্যাপার। তোমার ভালোর জন্য একটা নীতিমালা পাঠালাম। মানলে ভালো থাকবা, না মানলে নাই। পরে হিসাব নিব। স্যারের বুঝায় বড় রকমের ভুল আছে। নাদিয়া আপুর কাছে থেকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে নিতে হবে। তবে একটা খটকা কিন্তু রয়েই গেল। কফির কাপে শেষ চুমুক। বৃষ্টি পড়ছে। ধুয়েমুছে উঠছে প্রকৃতি। আচ্ছা, প্রকৃতি কী?

(তিন)

- তার মানে কি ইসলাম কিছুই চাপিয়ে দেয় না? দেয় তো।

- তোমার প্রশ্নের দিকেই এগুচ্ছি। কখন কোনো জিনিসকে তোমার মনে হবে — এটা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন চিন্তাগত সংঘর্ষ হবে, তোমার স্বাধীনতা যখন আর দশজনের স্বাধীনতার সাথে টক্কর খাবে, তখন। চোরের স্বাধীনতা চুরি করা।, ধর্ষকের স্বাধীনতা ধর্ষণ। কিন্তু তুমি ততক্ষণই স্বাধীন যতক্ষণ তোমার স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতার সাথে টক্কর না খায়। মাদকাসক্ত সন্তানের জীবনদর্শন আলাদা, পরিবারের বাকিদের আলাদা। পরিবার কি করবে? হয় সংশোধনের চেষ্টা করবে, না হয় ত্যাজ্য করবে। আসক্ত ছেলে মনে করছে আমার উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, তাই না?

- হুমম, মেক্স সেন্স।

- আমি আগেই একটা কথা কিন্তু বলেছি, তিথি। ইসলামকে যদি তুমি আর দশটা ধর্মের মত ধর্ম মনে কর, তাহলে ইসলামের ৯০% জিনিস তুমি বুঝবে না, বাকি ১০% জিনিস ভুল বুঝবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তুমি ইসলাম মানলে কি মানলে না এর জবাবদিহি তুমি করবে। কিন্তু ইসলাম যখন

রাষ্ট্র, তখন রাষ্ট্রীয় আইন তো তোমাকে মানতেই হবে, যেমন তুমি এখন দেশীয় আইন মানো। ইসলাম যখন সমাজভিত্তি, তখন সামাজিক অংশটুকু তো তোমাকে মেনে চলতেই হবে, যেমন এখন তুমি সমাজের ভয়ে অনেক কিছুই করো না। ইসলাম যখন পারিবারিক সফটওয়্যার, তখন ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকলেও পারিবারিক ফরমেটটা তোমাকে মানতেই হবে, যেমন এখন তুমি পরিবারের বাইরে যেতে পারো না। এখন যদি দেশে সমাজতন্ত্র থাকত, রাজতন্ত্র থাকত, তুমি কি মানতে না? নিজের ইচ্ছার বিপরীতেও তো মেনেই চলতে। ইসলামী রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবার নির্মিত হয় ইসলামী মূল্যবোধের উপর। তখন ভিন্ন মতের তোমার কাছে মনে হয়, আমার স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে। আমার উপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে। এটা স্বাভাবিক। যে ক্ল্যানে তুমি থাকবে, তার নিয়মগুলো তোমাকে মানতে হবে। একে চাপিয়ে দেয়া বলে না।

- তাহলে তো ‘স্বাধীনতা’ শব্দটাই ফাঁকি। তাই কি?

- খুব ভালো করে ভেবে দেখলে তা-ই। একমাত্র বাথরুম ছাড়া কোথাও তুমি শতভাগ স্বাধীন না। তোমার ব্যক্তিস্বাধীনতা তুমি ততক্ষণই পাবে যতক্ষণ তা আদর্শকে না ছোঁবে। এটা সব আদর্শ-সব আইন কাঠামোর জন্যই সমান, শুধু ইসলামের দোষ দেয়াটা মূর্খতা। যেমন ধর আমাদের দেশ ৪ টা মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত— গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা-জাতীয়তাবাদ। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই লিখিত না হলেও এই নীতি বা এর কাছাকাছি নীতিতে চলে। এখন ধর, কিছু মানুষ ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী, তারা চায় এই ৪ নীতির বদলে একমাত্র নীতি হবে ইসলাম।

. গণতান্ত্রিক ফরমেটের বদলে ইসলামী সরকারব্যবস্থা,

. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বদলে ইসলামী অর্থনীতি,

. ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে সর্বস্তরে তাওহীদ, মানে এক আল্লাহর কাছে পরকালীন জবাবদিহিতামূলক চেতনা; অফিসে আদালতে, হাটবাজারে সবখানে। মানে রাষ্ট্র নিজেকে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ ঘোষণা করবে অফিসিয়ালি।

. আর ছোট ছোট জাতীয়তাবাদী জাতিরাষ্ট্র কনসেপ্টের বদলে খিলাফত বা বিশাল পরাশক্তি ইসলামী সাম্রাজ্য কনসেপ্টে বিশ্বাসী।

এ ধরনের লোকগুলোর সাথে আমাদের রাষ্ট্রীয় আচরণ কেমন হয়? জঙ্গি- সন্ত্রাসী বলা হয়, দেশদ্রোহী হিসেবে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। ক্ষমতাসীন আদর্শের বিপরীত যেকোন আদর্শকে দমন করাই হল আইন। চাপিয়ে দেয় সবাই-ই। সমাজতন্ত্র তার বিপরীত মতের কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করেছে। সেকুলার গণতন্ত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ফ্রান্সে- তুরষ্কে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে। একমাত্র ইসলামই ‘মেনে নিতে বাধ্য করা’ নয়তো ‘হত্যা’র মাঝামাঝি আরেকটা অপশন দিয়েছে — জিযিয়া চুক্তি। তা-ও ইসলামই খারাপ। তার কারণ হল, ইসলাম জুলুমকে ধ্বংস করে, যে জালেম সে তাই ইসলামকে সহ্য করতে পারে না। যে সমস্যা জিইয়ে রেখে ফায়দা উঠাতে চায়, সে ইসলামকে দেখতে পারে না, কারণ ইসলাম সমাধানের কথা বলে, শুধু তাই না, সমাধান অব্দি পৌঁছেও দেয়’। বিষ্টিও শেষ, মুড়িও শেষ। শেষ ক’টা মুড়ি আর চানাচুরের গুঁড়ো মুখে পুরে দেয় নাদিয়া।

- এক নতুন ইসলামকে চিনলাম, আপু। গত ১৯ টা বছরে কেউ আমাকে এভাবে চেনায়নি। আমি আরও জানতে চাই।

- অবশ্যই জানবে। তোমাকে জানতে হবে। বিরোধিতা করতে হলেও তোমাকে জানতে হবে। আংশিক জেনে, একপেশে জেনে অবস্থান নিলে তুমি অন্যায় করলে, না-ইনসাফী করলে। নিজেরই সাথে, ক্ষতিগ্রস্ত তুমি নিজেই। বিরাট লেকচার মারলাম। তাহলে কী বুঝা গেল?

আজ আর না । থিওরি অনেক হয়েছে। বিরক্ত হওনি তো?

- আরে নাহ। একদম না।

- সবই বুঝলাম। কিন্তু ইসলাম এই নর্মস কেন করল যাতে নারীকে আবদ্ধ থাকতে হয়?

- এবার প্র্যাকটিক্যাল। তোমার জন্য একটা টাস্ক। আজ যখন বাসায় ফিরবে, রাস্তায় প্রতিটা মানুষ— রিক্সাওয়ালা, চায়ের দোকানী, বাস কন্ডাক্টর, পথচারীর চোখের দিকে তাকাবে। তাদের চোখকে পড়ার চেষ্টা করবে। এই পুরো সপ্তাহ ক্লাসমেট-বড়ভাই-স্যার সবার চোখ দেখবে, বুঝতে চেষ্টা করবে, কেমন? সামনের সপ্তাহে আবার আমাদের বাসায় তোমার দাওয়াত রইল, খুকি। আমিই তোমাকে ফোন দেব ইনশাআল্লাহ।

‘সব মুক্তিই কি আনন্দের? আচ্ছা কেমন হয়, সন্তান যদি শৈশবেই মুক্ত হয়ে যায় মায়ের বাহুডোর থেকে। কিংবা বাল্যকালে বাবা পৃথক করে দেন — যাও, করে খাও। বা স্বামী-স্ত্রী মুক্ত ঘোষণা করে পরস্পরকে। সব বন্ধনই কি কষ্টের? কিছু বন্ধনের অর্থ কি ‘নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা, আস্থা’ নয়? ‘প্রীতিডোর’, ‘মায়ার বাঁধন’, ‘স্নেহপাশ’— তাহলে কি?’, নাদিয়া আপুর শেষ কথাগুলো তিথি ভুলতে পারে না। পুরো রাত ঘুম আসে না তিথির। মা-কে খুব মনে পড়ছে। তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে মা, তুমি যাবার পর কেউ আমাকে বকে না, কতদিন কেউ পিঠের উপর দুম দুম করে দেয় না চারটে। আমি আজ অনেক বেশি স্বাধীন, এতটা বেশি যে আমার দমবন্ধ লাগে। অনেক মিস করি মা তোমাকে, অনেক। কেউ কি মায়ের চেয়ে আমাকে বেশি ভালোবাসে? আছে কোথাও এমন কেউ? আজ রাতে মায়ের বন্ধন তিথি খুব মিস করেছে। আর কারো বন্ধন ও অনুভব করে কি? যে ভালোবাসে মায়ের চেয়ে বেশি, অনেক বেশি ‘বেশি’।

(চার)

পরদিন থেকে তিথির দুনিয়াটা ঘিনঘিনে হয়ে যায়। গা গুলিয়ে আসে। যেন গলা লাশের স্তূপ থেকে উঠে এলো। যেন সারা শরীরে গলিত লাশের পচা স্রাব ঘিতঘিত করছে।

আজ ভার্সিটিতে আসার সময় জ্যামের ফাঁকে রিকশাওয়ালারা ঘুরে ঘুরে তাকিয়েছে, তার মানে ওরা প্রতিদিনই তাকায়, খেয়াল করে দেখা হয় না বলে চোখে পড়েনি। তিথি তাদের চোখ পড়ে নিয়েছে আজ। বউ রেখে এসেছে গ্রামে, দু’মাস ধরে ঢাকায়, ঈদের আগে আর বউয়ের কাছে যাওয়া হবে না— এগুলো লেখা ছিল বুভুক্ষু চোখে। বাসের জন্য অপেক্ষমান মধ্যবিত্তের লাইনে দাঁড়ানো সব ক’টা চোখ ও পড়ে নিয়েছে। কেউ স্ত্রীকে ঢাকায় আনতে পারেনি, কেউ কবে বিয়ে করবে ঠিক নেই, মধ্যবিত্তের অনিশ্চিত ভবিষ্যত তাদের অতৃপ্ত চোখে পড়ে ফেলেছে তিথি। চায়ের দোকানদার ছোকড়া চোখ মটকে তার বন্ধুকে তিথির দিকে ইশারা করেছে, এটাও তিথির চোখ এড়ায়নি। বুদ্ধি করে সানগ্লাস পরে নিয়েছে, যাতে সবার এক্সপ্রেশান পুরোটা দেখে নেয়া যায়। তিথির পিছনেও দুটো চোখ নেই ভাগ্যিস। নয়তো দেখতে পেত, সামনে থেকে যত বিষের তীর ছুটে আসছে, পিছন থেকে আসছে তার শতগুণ। কী ভয়ংকর। ফুটপাতের হকার, পথচারী, ঝালমুড়িওয়ালা, ভিক্ষুক; সদ্য গোঁফের রেখাওয়ালা কিশোর থেকে লোলচর্ম বৃদ্ধ। একেকজন জোর করে তিথিকে নিয়ে যায় চিন্তার নর্দমায়; সর্বাঙ্গে গলিত চোখের, নষ্ট মনের দুর্গন্ধ। ছেলেরা এটা বুঝবে না, উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে হবে। ধরেন সমকামী ছেলেদের একটা পার্টিতে আপনি এটেন্ড করলেন সামহাউ। আপনি হাঁটছেন ওদের ভিতর দিয়ে, এবার ওদের চোখ কল্পনা করে বুঝে নেন একটা মেয়ের অনুভূতি।

- হাই তিথি, কী ব্যাপার দেরি যে।

- হাই।

মনে হল যেন জান বেরিয়ে গেল হাসির ইমো দিতে গিয়ে। পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ নাকি সবচেয়ে ভারি। তাহলে নিশ্চিত দ্বিতীয় ভারি বস্তুটা হল, মুখের দুই কোণা।

- আমি তো সবসময়ই লেট। আমারটা চোখে পড়বে না। কিন্তু তুমি তো লেট করো না।

- না, রাস্তায় একটু জ্যাম ছিল তো, তাই।

এটা-ওটা বলতে বলতে লেকচার গ্যালারির দিকে এগোয় ওরা।

নিতুল ছেলেটা একটু ছ্যাবলা কিসিমের। তিথি-চৈতি-জেনি-সিনথি একসাথে পড়ে। বেশ কিছুদিন হল নিতুল ওদের সাথে পড়তে চাচ্ছে। নিষেধ করার পরও বার বার আসে। যা না ভাই, ছেলেদের সাথে গিয়ে পড় না। সিনথি সেদিন একটু কড়া করেই বলে দিয়েছে, আমরা কমফোর্ট ফিল করি না। পড়ার ফাঁকে মেয়েলি খুনসুটি, মেয়েলি টপিকে আড্ডা হয়; রাতুল থাকলে দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে। এত করে বলার পরও আসলো পরদিন। সমস্যা কী ছেলেটার? আচ্ছা ওর চোখ পড়ে দেখি তো ও কী চায়। চকিতে নিতুলের চোখের দিকে তাকায় তিথি। যেখানে সভ্যতার শেষ, অসভ্যতার শুরু। নিতুলের চোখদুটোকে খুঁজে পায় সেখানে, পচাগলা চোখ। টের পেয়ে লজ্জা পেয়ে যায় নিতুল, চোখ নামিয়ে চোরের মত সরে পড়ে। ত্রস্তপায়ে ওয়াশ রুমের দিকে এগোয় তিথি, গোসল তো করা যাচ্ছে না, একটু হাত মুখ ধোয়া দরকার। এতগুলো গলিত চোখের দুর্গন্ধ স্রাব লেপ্টে আছে। ইয়াক।

ক্লাস শেষে কলাভবন থেকে বেরিয়ে ওরা টিএসসিতে গিয়ে বসে মাঝে মাঝে।
টিএসসির ভিতরে সবুজ ঘাসটুকু যেন সাতরাজার ধন। ওরা ক্লাস শেষে

লাইব্রেরীতে ঘন্টাখানেক হয়ে মাঝে মাঝে এখানে এসে বসে টসে, আইসক্রিম খায় টায়। এই বসেটসে, খায়টায় না থাকলে কী দিয়ে আপনাদের বুঝোতুম বলুন তো? আজ মনটা এমনি তেতো বিষ, আজ তো ঘাসের কাছে, পাখির কাছে, ফুলের কাছে যেতেই হবে। একটু আগে আগেই লাইব্রেরি ওয়ার্ক শেষ হল। ঝালমুড়ি পাওয়া গেছে, সিনথি গেছে ঝালমুড়ি আনতে। শ্লোগানে শ্লোগানে দামাল ছেলেরা রাজপথ কাঁপিয়ে যাচ্ছে। সবাই মিছিল দেখছে, বজ্রমুষ্টি দেখছে, প্ল্যাকার্ডের লেখা পড়ছে। একজন পড়ছে সবার চোখ। সিনথি বোরকা পরে। তবে একটু ফিটিং, যে উদ্দেশ্যে পরে, তা পূরণ না হয়ে আরও এঁটে বসে শরীরে। বানের মত ধেয়ে আসে ছেলেগুলোর গলিত চোখের পুঁজ-স্রাব, সিনথি ভিজে চুপচুপে হয়ে যায়, ভাগ্যিস টের পায়নি বেচারী। ঘেন্নায় ঝালমুড়ি তিথির গলা দিয়ে নামে না। এতদিন খেয়াল করেনি কেন এসব?

একটা সপ্তাহ দোজখের মত গেল। নতুন এক জগত দেখল তিথি। লাশের জগত। থিকথিকে সব চোখ, ঘিনঘিনে সব এক্সপ্রেশান, চোখের সে ভাষা লিখতে গেলে বর্ণরাই লজ্জায় লুকোবে। কী দেখে ওরা এভাবে, সব তো ঢাকা-ই। হঠাৎ পলকের জন্য নিজেকে নগ্ন মনে হয় তিথির। এত এত স্ক্যানারের সামনে তো তা-ই। জেনি অবশ্য খুব স্বাভাবিকভাবে নিল।

- আরে ছেলেরা এমনই।

- এটা বলেই উড়িয়ে দেয়া যায় নাকি? নিজেকে বাজারের মেয়ে মনে হয়, মনে হয় আমি ওদের চোখের কামনা মেটাচ্ছি, ওরা আমাকে স্ক্যান করে করে সুখ নিচ্ছে, আর আমি নিতেও দিচ্ছি। গা গুলায় না?

- বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এমন আকর্ষণ তো থাকবেই, এটাই ন্যাচারাল না?

- ন্যাচারাল তো সবই, না? একটা ছেলে একটা মেয়ের কাছে সহবাস কামনা করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। ধর একজন রিক্সাওয়ালা এসে তোর কাছে সহবাস

কামনা করল, বা কোন অপরিচিত লোক। তোর কেমন লাগবে? মৌখিকভাবে না হোক, চোখ দিয়ে সে তো তোর কাছে সেটাই চাচ্ছে। চোখ দিয়ে তোকে স্ক্যান করছে আর ভাবছে, মেয়েটাকে যদি পেতাম। মৌখিকভাবে চাইলে খারাপ লাগে, আর চোখ দিয়ে চাইলে নর্মাল।

- আমার মত বোরকা পরতে পারিস, তিথি।

- তোর ওই বোরকা পরার চেয়ে আমার নর্মাল পোশাকই বেশি শালীন। সেদিন মিছিলে কী দেখলাম তোকে বলেছি না? ভাগ্যিস সমাজ বলে এখনও কিছু একটা আছে। আমি ভাবি জনাকীর্ণ এলাকায় যারা এভাবে দেখতে পারে, নির্জন জায়গায় পেলে তারা কি করতো?

আয়নার সামনে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তিথি। কী আছে এই শরীরে? কী দেখে ওরা এভাবে? রাজ্যের অপবিত্রতা এসে ভর করেছে। থুঃ, লক্ষ লক্ষ চোখ জুল জুল করে ওর দিকে তাকিয়ে, দুর্গন্ধ লালা-পুঁজ-স্রাব টপ টপ করে পড়ছে। স্রোতের মত এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ঘুম ভেঙে যায় তিথির। মাত্র দু’সেমিস্টারে ক্যাম্পাসের দারওয়ান পর্যন্ত যাকে চেনে, সেই স্টেজ-পারফর্মার তিথি জড়সড় হয়ে হেঁটে যায়। ভাবে, ইস, কেউ যদি আমাকে দেখতে না পেত। কেউ যদি মনের নিষিদ্ধ চিন্তার বিষ আমার দিকে ছুঁড়ে না দিত। এতদিন তিথি উড়েছে খেয়াল করেনি বলে, লক্ষ চোখের খাঁচার ভিতরেই আকাশ মনে করে উড়েছে। আজ চিনে ফেলেছে, যেখানে ও উড়েছে সেটা আকাশ না; সেটা খাঁচা, জাল। এটা ভাবলেই আর ওড়া হয় না, উড়তে ইচ্ছে করে না ওর। ওড়ার জন্য আকাশ খোঁজে তিথি, একফোঁটা আকাশ, এক চিলতে নীল আকাশ।

(পাঁচ)

আমাদের জীবনের পৃষ্ঠাগুলো হাওয়ায় হাওয়ায় উলটে যায়। মনে হয় সব পড়ে ফেলেছি, দেখে ফেলেছি, উপভোগ করে ফেলেছি। আসলে কিচ্ছুটি পড়া হয়নি, দেখা হয়নি, এমনিই উলটে গেছে। অতীতের অহেতুক রোমন্থন আর ভবিষ্যতের অলীক কল্পনা আমাদেরকে আজকের পৃষ্ঠাটাই পড়তে দেয় না, বুঝতে দেয় না, আনন্দে উদ্বেলিত হতে দেয় না। বই শেষে বাকি থাকে শুধুই হাহাকার। এজন্যই যার ‘সেন্স অব প্রেজেন্ট’ মানে বর্তমানের উপলব্ধি যত তীব্র, তার জীবন তত সুন্দর। নিজের অতীতবন্দনা আর ভবিষ্যকল্প থেকে ‘হতাশা’ কমন নিলে থাকে ‘অহংকার’ আর ‘প্রেসার’। এখন ঠিক এই মুহূর্তে আমার মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, বাইরে পাখিরা কিচমিচ করছে, ভেজা আকাশ, রাস্তাটা দিয়ে মাত্র ভটভট করে চলে গেল একটা নসিমন-করিমন, শরীরটাও বিদ্রোহ করছে না, অনেকের চেয়ে ভালোই তো আছি— কৃতজ্ঞতা আর প্রশান্তি। গাঁজা টেনে সুখ খননের দরকার নেই, প্রতিটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্তমান কী অসহ্য সুন্দর। নামাযে এই ‘সেন্স অব প্রেজেন্ট’ শান দেয়া হয়, খেয়াল করেছেন, বর্তমানের চর্চা। অসহ্য সুন্দরের জগতে আপনাকে স্বাগতম।

- কেমন আছো তিথি?

- জি আপু, ভালো।

- আপনি কেমন ছিলেন?

- আলহামদুলিল্লাহ। তোমার এসাইনমেন্টের কী খবর?

- এসাইনমে....ন্ট, কোন এসাইনমেন্ট?

- ওই যে এসাইনমেন্ট দিলাম না ১ সপ্তাহের জন্য।

- ওহ হো, হুমমম।

- কেমন লাগল? অস্বস্তিকর, কেমন যেন ইরিটেটিং লাগল না?

- জি, গা গুলায়। মনে হয় আমি ওদের চোখের সামনে বিলকুল খোলা।

- আচ্ছা, ফোনে এসব আলাপ করা যায় না। বাসায় এসো আড্ডা দিই। আসরের একটু আগেই এসো, তালিমের দিন আজ।

তালিম শেষ, অনেক পশ্চাৎপদ মহিলা এসেছিল। একজন আবার ‘মেরিকা থেকে ডক্টরেট করা। তালিম শেষে উনিই আলোচনা করছিলেন আজ। এখন বাসায় একটা বুটিক শপ চালান, অনলাইনে অর্ডার আসে, অনলাইনে বিক্রি হয়। অনলাইন হয়ে পর্দানশীন কর্মজীবীদের সুবিধাই হয়েছে, অনলাইন শপ-ফ্রীল্যান্সিং-কতকিছু করা যায় পর্দা করে। আসলে কেউ হারাম রেখে হালালের উপর চলতে চাচ্ছে, আর তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন না, এটা ভাবাটা আল্লাহ সম্পর্কে বদ ধারণা। সাহায্য আসবেই, তবে চেক করা হবে আসলেই সে হারাম ত্যাগ করতে চায় কি না, ছোট্ট পরীক্ষা। আসরের নামায শেষে বারান্দায় গিয়ে বসে দুজনাতে। নাদিয়া একফাঁকে গিয়ে মুরগি ভেজে এনেছে খান কয়েক, ‘চিকেন-ফ্রাই’ বললে সুন্দর শোনায়, না? হায় ব্রিটিশ, হায় মনিব। সাথে সস আর সালাদ। ইউটিউবে কী নেই।

- অনেক মেয়ে অবশ্য এটাতে মজা পায়। আরও চায় মানুষ তাকে এভাবে দেখুক, কামনা করুক, রাতের ঘুম উবে যাক। মজার ব্যাপার হল অনেক স্বামীও চায় তার স্ত্রীকে সবাই মেপে মেপে দেখুক আর তাকে হিংসা করুক। এমন নিদ্রাহরিণী স্ত্রীর স্বামী বলে তাকে ঈর্ষা করুক। নাও।

- ‘বলেন কি?’, বুঝা যাচ্ছে নাদিয়া ভালোই খেটেছে, কেএফসির মত স্কেলি স্কেলি করার চেষ্টা করেছে।

- সত্যি করে বলো তো তিথি, তোমার কি নিজেকে স্বাধীন মনে হয়েছে? তোমার কি মনে হয়েছে, তুমি উড়বে-খেলবে-ভাসবে? স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছো? আত্মবিশ্বাসী হয়ে ফ্রেন্ড সার্কেল মাতিয়ে রাখতে পেরেছো?

- একদম না, বরং প্রতি মুহূর্তে লজ্জায় কুঁকড়ে গেছি। মনে হয়েছে দৌড়ে ঘরে ঢুকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিই। মনে হয়েছে কেন মেয়ে হয়ে জন্মেছি যার জন্য সবাই ভোগ করতে চায়। ছেলে হলেই ভালো ছিল।

- ‘তুমি যা দেখেছো, এগুলোই দেখেও না দেখার ভান করে শত শত কর্মজীবী নারী-ছাত্রীরা। সবাই জানে ওরা কী চায়, কী ভাবে। রিক্সাওয়ালা, চাওয়ালা, বাসের হেলপার, হকার, ক্লাসমেট, বড়ভাইয়েরা, কলিগ, বস। কিন্তু এগুলো ভাবলে তো জীবন থেমে যাবে, এগোনো যাবে না। তাই না- দেখার ভান করে চলতে হয়। কারো সাথে বেশি কিছুও হয়ে যায়। গাড়িতে- ভিড়ে-অফিসে-নির্জনে। সম্মতি-অসম্মতি-আধাসম্মতিতে। বিপি হাই হলে ওষুধ খেতে হয়, যদি ইগনোর করতে থাকো, একসময় হঠাত ধরা পড়বে দৃষ্টির সমস্যা বা কিডনী ফেইলোর বা হার্ট ফেইলোর। চোখগুলোকে ইগনোর করতে থাকলে, একদিন ফেইলোর হবে, সমাজ ফেইলোর, নিরাপত্তা ফেইলোর, বিবেক ফেইলোর। এজন্য এই নষ্ট চোখগুলোরই প্রতিকার করতে হবে।

এই ইগনোর করে করে চলাটা একটা জীবন ধারা। ‘সমস্যা ইগনোরের’ জীবন ধারা। আরেকটা জীবন আছে, সেটা হল ‘সমাধানের’ জীবন। ছোট ছোট সমস্যারই সমাধান করে করে এগোনো, যাতে বড় সমস্যা না হয়। সমস্যা থেকে মুক্তি, স্বাধীনতা। দেখবে তোমার ব্যাচে কিছু ছেলে আছে যারা মেয়েদের দিকে তাকায় না। আছে না, বলো?

- ‘আছে তো। আমার ব্যাচে ৪ জন আছে। ম্যাডামদের দিকেও তাকায় না। সেদিন এক ম্যাডাম একজনকে বলল, এই তাকাও আমার দিকে বেয়াদব, আমি কি দেখতে খারাপ নাকি?’, এলোমেলো বেজে উঠল দুটো পিয়ানো।

- ওদের কি তাকাতে ইচ্ছে করে না? ওদের কি ওই চাহিদা নেই যা রাস্তার লোকেদের আছে, অন্য ছেলেদের আছে। আছে। তবুও ওরা তাকায় না। ইসলামের পার্সোনাল কালচার ওরা মেনে চলে। নিজের মনের চাওয়াকে ইসলামের অনুশাসনের সামনে কুরবান করতে থাকে, প্রতিনিয়ত। মনের পশু থেকে স্বাধীন হবার অনুশীলন, নিজের সাথে নিজের যুদ্ধ। নিজের থেকে স্বাধীন। এটাই ইসলাম। তুমি নিজের পশু থেকে, নিজের চাহিদা থেকে এবং নিজের সত্তা থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে। আসল মুক্তি, নির্বাণ।

- নিজের দাসত্ব থেকে মুক্তি...?

- আসলে নিজেকে মেলে দেয়া স্বাধীনতা নয়। নিজের সব খায়েশ পুরা করাটা স্বাধীনতা নয়। একজন লোক নিজের প্রতিটি ইচ্ছেকে পূরণ করতে থাকলে সমাজ ভেঙে পড়বে, দর্শনে নৈরাজ্যবাদ বলে একটা কথা আছে। তুমি এমন একটা সমাজ ভেবে নাও যেখানে সবাই মনে যা চায় তা-ই করছে। পশ্চিমের দিকে তাকাও, সন্তান বাবা-মা থেকে স্বাধীন, ফলাফল— ড্রাগ এডিকশান [1], ভার্জিন মাদার [2]। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর থেকে স্বাধীন, ফলাফল— ডিভোর্স [3], জারজসন্তান [4], একাকীত্বের মহামারি [5]।

- আমরা তো ওদেরকে অনেক সুখী মনে করি, আদর্শ হিসেবে নিই?

- কিন্তু ওদের পরিসংখ্যান তো তা বলে না, তিথি। পরিসংখ্যান বলে, পশ্চিমা সমাজ ভেঙে পড়ছে স্বাধীনতার ভারে। আর ইসলাম তোমাকে স্ব-অধীনতা দেবে না, তোমাকে দিবে মুক্তি। কারণ, স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা শব্দ দুটো খুব কাছাকাছি, কখন কনভার্ট হয়ে যায়, টের পাওয়া যায় না। সামাজিক মুক্তির জন্য তুমি নিজের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা শিখবে, আত্মসংযম শিখবে, যাতে তোমার স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা না হয়ে যায় । এভাবে তুমি নিজের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে, সমাজ-পরিবার এবং তুমি নিজে ‘তোমার স্বেচ্ছাচারিতা’ থেকে মুক্তি পাবে।

- সেটা কীভাবে, আপু?

- আজ আর না, সন্ধ্যে হয়ে এলো। শুধু এটুকু বলে রাখি, নিজের ইচ্ছাগুলোকে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে সমর্পণ করতে হবে। প্রতিনিয়ত। ইসলামের অনুশাসনের সামনে নিজের চাওয়া-পাওয়া, লাভ-মুনাফা, মনের সুখ, লৌকিকতা— সবকিছুকে সমর্পণ করে চলতে হবে। স্বাধীনতার সমর্পণ। কেন বলো তো?

- কারণ, আল্লাহ যা জানেন, আমরা তা জানিনা। আমার স্বাধীনতার মধ্যে যে ক্ষতিটুকু লুকোনো, সেটাও আল্লাহ জানেন। তাই। আর এই ইসলাম সিস্টেমটা তাঁরই দেয়া। আমারই ভালোর জন্য। কেননা তিনি আমাদেরকে ভালোবাসেন। আমরা নিজেরাও নিজেদের এতোটা ভালোবাসি না।

- অনেক বুঝে ফেলেছো দেখছি, আজ তোমার ২য় টাস্ক। রেডি?

- হুমমম।

নাদিয়া পাখির মত উড়ে আলমারির কাছে যায়।

- এই নাও আমার বোরকা। আজ তুমি আমার বাসা থেকে তোমার বাসা, এটুকু রাস্তা এটা পরে যাবে, পারবে না? আর সবার চোখ খেয়াল করতে করতে যাবে। পরো দেখি।

তিথির কেমন যেন লাগছে। সারাটা জীবন এই জিনিসটাকে তার দমবন্ধ লেগেছে। আরেকজনকে পরতে দেখেও অস্বস্তি লেগেছে। একটা ভয়ও কাজ করছে। একবার পরলে যদি সারাজীবন পরতে হয়। পরা শুরু করে ছেড়ে দিলে লোকে কী বলবে। এই ভয়েই তো সবাই শেষ বয়সে পরে। প্রচণ্ড অস্বস্তি নিয়ে তিথি পরল বোরকাটা । সিনথির মত ফিটিং না, সুতি ধরনের কাপড়ের বলে লেপ্টেও নেই, ফোলা ফোলা। উপরের পার্টটায় মাথা গলিয়ে নিল, এটাও

নিচ পর্যন্ত, আর কিছুই বোঝা যায় না, কালো আঁধারের ভিতর বুড়ি না ছুঁড়ি।

- বেশি ডিজকমফোর্ট লাগছে?

- না তো। নিজেকে দাদী-দাদী লাগছে।

কাঁচের চুড়ি পড়ে গেলে যেমন শোনায়, নাদিয়ার হাসি অমন শোনালো।

- ‘পাবলিকে দাদী-খালা মনে করলেই ভালো। সেই একজনা মনে না করলেই চলবে, তাই না? একস্তর চোখের উপর দাও দেখি। তোমার ঐ বাঁকা দুই নয়নে তো সবার নেশা লেগে যাবে হে’।

আয়নায় হঠাত করে তিথি আবিষ্কার করে আম্মুর চোখ। কোণা দুটো টানা।
বাকি সব ঢাকা বলে চোখদু’টো তাদের সব রূপ মেলে ফুটেছে।

- দেখতে পাচ্ছো তিথি?

- জি, পাচ্ছি।

- চলো আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে, চোখ ঢেকে প্রথম প্রথম হাঁটতে পারবে না। আমি রেখে আসি, তোমার বাসাটাও চিনে আসি। দ্রুত রেডি হয়ে নেয় নাদিয়া আপু।

অদৃশ্য হবার মত মজা পেল তিথি। যেন কেউ দেখতেই পাচ্ছে না। হ্যারি পটারের সীনটা মনে পড়ছে। একটা পোশাক থাকে পরলে অদৃশ্য হওয়া যায়। কারো পচা চোখের গলিত স্রাব ধেয়ে আসছে না। মোড়ের চায়ের দোকানের যে ছেলেটা জুলজুল করে ওকে স্ক্যান করত, সে একবার তাকিয়ে ‘নট ইন্টারেস্টেড’ হয়ে নিজের কাজে মশগুল রইল। নাদিয়া আপু ওর হাত ধরে আছে, নিজেকে বেলুন মনে হল তিথির, সুতো আপুর হাতে। আর অদৃশ্য তিথি

উড়ছে, পাখির মত, ছাতিম গাছের ভেসে বেড়ানো বীজের মত। কেউ ওকে দেখছে না, লোলুপ চোখেরা, ইতর ভাবনারা ওকে ক্লেদাক্ত করতে পারছে না, ও স্বাধীন, ও মুক্ত। শত শত চোখের লালসার শেকল থেকে, কল্পনার নির্যাতন থেকে তিথি মুক্ত। মনে হল, এটা শুধুই আমার জগত, আমার। আমি এই জগতে খেলব-ঘুরবো-উড়ব-ভাসবো। ভাসতে ভাসতে আকাশে চলে যাবো, কেউ দেখবে না, কেউ কিছু বলবে না, কেউ কিছু বুঝবে না। এই অন্ধকার পোশাকটার মধ্যে এতোটা নীল আকাশ! এই সামান্য বন্ধনের মাঝে এতোখানি মুক্তি! এতোটা...!

(ছয়)

মানবসত্তার সহজাত চাহিদা হল বন্ধন। রবিবাবু বলেছিলেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়, সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময়।

সম্পর্ক, মনোজগত— সবখানেই সে বন্ধন খোঁজে। নিরাপদ বন্ধন না পেলে অনিরাপদ বন্ধন খুঁজে নেয়, বন্ধন তার লাগবেই। ঘরপালানো বা ব্রোকেন ফ্যামিলির সন্তান পরিবারের বাঁধন হারায়, কিন্তু মুক্ত হয়ে ওঠে না। মাদক, অপরাধ, কুসঙ্গ, নিদেনপক্ষে দুশ্চিন্তার বাঁধন তাকে টেনে নেয়, গভীর থেকে গভীরে। সোনার খাঁচা থেকে বেরোলে, কিন্তু ঢুকবে পূতিগন্ধময় বাঁশের খাঁচায়, ওড়া হবে না। মুক্তমনা বলে তাই কিছু নেই। ধর্মের ফুলডোর ছিন্ন করে অধর্মের জিঞ্জির, ব্যস। এটুকুই ‘উন্নতি’।

মা-কে অনেক মিস করে তিথি। মায়ের বকুনি মিস করে, দুমদুম কিল মিস করে। সব মুক্তি কাম্য নয়। সব পরাধীনতা খারাপ নয়। যে আমাকে

ভালোবাসে ‘আমার’ চেয়ে বেশি, সে আমার ‘পর’ হয় কী করে? তার অধীনতাকে কি ‘পরাধীনতা’ বলে নাকি?

মেয়েটা পরাধীন হয়ে যায় ইচ্ছে করে। আর ভাসে, রোজ ভাসে। ভেসে ভেসে হারিয়ে যায় আপনাদের এই ক্যারিয়ারিস্টিক পুঁজিবাদী মেকী শো-অফের দুনিয়া থেকে।

[সমাপ্ত আলহামদুলিল্লাহ]

ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২- এর জন্য লেখা। ইদানীং মৃত্যুর কথা খুব মনে পড়ে। পরপর অনেকগুলো দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ছদকায়ে জারিয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইলাম না। বলা তো যায় না, কখন কার উপকার হয়ে যায়।

দিনার ও দিরহাম- আল্লাহর অশেষ এক নিয়ামত
KAISAR AHMAD·THURSDAY, APRIL 26, 2018

আমরা হাদিস ও ইতিহাস পড়ার সময় অনেক বার এই দুটি মুদ্রার নাম শুনি। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ এই মুদ্রা সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমরা জানি মহরে ফাতেমি হল ৫০০ দিরহাম কিন্তু এই ৫০০ দিরহামের বর্তমান মুল্য কত তা আমরা জানি না। এমনি ভাবে যখন পড়ি, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু উম্মুল মুনিনিনদের জন্য ১২ হাজার দিরহাম করে ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন, বা যাকাতের নিসাব পরিমাণ হল ২০০ দিরহাম বা ২০ দিনার, দিয়তের মূল্য হল ১০ হাজার দিরহাম অথবা ১ হাজার দিনার। অমুক সাহাবী বা তাবীঈ ১ হাজার দিনার দান করলেন। তখন আমরা সেসবের হিসাব মিলাতে পারি না। ইসলামের বেশ কিছু বিধান দিনার দিরহামের সাথে সংযুক্ত যেমন, যাকাত, বিয়ে, হুদুদ, কাফফারা ইত্যাদি। যুগ যুগ ধরে মুসলিমরা সকল প্রকারের ক্রয় বিক্রয়, লেনদেন করার সময় দিনার দিরহামকে প্রধান বিনিময়ের মাধ্যম বলে গন্য করত। কিন্তু আজ তা বিলুপ্ত। দিনার ও দিরহামের নাম কুর’আনেও এসেছে। হাদিসে এসেছে অসংখ্য বার। হাদিসে এসেছে-

“মানবজাতির উপর এমন সময় অবশ্যই আসছে যখন দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ছাড়া ব্যবহার করার মত বা উপকারী আর কিছুই থাকবে না।”

[illegible]

[illegible]

[illegible]

গ্রাম রূপা দিয়ে তৈরি করা হত। দিরহামের মান নির্ধারণে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, হানাফিদের মত ৩.১২৫ আর অন্য ইমামদের মতে ২.৯৬, এছাড়াও অনেকের মতে ২.৯৭৫ হল সঠিক মান। যাইহোক আমরা ধরব,

১ দিরহাম = ৩ গ্রাম রূপা
১ গ্রাম রূপার বর্তমান বাজার মূল্য হল ৪৬.২৬ টাকা। তাহলে,

১ দিরহাম = ১৩৯ টাকা

যাকাতের নেসাব ২০০ দিরহাম হল ২৭,৮০০ টাকা
মহরে ফাতেমি ৫০০ দিরহাম = ৬৮০০০ টাকা
সর্ব নিম্ন বিয়ের মহর হল ১০ দিরহাম যার বর্তমান বাজার মূল্য হল ১৩৯০ টাকা।
শাফেয়ী মাজহাবে সর্বনিম্ন মহর হল ৩০ দিরহাম অর্থাৎ ৪১৭০ টাকা। দিয়তের মূল্য হল ১০ হাজার দিরহাম= ১৩,৯০,০০০ টাকা।
একই ভাবে ১০০০ দিরহাম এর মূল্য হল ১,৩৯,০০০ টাকা।

হাদিস ও ইতিহাস থেকে দিরহামের কিছু উদাহরণ

আম্মাজান হযরত জায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা তার বাৎসরিক ভাতার ১২ হাজার দিরহামের প্রায় সব দান করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি ১২ হাজার দিরহাম = ১৬,৬৮,০০০ টাকা দান করেছিলেন। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা'র ভাতিজা যায়েদ বিন হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে ৪০০ দিরহামে কিনেছিলেন অর্থাৎ ৫৫,৬০০ টাকায়। সাধারণত তখন দাস দাসীর মূল্য ছিল প্রায় ৫০০ দিরহাম অর্থাৎ ৭০ হাজার টাকা।

ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “ইসলাম গ্রহনের সময় হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু’র নিকট ৪০ হাজার দিরহাম বা ৫৫৬০০০০ টাকা ছিলো। (দিরহামের আজকের বাজার মূল্য ১৩৯ টাকা হিসেবে) আর হিজরতের সময় ৫ হাজারের বেশি ছিল না। বাকি সব দিরহাম তিনি ইসলামের সাহায্যে এবং মুসলমান গোলাম কিনে আযাদ করার পেছনে ব্যয় করেছেন।” (ইবনে সাইদ সূত্রে তারিখুল খুলাফায় বর্ণিত) অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে তিনি প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ইসলামের জন্য ব্যয় করেন।

রুমা কূপ মদিনার সুপেয় পানি সরবরাহের সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছিল। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তা ৩৫ হাজার দিরহামের বিনিময়ে অর্থাৎ ৪৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলেন। তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে ৫০ হাজার দিরহাম অর্থাৎ প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার কর্জ নিয়েছিলেন যা পরে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মওকুফ করে দিয়েছিলেন।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফতে বিচারকের মাসিক সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৫০০ দিরহাম আর সর্বনিম্ন ছিল ২০০ দিরহাম। বসরায় সালমান ইবনে রাবিয়া রাযি. মাসিক ৫০০ দিরহাম বেতন পেতেন অর্থাৎ প্রায় ৭০ হাজার টাকা।

জিজিয়া- জিজিয়ার পরিমাণ অনির্দিষ্ট ছিল। শহর, ব্যক্তি ভিন্নতায় জিজিয়া তে ভিন্নতা ছিল। যাইহোক গরিবদের জন্য জিজিয়া হল ১২ দিরহাম, মধ্যবিত্তদের জন্য ২৪ দিরহাম। সবচেয়ে ধনী সারীর অমুসলিমদের জন্য এটা ছিল প্রায় ৪৮ দিরহাম অর্থাৎ ৬৬৭২ টাকা মাত্র। রাজ্যের সবচেয়ে ধনী অমুসলিমরা বছরে মাত্র ৬,৬৭২ টাকা জিজিয়া বা কর হিসেবে মুসলিম শাসককে প্রদান করবে। হাস্যকর হল বর্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নাগরিক এর চাইতে অনেক বেশি ট্যাক্স দিয়ে থাকে কিন্তু জ্ঞানপাপীরা এটা নিয়ে প্রশ্ন করে না, শুধু জিজিয়া জিজিয়া বলে তারা চিৎকার করতে পারে।

হাদিস ও ইতিহাস থেকে দিনারের কিছু উদাহরণ

তাবুক যুদ্ধে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ৯৪০টি উট ও ৬০টি ঘোড়ার পাশাপাশি ১০ হাজার দিনার দান করেছিলেন। ১০ হাজার দিনার অর্থাৎ ১৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফত কালে, মিশরের গভর্নর আমর ইবনুল আস রাযি. কে মাসিক বেতন দেয়া হত ২০০ দিনার অর্থাৎ ৩০,৬৬,২০০ টাকা। সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া রাযি.কে বেতন হিসেবে প্রতি বছর দেয়া হত ১০ হাজার দিনার। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ১৫ কোটি টাকা।

বদর যুদ্ধের পূর্বে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে যে ব্যবসায়ী কাফেলা শাম থেকে মক্কায় যাচ্ছিল তাতে বাণিজ্যিক সম্পদের পরিমান ছিল মোট ৫০ হাজার দিনার অর্থাৎ প্রায় ৮০ কোটি টাকা। বদর যুদ্ধে বন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে মাথা প্রতি ৪০০ দিরহাম ধার্য করা হয়েছিল। অর্থাৎ ৫৫,৬০০ টাকা।

বাৎসরিক ২ লক্ষ দিনারের ব্যবসা করত। অর্থাৎ প্রায় ৩০৭ কোটি টাকার ব্যবসা হত।

আলী ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) ... উরওয়া বারিকী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বকরী ক্রয় করে দেয়ার জন্য তাঁকে একটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিলেন। তিনি ঐ দ্বীনার দিয়ে দুটি বকরী ক্রয় করলেন। তারপর এক দ্বীনার মূল্যে একটি বকরী বিক্রি করে দিলেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে একটি বকরী ও একটি দ্বীনার নিয়ে হাযির হলেন। তা দেখে তিনি তার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত হওয়ার জন্য দু’আ করে দিলেন। এরপর তার অবস্থা এমন হল যে, ব্যবসার জন্য যদি মাটিও তিনি খরীদ করতেন তাতেও তিনি লাভবান হতেন।" (সহিহুল বুখারী)

এখন কিছু প্রশ্ন করি-

চিন্তা করুন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ফাতেমা রাযিয়াল্লাহ আনহার মহর দিরহামে না নিয়ে আজকের কাগুজে মুদ্রায় নিতেন তাহলে কি হত?

চিন্তা করুন যাকাতের নেসাব টাকায় নির্ধারণ হলে কি সমস্যা হত?

ধরুন ফাতাওয়ার গ্রন্থে মহরে ফাতেমি ৫০০ দিরহাম না লিখে সোজা টাকার পরিমাণ লিখে দেয়া হল। এখন আপনি কিতাব খুলে পেলেন মহরে ফাতেমি হল ২৬,২৫০ টাকা (আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব ২/১৩৭; ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া ২/৯৬- উভয় বই প্রায় ১৫ বছর আগে লেখা হয়েছে)। আর সর্বনিম্ন মহর পেলেন ৫২৫ টাকা। আপনি আজকেও এই ২৬,২৫০ টাকাকে মহরে ফাতেমি মনে করবেন। অথচ টাকার মূল্য সময়ের সাথে সাথে কমে, আর দিনার দিরহামের মূল্য কমে না। এতে কোনো ক্ষয় নেই। আপনি ৫০০ দিরহামের মূল্য হিসাব কষে বের করতে পারবেন। যা আজকের ৬৮ হাজার টাকা।

২০০১ সালে আপনি আলেমের কাছে শুনেছেন যাকাতের নেসাব হল ১০,৫০০ টাকা। তারপর আর আপনি নতুন করে জানার চেষ্টা করেন নি, কিংবা সরকার জনগনের সুবিধার্থে আলেমদের পরামর্শে ১০,৫০০ টাকাকে নেসাবের পরিমাণ হিসেবে ফিক্স করে দিল। তাহলে ১৮ বছর পর আজকেও যাদের কাছে ১০,৫০০ টাকা থাকত তাদের উপর যাকাত দেয়া ফরজ হত। আর ৫০ বছর পরে দেখা যাবে ১০,৫০০ টাকা দিয়ে বাজারে কিছুই কেনা যাবে না, ফকিরের দান পাত্রেও এত রকম থাকবে। তখন উক্ত ফকির উপরও যাকাত ফরজ হয়ে যাবে।

এমনি ভাবে ফিতরার মূল্য চাল, খেজুর বা পন্য দ্রব্যের দামে নির্ধারণ না হয়ে যদি টাকায় নির্ধারিত হত তাহলে এক সময় ফিতরার টাকা দিয়ে কয়েক চকলেট কেন যেত শুধু, চাল ডাল কেনা যেত না।

এটাই হল কাগুজে মুদ্রার অসারতা। দিনার দিরহামের মূল্য সব সময় সমান থাকে। এতে মুদ্রাস্ফীতি নেই। ৫ হাজার বছর ধরে দিনার দিরহাম চলছে। এখনো ইনফ্লেশন রেট 'জিরো'।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ১ দিরহাম দিয়ে একটি মুরগি কেনা যেত। আজো এক দিরহাম দিয়ে অর্থাৎ ১৩৯ টাকা দিয়ে মুরগি কেনা যায়। এমন কি ১০ বছর পরে আপনি ১৩৯ টাকা দিয়ে মুরগি পাবেন না কিন্তু ১ দিরহাম সমান মুল্যে অবশ্যই পারবেন। আরেকটু সহজ করি, ২০০৬ সালে ১ দিরহামের মুল্য ছিল ৭০ টাকা। তখন বাজারে মুরগির দাম ছিল ৬০ টাকা। তাহলে ২০০৬ সালেও এক দিরহাম দিয়ে একটি মুরগি কেনা যেত। এখনো এক দিরহাম দিয়ে মুরগি কেনা যায় তবে ৭০ টাকায় কেনা যাবে না। কারণ টাকার মুল্যমান কমে গেছে। এখন কিনতে হলে ১৪০ টাকা লাগবে। আর বর্তমান এক দিরহামের মুল্য ১৪০ টাকা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ১ দিনার দিয়ে একটি ছাগল কেনা যেত। আজো এক দিনার দিয়ে অর্থাৎ ১৫,৩৩১ টাকা দিয়ে একটি ছাগল কেনা যায়। এমনকি ১০ বছর পরে আপনি ১৫,৩৩১ টাকা দিয়ে ছাগল কিনতে পারবেন না কিন্তু ১০০ কেন ১ হাজার বছর পরেও আপনি এক দিনার

রাসুল (সা) এর সময় ৬টি বস্তু মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হত। এবং তাই এ ছটি বস্তুর অসম বন্টনকে তিনি সুদ বলেছেন। আবু সাইদ খুদরি (রা) থেকে বর্ণিত ,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-‘সোনার বদলে সোনা ,রুপার বদলে রুপা ,গমের বদলে গম,যবের বদলে যব,খেজুরের বদলে খেজুর এবং লবণের বদলে লবণ বিক্রি করো নগদ নগদ এবং সমান সমান। যে বেশি দিবে অথবা বেশি নিবে সেটা সুদ হিসেবে গণ্য হবে। দাতা -গ্রহীতা এক্ষেত্রে সমান অপরাধী। (মুসলিম : ১৫৮৪)

এই ৬ টি বস্তুর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যে বৈশিষ্ট্য গুলো অন্য বস্তুতে পাওয়া গেলে সেটাও সুন্নাহ মুদ্রা হতে পারে , আর পাওয়া না গেলে তা সুন্নাহ মুদ্রা হবে না এমনকি অবস্থাভেদে তা বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে। দিনার ও দিরহাম সহ সাময়িক স্থায়িত্ব আছে এমন ভোগ্য পন্য মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা একে সুন্নাহ মুদ্রা বলতে পারি। আর কাগুজে মুদ্রাই ওই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না , অন্যদিকে তা প্রতারণা তাই কাগুজে মুদ্রা স্পষ্টই হারাম। আরো জানতে এই পোস্ট পড়তে পারেন। সুন্নাহ মুদ্রার বৈশিষ্ট্য ও বর্তমানে প্রচলিত কাগুজে নোট - https://www.facebook.com/E.Kaisar.Ahmed/posts/1308577312496271

আবু বকর ইবন আবি মরিয়ম হতে বর্ণিত যে তিনি আল্লাহর নবী *(সাঃ)*- কে বলতে শুনেছেন , মানবজাতির উপর এমন সময় অবশ্যই আসছে যখন দিনার *(স্বর্ণমুদ্রা)*

ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ছাড়া ব্যবহার করার মত বা উপকারী আর কিছুই থাকবে না।- (মুসনাদ, আহমদ)

সহায়ক ওয়েবসাইট-

● http://www.livepriceofgold.com/bangladesh-gold-price.html
● http://www.islamicmint.com/dinar-dirham.html
● http://www.e-nisab.com/misc
● http://musliminc.com/abdur-rahman-ibn-awf-the-richest-muslim-who-bought-his-way-to-jannah-4012

সহায়ক গ্রন্থ-

● আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া
● A Brief History of Money in Islam and Estimating the Value of Dirham and Dinar - M. Zarra Nazhad
● স্বর্ণ দিনার ও রৌপ্য দিরহাম- শাইখ ইমরান হোসেন
● আমিরুল মুমিনিন উসমান ইবনু আফফান রাযি- ড. যুবায়ের
মুহাম্মাদ
● উমার ইবনুল খাত্তাব রাযি- ড. সাল্লাবী
● আসহাবে রাসূলের জীবনকথা- ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ
● ফাতাওয়া গ্রন্থ- ফাতাওয়ায়ে রাহমানি, নির্বাচিত ফাতাওয়ায়ে মাদানিয়া, আপনার প্রশ্নের জওয়াব, ফাতাওয়ায়ে উসমানী

কাগুজে মুদ্রার প্রতারণা, ও বর্তমান দুনিয়ার অর্থব্যবস্থা

সম্পর্কে আরো জানতে পড়তে পারেন-

কাগুজে মুদ্রা, স্বর্ণের পাহাড়, ডলারের ফাঁদ, সুদের ছিটা--- https://goo.gl/OsYEJB
কাওমে শুআইব (আঃ) এবং বর্তমান ফ্যাসাদময় বিশ্ব ও মুদ্রাস্ফীতি ---- https://bit.ly/2KoPgI7
সুন্নাহ মুদ্রার বৈশিষ্ট্য ও বর্তমানে প্রচলিত কাগুজে নোট ---- https://bit.ly/2je7rDJ
ডলারের পতনঃ চীন ও রাশিয়া’র স্বর্ণ মজুদকরন ----- https://bit.ly/2r985XE

অফলাইন দাওয়াহ
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·FRIDAY, MARCH 8, 2019

- মুসলিমের সন্তান মুসলিম থাকবে কি না

- কাফিরের সন্তান মুসলিম হবে কি না

দুটোই নির্ভর করে একটা আমলের উপর— দাওয়াহ। সব নবীর উম্মত গোমরাহ হবার আগে মুসলিমই ছিল। দাওয়াহর অভাবে কাফির হয়ে গেছে মুসলিমদের পরবর্তী প্রজন্ম। আবার নবী এসেছেন। দাওয়াহ শুরু হয়েছে, কাফিরের সন্তানেরা মুসলিম হয়েছেন। দাওয়াহ না থাকলে মুসলিম বংশের সন্তানও নাস্তিক-মুরতাদ হয়ে যাবে। ইসলামের শুরু থেকে দাওয়াহ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এখনও গুরুত্বপূর্ণ, কিয়ামত পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ লেভেলের গুরুত্বপূর্ণ আমল। দাওয়াহ কার্যক্রমের মজবুতির উপর নির্ভর করবে আপনাদের মসজিদে কত লোক আসবে, আপনাদের মাদরাসাগুলোতে কতজন তাদের ছেলেকে পড়াবে, খানকাহগুলোতে কী পরিমাণ লোক আত্মশুদ্ধির জন্য আসবে, ইসলামী দলের

ভোট সংখ্যা কত হবে। ভোট জায়েজ-নাজায়েজ আমার আলোচ্য নয়। আমার পয়েন্ট হল- ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাগুলো কত বেগবান হবে, তা নির্ভর করে সমাজে দাওয়াহ ওয়ার্ক কতটা স্ট্রং তার উপর। এজন্য উপমহাদেশেই যদি তাকাই (যেহেতু বাইরের বিপ্লবগুলো অতটা জানি না) ফরায়েজী আন্দোলন বলেন, সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহঃ এর আন্দোলন বলেন, এক্সটেনসিভ দাওয়াহ ওয়ার্কই ছিল সাফল্যের ভিত। এমনকি মওদূদী রহঃ এর শুরুটা ব্যাপক জনসংযোগ, আইমিন দাওয়াহভিত্তিকই ছিল। বর্তমান কওমী রাজনৈতিক দলগুলোর কঙ্কালসার শরীরের পিছনে রোগও এটাই, জনবিচ্ছিন্নতা। আর ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (চরমোনাই) এর কিছুটা সাফল্যের পিছনে কারণ এটাই যে, ব্যাপক দাওয়াহ তাদের সাংগঠনিক কাজের অংশ। আমার মনে হয় আমি বুঝাতে পেরেছি, বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনমনে ইসলামের আবেদন ফেরাতে ইসলামিস্টদের একমাত্র মনোযোগ হওয়া উচিত- ব্যাপক দাওয়াহ।

এখন দেখি, দাওয়াহ কী? দাওয়াহ হল আহ্বান। ইসলামের দিকে আহ্বান, মানহাজ-প্রার্থী-সংগঠনের দিকে না। যে যেকোন ভাবে ইসলামের দিকে আহ্বান করছে, এটা দাওয়াহ। মুআযযিনের আযান, উলামাগণের দরস-ওয়াজ-বাহাস-লেখনী-সাময়িকী-টিভি প্রোগ্রাম, মুবাল্লিগদের ডোর-টু-ডোর মেহনত, মুজাহিদের তরবারি। সবই দাওয়াহ। নির্বাচনের ঠিক আগমুহূর্তে গিয়ে প্রার্থীর ভোট চাওয়া, এটাকে আসলে ঠিক দাওয়াহ বলা যায় না। দাওয়াহ হবে ইসলামী চেতনার, ইসলামের। সারাবছর ফিল্ডওয়ার্ক করে তারপর না বছর শেষে রেজাল্ট আসবে? ঠিক ভোটের আগে যাই বলেই কাঙ্খিত রেজাল্ট আসে না। জনগণের ভিতর ব্যাপক দাওয়াহর দ্বারা ইসলামী চেতনা জাগান, ইসলামের টোটাল সমাধান পাওয়ার পিপাসা জাগান, বুঝান যে ইসলামেই তোমার সমস্যার সমাধান। তাহলে যে ডালি আপনি সামনে ধরবেন, তাই ভরে উঠবে, মসজিদ-মাদরাসা-খানকাহ-রাজনীতি, যেটাই ধরবেন।

এবার একটা সহজ উদাহরণ।

সিনারিও এক. মহল্লার স্বল্পপরিচিত কোন মুসল্লি, এই জাস্ট মসজিদে দেখা হয়, সালাম বিনিময় হয়। ফোন করেছে, ভাই অমুক দিন আমার মেয়ের বিয়ে অমুক কম্যুনিটি সেন্টারে, আপনি এলে খুব খুশি হব। বা কাউকে দিয়ে একটা কার্ড পাঠিয়ে দিল।

সিনারিও দুই. হঠাৎ কলিংবেল। ভদ্রলোক নিজেই হাজির। হাতটা ধরে- ভাই আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে। আপনি অবশ্যই আসবেন। আপনি এলে কী যে খুশি হব। আসবেন কিন্তু।

কোনটা বেশি প্রভাব ফেলবে আপনার উপর? প্রথমটা আপনার মনেই থাকবে না। কত দ্রুত মন থেকে বা ‘প্রায়োরিটি লিস্ট’ থেকে এটা উধাও হবে তা নির্ভর করবে স্বল্পপরিচয়, বিয়ের দিন বেশি কাছে হলে, সেন্টার দূরে হলে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আপনি যাওয়ার খুব চেষ্টা করবেন, যেহেতু নিজে এসে দাওয়াত দিয়েছে। যদি যেতে নাও পারেন, আপনার ভিতর একটা অপরাধবোধ কাজ করবে। ঐ ভদ্রলোক এর পরে কোন অনুরোধ করলে আপনি ফেলতে পারবেন না। এজন্য ‘আমার মনে হয়' সশরীরে দ্বারে দ্বারে দাওয়াহ অন্যান্য সকল মাধ্যমের তুলনায় বেশি ইফেক্টিভ। অথচ, কিছুটা কঠিন বলে সব মানহাজে এই সাইডটা অবহেলা করা হয়। মওদূদী সাহেবের ফরমেটেও এটা একসময় জোরালোভাবে ছিল, পরে ধীরে ধীরে উপেক্ষিত হয়ে গেছে। এবং যত সফল বা প্রায় সফল বিপ্লব হয়েছে, আপনারা দেখবেন এই সশরীরে দাওয়াহ সেগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল।

এই সশরীরে দাওয়াহ কেবল প্রচারই নয়, আত্মশুদ্ধিরও মাধ্যম বটে। নফসকে কাবুতে আনার আমল। ইসলাম গ্রহণের পর সাহাবাদের গণআত্মশুদ্ধি দাওয়াহর দ্বারা হয়েছে। হায়াতুস সাহাবাহ ১ম খণ্ড,

পৃঃ ৮০-১৬০ তে দেখুন এক এক সাহাবী নবীজীর কাছে এসে ইসলাম কবুলের পর তাকে নিজ কওমের কাছে দাওয়াতে পাঠানো হয়েছে, দাওয়াতও চলেছে, ঐ নওমুসলিম সাহাবীর মজবুতিও এসেছে। কীভাবে ব্যাপক প্রচার, প্রত্যাখ্যান ও নির্যাতনের দ্বারা তাদের ঈমান পোক্ত হয়েছে, নফসের উপর দীনকে প্রাধান্য দেবার শক্তি তৈরি হয়েছে। যদিও আজ আত্মশুদ্ধি বলতে আমরা কিছু ইন্ট্রোভার্ট আমল বুঝি, সাহাবীদের আত্মশুদ্ধি ছিল এক্সট্রোভার্ট, দাওয়াহ ও জিহাদের মাধ্যমে— গণআত্মশুদ্ধি। দাওয়াহর জন্য নিজে উপযাচক হয়ে ছোট হয়ে যাওয়া নফসের জন্য ভারি, দাওয়াহ করতে গিয়ে মানুষের প্রতিক্রিয়া-অপমান সহ্য করার দ্বারা এবং একই কথা বারবার জবানে বলার দ্বারা অন্তরে বসে যাওয়া আত্মশুদ্ধির মাধ্যম। ইসলামে আসার পর সাহাবীদের গণতরবিয়ত মক্কায় হয়েছে দাওয়াতের দ্বারা, মদীনায় জিহাদের দ্বারা। জিহাদে পরিবার-জীবিকা ছেড়ে বের হওয়া নফসের জন্য কষ্টকর, কষ্ট সহ্য করা, সার্বক্ষণিক মৃত্যুভয় এবং স্বচক্ষে আল্লাহর মদদ দেখা জিহাদে গণআত্মশুদ্ধির কারণ হয়েছে। নবীজী আমাদের একটা সামগ্রিক মেহনত শিখিয়েছিলেন। এক ঢিলে বহু পাখি। প্রচার, ইসলাহ, সমাজমানস গঠন, শেখানো। সব একসাথে। এজন্যই সবার সমাজবিপ্লবের নকশায় দাওয়াহ এক নম্বর পয়েন্ট হিসেবে থেকেছে। সাইয়েদ কুতুব থেকে মওদূদী, সাইয়েদ আহমাদ শহীদ থেকে ইলিয়াস রাহিমাহুল্লাহ। আমার মতে, ইসলামের সব প্রচেষ্টাগুলোতেই এখন ব্যাপকভাবে এই অংশটা জোরদার করা দরকার-সশরীরে দাওয়াহ। এবং অবশ্যই বিতর্কিত কোনো বিষয়ে না, নিজ সংগঠনের দিকে নিজ মানহাজের দিকে না; দাওয়াহ হবে বেসিক ইসলামের- বেসিক তাওহীদের (তাওহীদের ব্যাখ্যা লেভেলে আবার মতভিন্নতা আছে)। লোকদের মধ্যে ইসলামে বাতলানো সমাধানের পিপাসা তৈরি করতে হবে। আর তার গেট হল তাওহীদ। যে তাওহীদের গেট দিয়ে ঢুকবে, সে সমাধান পাবে। ক্বুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তুফলিহু, সফল হয়ে যাবে। ইসলামের পিপাসা সমাজে সৃষ্টি হলে দীনের সব প্রচেষ্টায় জোয়ার আসবে।

দীন পালনে সচেষ্ট ও দীনের বিজয়ে উন্মুখ অনেক ভাই অফলাইন দাওয়াহর প্রয়োজন বুঝেছেন ও দিচ্ছেনও। তবে উপযুক্ত ট্রেনিং বা ফরম্যাট বা কৌশল জানা না থাকায় হয় বলতে গিয়ে অসুবিধায় পড়ছেন, খেই হারাচ্ছেন কিংবা ফল বিলম্বিত হচ্ছে। একটু ঘষেমেজে নিলেই আমার অফলাইন দাওয়াহ আরও শাণিত ও গভীর হতে পারে। আমি বরাবরের মতই তাবলীগের আঙ্গিকে আলোচনা করব। আপনারা নিজ মানহাজে ফেলে চর্চা করবেন। তাবলীগে দাওয়াহ-ই ছিল আমাদের আত্মশুদ্ধির প্রধান ওজীফা। শায়খ আশরাফ আলী থানভী রহঃ বলেন,

আমি যে আমলের উপর উঠতে চাই, তার দাওয়াত দিই। ফলে সেই আমল করা আমার সহজ হয়। আবার যে গুনাহ আমি ছাড়তে চাই, তার খারাবির দাওয়াত দিই, ফলে তা ছাড়া আমার সহজ হয়।

এজন্য তবলীগে দাওয়াহ দেয়া শেখানো, হাতেকলমে শেখানো ও চর্চা করানো হয়, কৌশল শেখানো হয়, কাকে কীভাবে এপ্রোচ করা হবে তার রাফ আইডিয়া দেয়া হয়। তাবলীগের বাইরে নানান মানহাজে অফলাইন ম্যান-টু-ম্যান মেহনত করছি যে ভাইয়েরা, তাদের উপকারার্থে আজকের নোট।

লাস্ট ইজতিমার বয়ান থেকে-

দাওয়াহর মূলসূত্র হলো, আযান। আযানের দুআয় নবীজী সা. আযানকে বলেছেন ‘দাওয়াতুত তাম্মাহ' বা পরিপূর্ণ দাওয়াত। এজন্য আমাদের দাওয়াহর ফরম্যাট আমরা আযান থেকে নিব।

১.

প্রথমে বলে নিব আল্লাহর বড়ত্ব (আল্লাহু আকবার), শক্তি, ক্ষমতা, রাজত্বের সর্বব্যাপিতা।

" হে কম্বলাবৃত, উঠুন, সতর্ক করুন, আপনার রবের বড়ত্ব বয়ান করুন।" (সূরা মুদ্দাছছিরঃ ১-৩)

আল্লাহ কত বড়, আল্লাহ যদি চান আমার কতখানি কল্যাণ করতে পারেন, আর যদি চান আমার কতবড় ক্ষতি করতে পারেন। তিনি সৃষ্টি করতে চাইলে কল্যাণ করতে চাইলে কোন ম্যাটেরিয়াল লাগে না। তিনি ইচ্ছা করলেই সব হয়ে যায়, কুন ফাইয়াকুন। যেখানে আমি কোন সমাধান দেখি না, সেখানে আল্লাহ গায়েব থেকে আমার সমস্যার সমাধান করতে পারেন। নবী আলাইহিস সালামগণের ঘটনা উদাহরণ হিসেবে আনা যেতে পারে। ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আপন পিতাও (মতান্তরে চাচা) পোড়াতে চেয়েছেন, রাষ্ট্র-পরিবার-সমাজ সবাই বিরুদ্ধে, আগুনে ফেলাও হয়েছে। সেই আগুনকেই আল্লাহ তাঁর ইজ্জত ও আরামের কারণ বানিয়েছেন।

২.

আল্লাহর একত্ব ও এককত্ব। (আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) আল্লাহ একাই ছিলেন, পরেও একাই থাকবেন। একাই ইবাদতের যোগ্য। পালেন একা, খাওয়ান একা, সৃষ্টি করেন একা, সুস্থ্য করেন একা।

"বলুন, হে আল্লাহ,হে সমস্ত রাজ্যর মালিক, আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন, যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা ইজ্জত দান করেন, যাকে ইচ্ছা বেইজ্জত করেন। কল্যাণ আপনার হাতেই, নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান"। (সূরা আলে ইমরানঃ ২৭)

এগুলো করার জন্য তিনি কোন বস্তু-মাধ্যম-সত্তার মুখাপেক্ষী নন। এজন্য তোষামোদ-খোশামোদ যদি কারো করতেই হয় তো সে আল্লাহ। ২৪ ঘণ্টা আমার সকল প্রচেষ্টা যদি কেউ পাবার হকদার হয়, তো তিনি আল্লাহ। হযরতজী ইনআমুল হাসান কান্ধলভী রহ. ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ব্যাখ্যায় বলতেন, ‘জী লাগানে কি লায়েক আল্লাহ ছাড়া কোয়ি নেহি’। মন-

প্রাণ-অন্তর কাউকে/ কোন ব্যস্ততাকে যদি দিতেই হয়, সে আল্লাহ। দিল লাগানোর উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ। মানুষের ভালমন্দ কীসে তা জানেন একমাত্র আল্লাহ। তাই আইনদাতাও একমাত্র তিনিই, তাঁর আইনেই মানবজাতির কল্যাণ। সত্তায় ও গুণাবলীতে তিনি একা।

৩.

এরপর বলব যে, মুহাম্মদ সা. সেই একক আল্লাহর পাঠানো ব্যক্তি, রাসূল (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ)। তাঁকে দিয়ে আল্লাহ দীন পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে। দীন হল, একক আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য লাইফস্টাইল বা সিস্টেম। যাই আমরা করি এই অনুমোদিত সিস্টেমে না করলে সেই একক আল্লাহ মেনে নেবেন না আমাকে।এজন্য রাসূল মুহাম্মদ সা. এর সিস্টেমে (পন্থায়) ব্যক্তিজীবনে সুখ, পারিবারিক জীবনে শান্তি, সামাজিক জীবনে নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমাধান, পরকালীন জীবনে মহাসফলতা। আর এই স্পেসিফিক সিস্টেমটা ছাড়া আর যত সিস্টেম আছে (পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ব্লা ব্লা), সব সিস্টেমে ব্যক্তিজীবনে অসুখ, পারিবারিক জীবনে অশান্তি, সামাজিক জীবনে নিরাপত্তাহীনতা, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমস্যা, পরকালীন জীবনে মহাধ্বংস।

"যে আমার কথা মানিল এবং আমার আনীত দ্বীনের অনুসরণ করিল সে বাঁচিয়া গেল।আর যে আমার কথা মানিল না এবং আমার আনীত দ্বীনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিল সে ধ্বংস হইয়া গেল। " (বুখারীঃ৭২৮৩)

৪.

এরপর তাকে যে আমলের দাওয়াহ দিতে চাই, সেটা (হাইয়া আলাস সলাহ)। নামায হতে পারে, রোজা হতে পারে, মসজিদের নির্মাণে সদকা হতে পারে,

মুহাজিরীনদের জন্য মাল জমা হতে পারে, তালিম-তাফসীরের হালাকার জন্য হতে পারে।

৫.

কেন এই আমলটা তার করা দরকার, কী লাভ, কী পাবে করলে (হাইয়া আলাল ফালাহ)। আর না করলে কী ক্ষতি। ইহলোক-পরলোকে কি সমস্যা। এ অংশে সরাসরি হাদিসে বর্ণিত লাভ-ধমকি উদ্ধৃত করা চাই। এজন্যই ফাজায়েল (ফজীলত) সংক্রান্ত হাদিসগুলো দাঈদের মুখস্ত থাকা দরকার। এক তো দাওয়াতের কাজের জন্য। আর দুই, মাসায়েল একবার শিখলাম তো শেখা হয়ে গেল। কিন্তু ফাজায়েল প্রতিদিন শুনলে ঈমান বাড়ে। মানুষ ভুলে যায়, প্রতিদিন একটু একটু শোনার/ পড়ার অভ্যাস করলে আমলের প্রতি আগ্রহ বজায় থাকে। এজন্য প্রতিদিন ফাজায়েল সংক্রান্ত হাদিস হালাকা আকারে শোনার সাথে ঈমান বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। মুন্তাখাব হাদিস, আদাবুল মুফরাদ, রিয়াদুস সলিহীন বা আলিমগণের পরামর্শ মোতাবেক অন্য কোন কিতাব বেছে নিলে দাওয়াতের যোগ্যতার সাথে সাথে ঈমানের ক্ষয়পূরণও হতে থাকবে।

তাবলীগে দাওয়াতের কথাগুলোর একটা ফরম্যাট আমরা শিখেছিলাম। এই ফরম্যাটে ফেলে ১ মিনিটও দাওয়াত দেয়া যায়, ৫ মিনিটেও দিতে পারবেন, আবার সুযোগ থাকলে বসে ৩০ মিনিট কথাও বলতে পারবেন, ১ ঘণ্টা বয়ানও করা যাবে ছোট কোন জমায়েতে।

১. সালাম ও মুসাফাহা:

সালাম মাদ'উ (যাকে দাওয়াহ দেয়া হচ্ছে) ব্যক্তির মনে আপনার ভালোবাসা তৈরি করবে। (হাদিস) এবং এই ভালোবাসা পরিপূর্ণতা পাবে মুসাফাহায়।

তবে হাত নিয়ে নিজের হাতের ভিতর রেখে দিলে অনেকে বিরক্ত হন। তাই এটা অনুচিত। এরপর সময় ও পূর্বপরিচয় সাপেক্ষে কুশলাদি বিনিময় হতে পারে।

২. আল্লাহর নিআমত স্মরণ করিয়ে দেয়া:

" এবং আপনার রবের নিআমতের কথা ঘোষণা করুন/ আলোচনা করুন" (সূরা দোহাঃ১১)

কেউ যখন দুনিয়ার আলোচনা করে তখন আমরা কান লাগিয়ে শুনি, আর আখিরাত বা আল্লাহর আলোচনা উঠলে উদাসীনতার সাথে শুনি। নিজেকে দিয়েই টেস্ট করতে পারেন। যে মুহূর্তে আল্লাহর প্রসঙ্গ উঠবে ঐ মুহূর্তে মনোযোগ কমে যাবে, আগে যে মনোসংযোগটুকু আপনার এমনিতেই ছিল এখন সেটুকুও জোর করে রাখতে হচ্ছে। এটা শয়তানের পক্ষ থেকে। এজন্য দাওয়াহর শুরুতে তাকে আল্লাহর নিআমত ও গুরুত্বের কথা শোনাতে হবে। তুমি যে এই মুহূর্তে সুস্থ, এটা আল্লাহ আমাদেরকে রেখেছেন। কত মানুষ হাসপাতালে, আমি তুমিও থাকতে পারতাম। আল্লাহ রাখলে আমাদের আটকানোর ক্ষমতা ছিল না। এই যে দোকান-ব্যবসা করছো এটা তো আল্লাহই দিয়েছেন। এই যে জীবন, এই যে ২৪ ঘণ্টা, কে দিলেন? এই যে আলো-বাতাস-অক্সিজেন, কার দেয়া? এই আমরা মুসলিম, কাফির বানালে কী করার ছিল, অনন্ত আগুনে জ্বলতাম, এই ঈমানের নিআমত বা চাইতেই কে দিলেন? এইবার ফণা নুয়ে আসবে। কান লাগাবে বাকি কথায়। আল্লাহর গুরুত্ব স্মরণে এসেছে এবার। এবার কান লাগিয়ে শুনবে।

৩. কালিমা:

দাওয়াহ যেকোন এক পর্যায়ে বা মওকায় স্পষ্ট সহীহ উচ্চারণে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ নিজে পড়ে সাথে সাথে তাকেও পড়তে উৎসাহিত করা। অর্থও তার মুখে বলানো- আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই, মুহাম্মদ সা. সেই আল্লাহর রাসূল।

কালিমাওয়ালা জাহান্নামে অজানাকাল পুড়ে হলেও একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে ইনশাআল্লাহ। এটাই আহলুস সুন্নাহর আকীদা। আল্লাহ চাহেন তো, আজকের এই কালিমার স্পষ্ট সত্যায়ন হাশরের মাঠে তার কাজেও আসতে পারে।

৪. তাওহীদ: আগের আলোচনার ২ নং পয়েন্ট।

৫. রিসালাত: আগের আলোচনার ১ নং পয়েন্ট

৬. আখিরাত:

এরপর দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব-নগণ্যতা-ধোঁকা এবং আখিরাতের চিরস্থায়িত্ব-আসল জীবন-সুখের অসীমতা আলোচনায় আসবে। এখানে আমরা মুসাফির, ওখানটা আমাদের আসল ঠিকানা, আসল গন্তব্য। কবরে কী কী হবে, হাশরের মাঠে কী কী হবে, সীরাতের পুলে-জান্নাতে-জাহান্নামে কী কী আছে। সময় অনুপাতে সংক্ষিপ্ত বা বিশদ আলোচনায় আসবে।

"হে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হে হিন্দ বিনতে ওতবাহ, খোদার কসম তোমরা একদিন অবশ্যই মৃত্যুবরণ করিবে। তারপর পুনরায় তোমাদিগকে জীবিত করা হইবে।অতঃপর নেককার বেহেশতে এবং বদকার দোযখে যাইবে।আল্লাহর আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকেই সর্বপ্রথম সাবধান করা হইল।" বর্ণনাকারী মুআবিয়া রাঃ (কানয)

৭. নিয়ত করানো:

দাওয়াহ দিয়ে ফেলে রেখে আসলে রেজাল্ট আসবে না। বিষয়টা এমন হলো, তাকে ময়লা থেকে তুলে ধুয়ে আবার ময়লাতে ফেলে এলেন। সম্ভব হলে সাথে করে মসজিদে আনা যদি পরের ওয়াক্ত নিকটবর্তী থাকে। নয়তো তাকে কোন একটা ঈমানবান্ধব পরিবেশে আসার জন্য নিয়ত করানো। সেটা প্রতি ওয়াক্তে মসজিদে আসা হতে পারে, তালিমের হালাকা, কোন তাফসীরের হালাকা, কোনো শায়খের মজলিস। আমরা শুনি, খুব উপকার পাই, আপনিও থাকার নিয়ত করেন ইনশাআল্লাহ। (হাদিস) নিয়ত মানে ওয়াদা না, শয়তান এখানে একটা খেলা খেলে। আমাদেরকে ভাল কাজের নিয়তই করতে দেয় না। নিয়ত করার পর না তৌফিক মিলবে।

ধরেন সে এলো না, আবার একদিন গেলেন, দাওয়াহ দিলেন, পরিবেশে আসার কথা বললেন, আবারও এলো না। একদিন তার মনে হবে, ওরা বার বার আসে, আমি একবারও যেতে পারি না, এবার যাবোই। শুরুতে বিয়ের দাওয়াত নিয়ে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম। একবার পরিবেশে এলে অন্তরের যে পরিবর্তন, তা পূর্বের পরিবেশে ৫০ বার দাওয়াহ দিলেও ঐ পরিবর্তন আনা কঠিন। এজন্য পরিবেশে আনার জন্য চেষ্টা করা, তবলীগের ভাষায় বলে তাশকীল। এটা ছাড়া দাওয়াহটা পরিপূর্ণতা পেল না। তাকে দীনে আনার জন্য আপনার প্রচেষ্টাটা এর দ্বারা পূর্ণ হলো। তবে জোরাজুরি না করা, বার বার গিয়ে তার নিজের ভেতর থেকে অপরাধবোধ, দায়িত্ববোধ জাগানোটা উদ্দেশ্য। আজকেই আনতে হবে, এনেই ছাড়ব, এমন না ব্যাপারটা।

এটা একটা রাফ ফরমেট। ৭ টা পয়েন্ট টাচ করে আপনি ৭ মিনিটে দাওয়াহ শেষ করতে পারেন। আবার আধা মিনিট করে সাড়ে তিন মিনিটেও শেষ করতে পারেন। রিকশাওয়ালা-দোকানদার বেশি সময় আপনাকে দেবে না। তাকে ৩.৫-৭ মিনিটে এই ফরমেটে দাওয়াহ দিতে পারেন, পরিচিত বন্ধুকে ১৫/২০ মিনিট নাসীহা করতে পারেন।

মহল্লায় আমরা তাবলীগী ফরমেটে ২ ধরনের ওয়ার্ক করি একটা র্যান্ডম দাওয়াহ, সবাইকে গণহারে, সামনে যাকে পাব তাকেই। নিজের ঈমান বাড়ানোর জন্য। আরেকটা টার্গেটেড দাওয়াহ, দীর্ঘমেয়াদী। টার্গেট করে করে। উনি ফাঁকা আছেন, সামনে সরকারি ছুটি আছে, হয়তো ৩ দিনের জন্য আমাদের সাথে ঈমানবান্ধব পরিবেশে যেতেও পারেন। এরকম টার্গেটেড দাওয়াহতে আরও দুটো-তিনটে কৌশল আছে।

১. যাকে আপনি দীনের পথে আনতে চান তাকে হাদিয়া দিন। সুন্নাহ জিন্দা করা। সম্পর্ক গভীর করে দাওয়াহ পেশ করা।

২. মেহমানদারি করে সম্পর্ক তৈরি করা। খানা খাওয়ানো। এরপর দাওয়াহ পেশ করা। একজন মজা করে বলেছিল, enter into his heart through his stomach. হা হা। অবশ্যই আল্লাহর জন্য। তাকে আল্লাহমুখী করার জন্যই তো এতোকিছু।

৩. তার নাম ধরে দুআ ও নফল আমল করা। মওলানা তারিক জামিল হাফিযাহুল্লাহ পপস্টার জুনায়েদ জামশেদের (রাহিমাহুল্লাহ) জন্য ৫০ রাকাত নফল নামায পড়েছিলেন। মেডিকেল-বুয়েট-ভার্সিটিতে তবলীগওয়ালাদের মধ্যে এটা খুব কমন প্র্যাকটিস। জুনিয়র ছেলেদের জন্য নফল রোযা, সাদাকা, তাহাজ্জুদে নাম ধরে দুআ। ভাগ ভাগ করেও নেয় অনেক সময়। আমার মহল্লায় বাবর ভাই নফল সাওম রেখে দাওয়াতে বের হতেন। তিন দিনের জামাতেও তিনদিনই রোযা রেখে দাওয়াহ দিতেন। আপনারাও প্রিয়জনকে দাওয়াহ করারা ক্ষেত্রে কৌশলটা কাজে লাগাতে পারেন। হিদায়াত তো আল্লাহই দিবেন, আমরা কেবল বাহানা বানাবো, তাই না?

আমার বন্ধু ইমরান বলছিল সেদিন। দোস্ত, প্রত্যেকটা মানুষের দিকে তাকা, দেখ প্রতিটা মানুষ জ্বলছে ভিতরে ভিতরে। প্রত্যেকের ভিতরে

একটা জ্বালা, একটা কষ্ট। ঠিক তাই, আজ ইসলাম ছেড়েও দিয়ে প্রতিটা মানুষ মহাসমস্যায় মহামুশকিলে পড়ে গেছে। মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য ইসলাম থেকে আরও দূরের পথ বেছে নিচ্ছে। রিজিকের সমস্যা? সুদ নিয়ে ব্যবসা কর তাহলে। এবং আবশ্যিকভাবে আরও সমস্যায় পরে যাচ্ছে। আমরা যারা দীন বুঝেছি কিছুটা, এখন আমাদের কাজ অনেক, দায়িত্ব ম্যালা। এক এক বেখেয়াল লোকের কাছে গিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বুঝাতে হবে, শোনেন ভাই, আপনার সমস্যার সমাধান তো ইসলামে। সে শুনতে চাবে না, তবুও শোনাতে হবে। সে রাগ হবে, তাড়িয়ে দেবে, কটূকথা বলবে। তারপরও তাকে বুঝাতে হবে। কেননা সে মহাবিপদে আছে দুনিয়ায়, মৃত্যুর পর মহামহামহাবিপদে পড়ে যাবে। এক হাদিসে নবীজী বলেন কমবেশি এমনঃ

আমার আর তোমাদের উদাহরণ এরকম, যেমন আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত পোকামাকড়। তোমরা সকলে ঝাঁপ দিয়ে আগুনে গিয়ে পড়ছো, আর আমি কোমড় ধরে তোমাদের এক এক জনকে বাঁচাচ্ছি।

আমাদেরও একই কাজ। এটাকে উম্মতের দরদ বলে। আহা রে, আমার নবীর উম্মত। তাঁর উম্মত জাহান্নামে যাচ্ছিল, আর আমি তাঁর মহব্বতের উম্মতের জন্য কিছুই করলাম না, তাঁকে মুখ দেখাবো কী করে।

তো লেগে যাই আজ থেকেই। আল্লাহ আমাদের ভাঙাচুরা বাহানাগুলোকে কবুল করে আমার ও পুরো উম্মতের হিদায়াতের ফায়সালা করে দিন। আমীন।

যৌনশিক্ষা: যে কথা যায় না বলা
SHAMSUL AREFIN SHAKTI·FRIDAY, MARCH 22, 2019

যৌনতা নিজেই একটা ট্যাবু (যে কথা যায় না বলা)। ব্যাপারটা এমন না যে, শুধু পাক-ভারত-বাংলাতেই ট্যাবু, বা মুসলিমপ্রধান

এলাকাগুলোতেই ট্যাবু। বেসিকালি চিরকাল ট্যাবুই ছিল একেশ্বরবাদী সমাজগুলোতে। রক্ষণশীল ইহুদী সমাজে ও ক্যাথলিক সমাজে যৌনবিষয়ক খোলামেলা আলোচনা হত, এমন খবর চোখে পড়ে না। মূর্তিপূজারী এবং প্যাগানসমাজে যৌনতা খানিকটা খোলামেলা থাকায় আলোচনাও ট্যাবু ছিল না, কখনোসখনো সেক্স ছিল পূজারই অংশ। এজন্য বাৎসায়নের কামসূত্র, খাজুরাহোর মন্দির, শিবলিঙ্গপূজায় এর আঁচ করা যায়। পরবর্তীতে দীর্ঘ মুসলিম শাসনের প্রভাবে যৌনবিষয়ক আলোচনা ব্যাপকতা হারায় এতদাঞ্চলে। গ্রেকো-রোমান সমাজে সমকামের ব্যাপক প্র্যাকটিস প্রমাণ করে যে স্বাভাবিক যৌনতাও কতটা খোলামেলা ছিল।

পুঁজিবাদের উত্থানে যখন সামাজিক-পারিবারিক-ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো বাধা হয়ে দাঁড়াতে থাকল, তখন ট্যাবুগুলোকে ভেঙে ব্যবসাবান্ধব করার প্রয়োজন দেখা দিল। বিংশ শতকের শেষভাগে এসে এমন এমন সব থিওরির দেখা মিলল, যা যৌনতার সংজ্ঞাকেই বদলে দিল। খুব ভালো করে দেখেন, যৌনতার সংজ্ঞা বদলে দিতে পারলে সামাজিক-পারিবারিক-ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো সব ভেঙে দেয়া যায়। কারো মনে জেতা-ঘোড়ার উপর বাজি ধরতে পারলে, মানে বিজ্ঞানের মিশেলে যদি যৌনতার এইসব বিকৃত সংজ্ঞা বসিয়ে দিতে পারেন; তাহলে ধর্ম ও পরিবার থেকে তাকে বের করে আনা যায়। এখন সে পুঁজিবাদের সকল দোকানের সহজ শিকার, বান্ধা কাস্টমার। সেক্সুয়াল ফ্লুইডিটি, ট্রান্স-জেন্ডার, লাইফস্টাইলের নামে পশুকাম-সমকাম, ‘লিঙ্গ নাকি দৈহিক বিষয় না, সমাজ কর্তৃক আরোপিত’-ইত্যাদি কনসেপ্টের নামে সেই আয়োজনই করছে পুঁজিপতিরা। গে-জিনের আবিষ্কর্তা নিজে সমকামী, ‘জেন্ডার’ কনসেপ্টের পুরোধা জন মানি নিজে উভকামী। এগুলো না ধরতে পারলে আসেন মুড়ি খাই।

আমার স্বল্প পড়াশুনায় মনে হয়েছে, ইসলাম যৌনতাকে ঠিক সেভাবেই দেখে যেভাবে দেখা প্রয়োজন। এটা একই সাথে ট্যাবু (আলোচনা নিষেধ) এবং আলোচনা জরুরি। এর অবাধ আলোচনা যেমন নির্লজ্জতা, এর আলোচনা না থাকাটাও ঝুঁকিপূর্ণ। ঠিক ততটুকুই আলোচনা হওয়া চাই, যতটুকু

ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ ঠিক রাখতে দরকার। প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে ইয়ার্কি-ফ্যান্টাসির সীমায় গিয়ে পড়লে এটা অবশ্যই ট্যাবু। ‘সত্য বলতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল লজ্জা পান না’ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কথাতেই বুঝা যাচ্ছে, যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু যৌন-আলোচনা বা যৌন শিক্ষা দীনেরই অংশ, যেহেতু যৌনজীবন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। এজন্য ইসলামে রজঃচক্র, স্বামী- স্ত্রী সহবাস, জানাবাত, বালেগ হওয়া প্রভৃতি সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা এবং আরও বিস্তারিত আলোচনার সূত্র দেয়া হয়েছে। কুরআন-হাদিস-ফিকহের কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয়তা ও প্রায়োগিকতার মাঝে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, যা দীনী ইলমেরই অংশ।

অথচ আজ মুসলিম সমাজেও যৌনশিক্ষা ট্যাবু কেন? যখন থেকে ব্রিটিশরা শিখিয়েছে ‘ইসলাম হল ধর্ম, জাস্ট ধর্ম’; সেদিন থেকে আমাদের ধ্বংস শুরু। নামাজ-রোযা-হজ্জের বাইরে আর কোথাও ইসলাম নেই। বাজার-অর্থব্যবস্থা-বিচার-আইন-লাইফস্টাইল সবখানে ইসলাম অপাংক্তেয় হয়ে গেছে সেদিন থেকে। ইসলাম মানে আর ‘আত্মসমর্পণ’ থাকেনি, ইসলাম মানে হয়ে গেছে ‘শান্তি’। স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানেও যে ইসলাম আছে, আমার আর আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝেও যে ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে— তা আজ স্বীকারই করে না, এমন মুসলিমও আছে। এজন্যই শোনা যায়— ‘সবকিছুর মধ্যে শুধু ধর্ম টেনে আনিস কেন?’। টেনে আনব কেন, ইসলাম তো আছেই সবকিছুর মধ্যে। সবকিছুতে নিজের ইচ্ছাকে দমিয়ে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণকেই তো বলে ইসলাম।

ভূমিকা অনেক বড় হয়ে গেল, স্যরি। আপনি যদি সঠিক সময়ে সঠিক শিক্ষাটা তাকে না দেন, তবে বেঠিক সময়ে বেঠিক লোকে তাকে বেঠিক শিক্ষাটা দেবে। হয় সে বখে যাওয়া কোন বন্ধুর থেকে শিখবে, না হয় ইন্টারনেট তার শিক্ষক হবে, নয়তো কোন পর্নোম্যাগাজিন বা কলিকাতা হার্বালের পোস্টার থেকে সে যৌনতা সম্পর্কে একটা ভুল এবং অপ্রায়োগিক জ্ঞান পাবে, যার সাথে বাস্তবের কোন মিল নেই।

কোন ‘ইঁচড়ে-পচা’ বন্ধু তাকে শেখাবে ‘ডানহাতি স্ক্রু নিয়ম’। (সায়েন্সের পোলাপান বুঝবে)

ইন্টারনেট তার কাছে বমির-যোগ্য কিছু প্র্যাকটিসকে পবিত্র ও উপভোগ্য করে তুলবে।

ফুলবডি মেকাপ ও সিলিকন জেল ঢুকানো পর্নোস্টারগুলো স্বাভাবিক নারীদেহ সম্পর্কে তার মনে ভুল প্রত্যাশা গড়ে তুলবে।

সার্জারি করে বানানো অতিকায় পুরুষাঙ্গ তার মনে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স তৈরি করবে।

ভায়াগ্রা খেয়ে ৭ দিন ধরে শুটিং করা ১০ মিনিটের ভিডিও বিয়ে নিয়ে তার মনে অমূলক অহেতুক আশঙ্কা তৈরি করবে।

আর বড় বড় করে ‘যৌন’ লেখা কলিকাতা হার্বালের পোস্টার তাকে বুঝাবে— তোমার শরীর থেকে কী না কী ইম্পর্টেন্ট জিনিস বের হয়ে যাচ্ছে, তু তো গ্যায়া।

আমি তো মনে করি প্রতিদিন যাদের বিয়ে হচ্ছে, ১% এরও সঠিক যৌনশিক্ষা নেই। সেদিনও এক রুগী পেলাম, ১০ মাস বিয়ে হয়েছে। দ্রুত বীর্যপাত হয়, দ্রুত নরম হয়ে যায়। ১০ মাস ধরেই এমন। স্ত্রী এখন ফোনে তার আরেক বন্ধুর সাথে বেশি বেশি সময় দিচ্ছে। অথচ সামান্য একটু যৌনশিক্ষা হয়ত জীবনটা সুখময় করতে পারত, যদিও সবই তকদীর, আমাদের সচেতন চেষ্টার কথাই বলছি।

পিরিয়ড শুরু হয়ে গেলে আমাদের মেয়েরা বেসিক যৌনশিক্ষাটা মায়ের কাছ থেকে পেয়ে ফেলে। নারী-পুরুষ বায়োলজির কারণ, ক্রিয়া, পিরিয়ডের কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে মেয়েরা জেনে নেয় মায়ের কাছে থেকে। এজন্য মেয়েদের জানাটা সেফ ও সঠিক হয়। যতটুকু আলোচনা মা-মেয়েতে হয়, দীনী সীমারেখাগুলো আলোচনা করা থাকলে তা যথেষ্ট। আমরা একটা ডেমো দেখব একটু পরে। আর বিয়ের আগে ভাবী/বড়বোন/ সমবয়েসী খালা-ফুপুদের কেউ সহবাস রিলেটেড আলোচনাগুলো করে দিলেই হয়ে গেল। তবে সমস্যা হল, সবাই

এগুলো নিয়ে জোকস করে, কেউ সিরিয়াসলি কিছু আলোচনা করে দেয়া দরকার। অবশ্য যাঁরা আলোচনা করবেন, তাঁদের ক’জনারই স্পষ্ট ধারণা আছে।

সমস্যা হল ছেলেদের, ব্যাপক সমস্যা। মেয়েরা মায়েরও ক্লোজ থাকে, বাবারও আদর পায়, পারতপক্ষে বাবারা মেয়েদের বকুনি/পিটুনি দেয় না বললেই চলে, মেয়েদের অত শাসন লাগেও না। কিন্তু ছেলেরা মায়ের আহ্লাদ পায়, কিন্তু এসব বিষয়ে ফ্রী হওয়া সম্ভব না। আবার বাপের সাথে কিছুটা মার-পিটের সম্পর্ক থাকে বলে বাবার সাথে বেশ দূরত্ব নিয়েই বড় হই আমরা। বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো। একারণে মেয়েরা যতখানি সঠিক যৌনশিক্ষা নিয়ে বড় হয়, ছেলেদের মনে ততটাই বেঠিক শিক্ষা গেড়ে বসে। তবে ফাইনাল কথা হল, ছেলেরা যৌনশিক্ষা বাপের থেকেই পেতে হবে। কেননা বাপ ছাড়া আর যত সোর্স সে এই বয়সে পায়, সবাই তাকে ভুল শিক্ষাটাই দিবে। বাপ হয়ে কীভাবে সম্ভব? কেন, মা হয়ে মেয়েকে শেখাতে পারলে বাপ হয়ে কেন পারবেন না? এসব ন্যাকামো বাদ দেন, বিষয়টা কতখানি জরুরি এটা ফীল করি আসেন। ছেলে পর্নো-আসক্ত বা সমকামী হয়ে গেলে তখন তো হায় হায় করবেন। কিছু পয়েন্ট মনে রাখতে হবে—

- বিষয়টা বার বার আলোচনা করার মত না। বার বার আলোচনা করলে সন্তান আর ভয় পাবে না আপনাকে, ওয়েট লস হবে। এজন্য আলোচনা হবে একদিনই, মাইন্ড ইট।

- আলোচনাটা হবে ইয়ার-দোস্ত স্টাইলে না, শিক্ষক-ছাত্র স্টাইলে। শিক্ষক-ছাত্র আজকের কনটেক্সটে বুঝা যাবে না। ওস্তাদ-শাগরেদ স্টাইলে।

- বাপ-ছেলে বা রাজা-প্রজা স্টাইলে হলে সে আপনার কথাটা নিতে পারবে না, হুকুম টাইপ কিছু মনে করবে। এজন্য হয়ে পারে বাপ-বেটা কোথায় বেড়াতে গেলেন, সাথে নিয়ে মার্কেটে গিয়ে একসাথে কিছু কিনলেন, একসাথে মাকে ছাড়া কোন রেস্টুরেন্টে খেলেন। মূল কথা পাড়ার আগে এমন

কিছু একটা করতে হবে। যাতে পরের আলোচনাটা ‘হুকুম’ আকারে না হয়ে ‘ট্রেনিং সেশন’ আকারে হয়।

- শুরুটা এমন হতে পারে:

বাবা শোনো, তোমার সাথে খুব জরুরি একটা বিষয়ে আলোচনা করব। তুমি আজকের এই আলোচনাটা জীবনে কোনোদিন ভুলবে না। এমনকি আমি যেভাবে তোমাকে বলছি, সেভাবে তুমিও তোমার ছেলের সাথে এভাবে আলোচনা করবে। তুমি এখন এখন বড় হচ্ছো। ভেবে দেখ, একসময় তুমি খেলনা গাড়ি কত পছন্দ করতে। এখন তুমি ক্রিকেট সেট, ফুটবল এসব পছন্দ কর। বড় হবার সাথে সাথে তোমার মনের কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে, দেখেছো? একইভাবে তোমার দেহেও পরিবর্তন এসেছে/আসছে/আসবে। লম্বায় বড় হবার সাথে সাথে তোমার গলার স্বর মোটা হবে, যেমন আমার। তোমার শরীরের গাঁথুনি শক্তপোক্ত হবে… এরই অংশ হিসেবে প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে প্রস্রাবের বদলে আঠালো এক ধরনের তরল আসতে পারে। তুমি ভয় পাবে না, এটাই স্বাভাবিক, সবার হয়, তোমার মত বয়সে আমারও হয়েছে। কখনও দেখবে ঘুমের ভিতরে বেরিয়েছে, ভয়ের কিছু নেই, এটা কোন অসুখ না…

- স্বপ্নদোষ বেশি হওয়াও কোন অসুখ না, এটা বুঝাবেন। একটা গ্লাসে দেড় গ্লাস পানি রাখলে বাকিটুকু উপচে পড়ে। তেমনি একটা বিষয় স্বপ্নদোষ। উৎপাদন তো চলছেই, ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত হয়ে গেলে বেরিয়ে আসে। এখন তোমার করণীয়, বেশি বেশি ভাল ভাল খাবার খাওয়া। ফলমূল খাওয়া। ডিম-মাছ-মাংস খাওয়া। মন থেকে টেনশন দূর করে দেবেন।

- নারী-পুরুষ কেমিস্ট্রিটা খুব সংক্ষেপে বলে দেবেন:

দেখ, দুনিয়ায় দুই ধরনের মানুষ আছে। পুরুষ আর মহিলা। তোমার কি প্রশ্ন জাগে, কেন মানুষ এক ধরনের হল না? এটা হচ্ছে সিস্টেম। তোমার শরীরে যে আঠালো পদার্থ তৈরি হচ্ছে, সেটা হল বীজ। আর তুমি যে

মেয়েকে বিয়ে করবে তার শরীরে এই বীজ পৌঁছালে, তোমাদের সন্তান জন্ম নেবে। এভাবে মানুষের জন্মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন আল্লাহ। এভাবে নতুন শিশু জন্ম নেয়।

- আবার আল্লাহর হুকুম জানিয়ে দিতে হবে:

তোমার দুষ্টু বন্ধুরা তোমাকে বিভিন্ন আজেবাজে বুদ্ধি দেবে। তুমি আমার কথা মনে রাখবে। সন্তানের জন্য বাবার চেয়ে ভালো আর কেউ চায় না। এই বীজ এমনিতেই উপচে বেরিয়ে গেলে সমস্যা নেই। কিন্তু তুমি স্বেচ্ছায় বের করলে আল্লাহ ভয়ংকর রাগ হবেন। তোমার শরীর ভেঙে পড়বে, তোমার বিবাহিত জীবনেও নানা অসুখবিসুখে অশান্তিতে আক্রান্ত হবে। এই বীজ কেবল তোমার স্ত্রীর জন্য, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে নিজেকে শেষ করে দেবেনা। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হবে, ভালো লাগবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে সেটা নিষেধ করেছেন, তোমার দৃষ্টিও কেবল তোমার স্ত্রীর জন্য। কোন খারাপ ছবি-সিনেমা থেকে সবসময় দূরে থাকবে, এগুলো যে বন্ধুরা দেখে বা দেয়, তাদের থেকেও দূরে থাকবে। নাহলে তোমার ভবিষ্যত কিন্তু অন্ধকার হয়ে যাবে, বাবা। সাবধান… বাবা হিসেবে তোমার কাছে আমার অনুরোধ। আর এ বিষয়ে যেকোন সমস্যা বা প্রশ্ন তুমি বন্ধুদের করবে না, আমাকে করবে, ঠিক আছে বাবা?

রাফলি এমন। এখন, কোন সময়ে আপনি তাকে এই সেশনটা নেবেন? কখন? ১১-১২ বছরে ছেলেরা বালেগ হয়। তবে এখন পর্নোর যুগে ৯-১০ বছরের বাচ্চারাই সব বোঝে। যদি সন্দেহ উদ্রেককারী লক্ষণ না পান তবে ১১-১২ বছরেই আলোচনাটা হবে। আর সন্দেহের কিছু পেলে, তখনই। আর মায়েরা মেয়েদের সাথে যথেষ্ট আলোচনা তো করেনই। বাকি আরেকটু জিনিস স্পষ্ট করে দেবেন:

- নারী-পুরুষ কেমিস্ট্রিটা:

মেয়েদের প্রতিমাসে একটা ডিম আসে, ডিম্বাণু বলে তাকে। একটাই পরিপক্ব হয়। ওটার প্রভাবে জরায়ুর (যেখানে বাচ্চা থাকে) জমিনটা উর্বর হয়, বীজ নেবার মত উপযুক্ত হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে বীজ পেলে তো বাচ্চা তৈরি হবে। আর যদি না পায়, তবে পুরো জমিনটা চাকা চাকা রক্তের আকারে বেরিয়ে আসে। এটা স্বাভাবিক, তুমি যেহেতু এখন বড় হয়েছো। এই বীজটা কোথায় আছে? বীজ আছে তোমার স্বামীর দেহে…

- আর আল্লাহর হুকুমগুলো:

আর এখন তুমি বড় হচ্ছ। মেয়েদের শরীরে যে সৌন্দর্য সেটা তোমার মাঝে এখন আসছে। ছেলেরা তোমার দিকে তাকাবে, তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইবে। তুমি কারো দিকে তাকাবে না। কোন ছেলের সাথে কথা বলবে না… তোমার স্বামীর সাথে বিয়ে হবার আগ পর্যন্ত নিজেকে হেফাজত করে চলতে হবে…খারাপ বান্ধবী যারা ছেলেদের সাথে সম্পর্ক করে, আজেবাজে গল্প করে তাদের এড়িয়ে চলবে।

এখন কিশোর-কিশোরীদের নাকি আবার যৌনশিক্ষা দেয়া হচ্ছে সরকারি- বেসরকারিভাবে। সেখানে যৌন-তারল্য (তুমি যা ভাবো তাই তোমার যৌনতা, লিঙ্গের উপর না) শেখানো হয়। পারস্পরিক সম্মতিতে যৌন অনুভূতি প্রকাশ নাকি দোষণীয় না। সমকামিতাকে ইনিয়েবিনিয়ে স্বাভাবিক করে তোলা হয়। এরকম জঘন্য পরিস্থিতিতে আপনি যদি তাকে সঠিক শিক্ষা দিতে লজ্জা করেন, তাহলে আল্লাহ মাফ করুন অনাকাংক্ষিত কোন ঘটনায় কাকে দোষ দেবেন। আরেকটা বিষয়, তাকে ছোট করে না রেখে, এ বয়সেই তাকে আদর্শ স্ত্রী বা স্বামী হবার মানসিক শিক্ষা দেয়া শুরু করুন। মানসিক শিক্ষাগুলো বার বার দেয়া যাবে, সমস্যা নেই। পুঁজিবাদ যদি এ বয়সে তাকে সেক্সের জন্য ফিট মনে করে যৌনশিক্ষার জন্য উপযুক্ত মনে করে, তাহলে আপনি কেন তাকে সংসারশিক্ষার জন্য উপযুক্ত মনে করছেন না? বড় হয়ে ওঠা বয়সের দ্বারা নির্ধারণ হয় না, শিক্ষার দ্বারা হয়, মানসিক পরিপক্বতার দ্বারা হয়। আগের যুগে দেখেন ১৭-২৫ বছরেই তাদের কত কত

অ্যাচিভমেন্ট, এখন কেন হচ্ছেনা। মনের বয়সকে আমরা আটকে দিয়েছি বলে। খেলাধুলা-কার্টুনের মাঝে তার সত্তাকে সীমাবদ্ধ ভাববেন না। এগুলোর বাইরে আরেকটা জগত তার মনে গড়ে উঠা শুরু হয়ে গেছে— যৌনমনোজগত। শুরুতেই সেই জগতে একটা টীকা (ভ্যাক্সিন) দিয়ে দেয়া আপনারই কাজ, যাতে পরে কোন রোগজীবাণু ঢুকতে না পারে। সঠিক ধারণাটা দিয়ে দিলে, ভুল ধারণাগুলো জায়গা পাবে না।

আরও কোন কিছু বাদ গেল কি না, জানাবেন। ‘কুররাতু আইয়ুন-২’ তে অ্যাড করে দিব ইনশাআল্লাহ। বিবাহিতদের যৌনশিক্ষার একটা আইডিয়া আমার কাছে আছে। ইনবক্সে অনেকেই পেয়েছেন, তারা অন্য বিবাহিতদের সাথে শেয়ার করবেন। আর অবিবাহিতদের জন্য একটা লিখছি, আল্লাহর ইচ্ছায়।
পর্নো-হস্তমৈথুন সবকিছু মিলিয়ে তো, একটু সময় লাগছে।

আল্লাহ আমাদেরকে সন্তানের জন্য বেইজ্জতি হবার হাত থেকে হিফাজত করুন। আমীন।